কিশোর গল্প সংকলন

সম্পাদনায়

অতীন ঠাকুর

ও

উজ্জ্বল কুমার

প্রকাশক ঃ
জ্ঞানেন্দ্রকুমার রায়
জ্ঞান প্রকাশন
২৩/১ কলেজ রো
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ ঃ অভিমন্যু দাস
অলংকরণ ঃ দুলাল সিংহ ও কুমার উজ্জ্বল

প্রথম প্রকাশ ঃ ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৫৯

প্রচার সচিব ঃ শংকর রায়

মুদ্রাকর ঃ
সুনীল কুমার ভাণ্ডারী
জগদ্ধাত্রী প্রিণ্টার্স
৫৯/২, পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

প্রয়াত
মেজদা সুভাষ সিংহ-এর
স্মৃতির উদ্দেশে

স্নেহাশীর্বাদ
ও
শুভেচ্ছা

পরমাদর ভাজনেষু—

আপনাদের "কিশোর গল্প সংকলন" পাঠ করে আনন্দিত হলাম। আপনাদের এই সুন্দর পুস্তক কিশোর-কিশোরীদের নিকট বিশেষ প্রিয়, এবং তাদের পক্ষে অতীব মঙ্গলজনক হবে—নিঃসন্দেহে। আপনাদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। ৺পরমানন্দময়ী পরমা জননী সকলের কল্যাণসাধন করুন। স্নেহাশীর্বাদ ও ভালবাসা। ইতি—

নিত্যশুভার্থিনী আপনাদের আদরের রমাদি
[৺ডক্টর রমা চৌধুরী]
প্রাক্তন উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব

গল্প	লেখক	পৃষ্ঠা
অকুতোভয়তা	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	১
পাঠশালার পণ্ডিত মশাই	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৬
হঠাৎ অবতার	কালীপ্রসন্ন সিংহ	১১
হাবা	গিরীশচন্দ্র ঘোষ	২৪
বিদ্যাধরীর অরুচি	ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	৩৪
শাদা মন কালো মন	শিবনাথ শাস্ত্রী	৪৮
বেড়ালের স্বর্গ	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৫
ঝানু চোর চানু	উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	৬১
মাটি নিবি গো	পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	৭২
ছেলে ধরা	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৭৯
দানের হিসাব	সুকুমার রায়	৮৫
গ্রামের পাঠশালা	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৯১

দ্বিতীয় পর্ব

গল্প	লেখক	পৃষ্ঠা
শাস্তি	সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়	৯৭
বটুক দাদার পাখি	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	১০৪
চোর পুলিশ	সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	১১২
ডবল পশুপতি	শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	১১৯
বদনের অমৃতফল	অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়	১২৬
বুদ্ধির পরিচয়	অতীন ঠাকুর	১৪১
চকদীঘির বাবুরা	ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়	১৪৪
আমায় সবাই চেনে	উজ্জ্বল কুমার	১৫১
বেড়ে-ওঠা	দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫৮
বাসে উঠলেই অচেনা	শেখর বসু	১৭৪
খিদে	গৌতম চক্রবর্তী	১৮১
শেয়াল পণ্ডিত ও সিংহ মহারাজ	দিলীপ ভট্টাচার্য	১৮৮

প্রথম পর্ব

অকুতোভয়তা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ফরাসি দেশে দেশূলিয়র নামে এক সদ্বংশসম্ভূতা কামিনী ছিলেন। তিনি কবিত্বশক্তি দ্বারা স্বদেশে বিশিষ্ঠরূপ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন, এবং সর্বপ্রকার লোকের নিকট বিলক্ষণ আদরণীয় হয়েন।

একদা, তিনি, লুনিবিলের কাউণ্ট কাউণ্টেসের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত, তাঁহাদের বাসস্থানে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইলে, কাউণ্ট ও কাউণ্টেস, তাঁহার সমুচিত সমাদর ও পরিচর্যা করিয়া কহিলেন, রাত্রিবাসের নিমিত্ত, আপনি ইচ্ছানুসারে গৃহ মনোনীত করিয়া লউন; কিন্তু, একটি গৃহ নির্দিষ্ট করিয়া কহিলেন, কেবল এই গৃহে থাকিতে পাইবেন না, ইহাতে রাত্রিকালে ভূতের আবির্ভাব ও উপদ্রব হয়। কেবল আমরা উভয়ে ঐরূপ ভাবি, এরূপ নহে; এই বাটিতে যত লোক আছে, দেখিয়া শুনিয়া, সকলেরই ঐরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে। এই গৃহের মধ্যে রাত্রিতে প্রায় সর্বদাই বিরূপ শব্দ ও গোলযোগ শুনিতে পাওয়া যায়। এজন্য, কেহ সাহস করিয়া, রজনীতে, এই গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না।

এইকথা শ্রবণমাত্র, অতিমাত্র কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, দেশূলিয়র কহিলেন, অদ্য আমি, এই গৃহেই রজনী যাপন করিব, এবং কি কারণে ঐরূপ বিরূপ শব্দ ও গোলযোগ হয়, পরীক্ষা করিয়া দেখিব। কাউণ্ট মহাশয়, তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া, চকিত হইয়া উঠিলেন, এবং চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, আমরা কোন ক্রমেই আপনাকে এই ভয়ঙ্কর গৃহে রাত্রিবাস করিতে দিব না; প্রভূত কৌতূহল বশতঃ এক্ষণে আপনকার এরূপ ইচ্ছা ও সাহস হইতেছে বটে; কিন্তু অকিঞ্চিৎকর কৌতূহল চরিতার্থ করিতে গিয়া, পরিণামে আপনকার অসুখ ও যন্ত্রণার সীমা থাকিবেক না; অধিক কি, আপনকার প্রাণসংশয় পর্যন্ত ঘটিতে পারে। অতএব, আমি আপনকার এই অসমসাহসিক অধ্যবসায়ে কোন মতে অনুমোদন করিতে পারি না।

এই রূপে তিনি অনেক বুঝাইলেন ও অনেক ভয় দেখাইলেন, কিন্তু দেশূলিয়র কোন ক্রমেই বিচলিত হইলেন না। কাউণ্টেসও তাঁহাকে অশেষ প্রকারে বুঝাইলেন ও বিস্তর বাদানুবাদ করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে

পারিলেন না। দেশুলিয়রের এই স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, লোকে সচরাচর যে ভূতের গল্প করে ও ভূতের উপদ্রব বর্ণনা করে, সে সকল নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তিমূলক ও কুসংস্কারজনিত ; দুর্বলচিত্ত লোকেরাই তাদৃশ্য কল্পিত বিষয়ে বিশ্বাস করিয়া থাকে। এই সংস্কার বশতঃ, কিছুতেই তাঁহার সাহস সংকুচিত বা ব্যতিক্রান্ত হইল না। তদ্দর্শনে, কাউন্ট ও কাউন্টেস, ভয় ও দুর্ভাবনায় অভিভূত হইয়া, যথোচিত বিনয় করিলেন, ভৎর্সনা করিলেন, দুঃখপ্রকাশ করিলেন,. কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে অবলম্বিত অধ্যবসায় হইতে বিরত করিতে পারিলেন না ; অবশেষে, নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া, তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

অনন্তর, দেশুলিয়র, এক পরিচারিকা সমভিব্যাহারে, শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন, এবং পরিচ্ছদ পরিহারপূর্বক পল্যঙ্কে আরোহণ করিয়া, পরিচারিকাকে কহিলেন, পল্যঙ্কের শিখরের দিকে একটি বড় বাতী জ্বালিয়া রাখ, এবং দৃঢ়রূপে দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া যাও। সে, তদীয় আদেশানুরূপ কার্য সমাধা করিয়া, প্রস্থান করিলে পর, তিনি শয়ন করিয়া কিয়ৎক্ষণ পুস্তক পাঠ করিলেন, এবং পাঠ করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইলেন।

কিঞ্চিৎ কাল পরে, বিকট শব্দ হইতে লাগিল। সেই শব্দে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। অবিলম্বে দ্বার উদ্ঘাটিত, ও পদসঞ্চারধ্বনি আরব্ধ হইল। শ্রবণমাত্র, দেশুলিয়র স্থির করিলেন, বাটীর সকলে যাহাকে ভূত ভাবিয়া, ভয় পাইয়া থাকে, সে এই। পরে তিনি, অবিচলিত চিত্তে ও অসংকুচিত স্বরে, তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তুমি যে হও না কেন, আমি তোমায় স্পষ্ট কহিতেছি, কিছুতেই ভয় পাইব না ; এবং এই বাটীর সকলের যে অমূলক ভয় ও সংস্কার জন্মিয়া আছে, আজি তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্ভাবিত করিব বলিয়া যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কোন কারণে তাহা হইতে বিচলিত হইব না ; যদি আমায়, ভয় দেখাইয়া, তাহা হইতে বিরত করা তোমার অভিপ্রেত হয়, তুমি কদাচ কৃতকার্য হইতে পারিবে না ; আমার ভাগ্যে যাহা ঘটুক না কেন, আমি শেষ পর্যন্ত না দেখিয়া ক্ষান্ত হইব না।

দেশুলিয়র এই বলিয়া বিরত হইলেন, কিন্তু উত্তর পাইলেন না। তিনি পুনরায় সেইরূপ কহিলেন, তথাপি কোন উত্তর পাইলেন না। পল্যঙ্কের অতি সন্নিকটে একটি কাঠের পরদা ছিল, উহা উলটিয়া মশারির উপর পতিত হওয়াতে, একটা বিকট শব্দ হইল। যাহাদের ভূতের ভয়

আছে, এরূপ অবস্থায় ঐরূপ শব্দ শুনিলে ও ঘটনা দেখিলে, তাহাদের বুদ্ধিভ্রংশ ও চৈতন্যধ্বংস হয়, তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই; কিন্তু, দেশুলিয়রের মনে ভয় বা উদ্বেগের অণুমাত্র সঞ্চার হইল না। তাঁহার এই সন্দেহ হইল, বাটীর কোন ভৃত্য আমায় ভয় দেখাইতে আসিয়াছে। যাহা হউক, তিনি সেই রাত্রিচরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে, কি জন্যে এখানে আসিয়াছ, বল; তুমি কখনই, এ রূপে ভয় প্রদর্শন করিয়া, আমায় ব্যাকুল বা বিচলিত করিতে পারিবে না। উহা কোন উত্তর দিল না; প্রশান্ত ভাবে গৃহমধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, উহা জ্বলন্ত বাতীর নিকটে উপস্থিত হইল। অবিলম্বে, বৃহৎ বাতী ও বাতীর প্রকাণ্ড আধার উলটিয়া পড়িল। ভয়ানক শব্দ ও গৃহ অন্ধকারময় হইল। তাহাতেও তিনি কিঞ্চিৎমাত্র ভীত বা উৎকণ্ঠিত হইলেন না।

অবশেষে, সেই রাত্রিচর পল্যঙ্কের পাদদেশে উপস্থিত হইল। তখনও দেশুলিয়রের অন্তঃকরণে অণুমাত্র ভয় সঞ্চার হইল না। ভাল হইল, তুমি কি পদার্থ, এখন আমি অনায়াসে তাহার নির্ণয় করিতে পারিব, এই বলিয়া, গাত্রোত্থানপূর্বক, তিনি পল্যঙ্কের পাদদেশে হস্তপ্রসারণ করিয়া, তাহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুই কর মখমলের ন্যায় কোমল দুই কর্ণে সংলগ্ন হইল। তিনি, বলপূর্বক, সেই দুই কর্ণ ধরিলেন, এবং

যাবৎ রাত্রিশেষ ও সূর্য্যোদয় না হয়, ছাড়িবেন না, স্থির করিলেন ; কিন্তু কাহার কর্ণ ধরিলেন, কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না। এই ভাবে অবস্থিত হইয়া, তিনি রজনীর অবশিষ্ট ভাগ অতিবাহিত করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে, এই অদ্ভুত ব্যাপারের স্বরূপনির্ণয় হইল। ঐ বাটীতে এক বৃহৎ কুক্কুর ছিল। দেশুলিয়র দেখিলেন, ঐ কুক্কুরের কর্ণে ধরিয়া আছেন। ভয়ঙ্কর ভৌতিক ব্যাপারের এই রূপে পর্যবসান হওয়াতে, তিনি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন ; অনন্তর, সেই কুক্কুরের কর্ণ পরিত্যাগপূর্বক, নিশ্চিন্ত হইয়া, শয়ন করিয়া রহিলেন।

এদিকে, কাউণ্ট ও কাউণ্টেস, শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া, যৎপরোনাস্তি উদ্বেগ ও দুর্ভাবনায় রজনী যাপন করিলেন, একবারও নয়ন মুদ্রিত করিতে পারিলেন না। তাঁহারা এই বিষয়ের যত আন্দোলন করিতে লাগিলেন, উত্তরোত্তর ততই ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। অবশেষে, তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিলেন, আমরা প্রাতঃকালে উঠিয়া, দেশুলিয়রের প্রাণত্যাগ হইয়াছে, অবধারিত দেখিতে পাইব। রজনী অবসন্না হইবামাত্র, তাঁহারা শয়নাগার হইতে বহির্গত হইয়া, বিষণ্ণ বদনে, অবসন্ন গমনে ভূতাবিষ্ট গৃহের দ্বার-দেশে উপস্থিত হইলেন, সাহস করিয়া সহসা সেই গৃহে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে, প্রবেশ করিয়াও, কথা কহিতে তাঁহাদের সাহস হইল না। রাত্রিতে কি সর্বনাশ ঘটিয়াছে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া, সভয়ে দণ্ডায়মান রহিলেন।

তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া, দেশুলিয়র মশারির অভ্যন্তর হইতে বিনির্গমনপূর্বক, প্রাতঃকর্তব্য নমস্কার সম্ভাষণাদি করিয়া, সহাস্য মুখে তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহাকে জীবিত, অক্ষতশরীর ও প্রফুল্লহৃদয় দেখিয়া তাঁহাদের কলেবরে প্রাণসঞ্চার হইল। রাত্রিতে যার পর যে ঘটনা হইয়াছিল, তৎসমুদয় তিনি অবিকল বর্ণনা করিতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে তাঁহাদের হৃৎকম্প হইতে লাগিল। অবশেষে, দেশুলিয়র কাউণ্ট মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, এ বিষয়ে আপনকার বিলক্ষণ ভ্রম জন্মিয়া আছে, এবং প্রশ্রয় দেওয়াতে, সেই ভ্রম ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে ; আর আপনকার তাদৃশ অমূলক কুসংস্কার থাকা উচিত নহে। আপনারা যাহাকে ভূত বলিয়া, স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, ঐ দেখুন, সে শুইয়া রহিয়াছে। এই বলিয়া, অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক, তিনি ঐ কুক্কুর দেখাইয়া দিলেন, এবং হাস্যমুখে রাত্রিবৃত্তান্তের শেষ ভাগ বর্ণন করিলেন।

সবিশেষ সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, তাঁহারা স্ত্রী পুরুষে চমৎকৃত হইলেন। অনন্তর দেশুলিয়র পুনরায়, কাউণ্টকে সম্বোধন করিয়া, কহিলেন, ভবাদৃশ ব্যক্তির ঈদৃশ কুসংস্কারের বশীভূত হওয়া উচিত নহে; দেখুন, এই অমূলক কুসংস্কারের দোষে আপনাদের অন্তঃকরণে কত শঙ্কা জন্মিয়াছিল; গত রাত্রিতে, আমার কি বিপদ ঘটে, এই দুর্ভাবনায় আপনারা, কত অসুখে কালযাপন করিয়াছেন, বলিতে পারি না। লোকে যে সকল ব্যাপারে প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে না পারে উহাদিগকে অলৌকিক ঘটনা জ্ঞান করিয়া থাকে। তৎপরে, তিনি দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, এবং প্রত্যহ চাবি দিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখে, কুক্কুরে কি রূপে দ্বার খুলিয়া গৃহে প্রবেশ করিবেক, এই সংশয়চ্ছেদন করিবার নিমিত্ত, দ্বার পরীক্ষা করিতে লাগিলেন; অবিলম্বে দেখিতে পাইলেন, উহার কল প্রভৃতি এত শিথিল হইয়া গিয়াছিল যে, কিছু বল পূর্বক ধাক্কা মারিলেই কপাট খুলিয়া যায়।

এই রূপে গৃহপ্রবেশ অনায়াসসাধ্য হওয়াতে, কুক্কুর প্রত্যহ অধিক রাত্রিতে সেই গৃহে প্রবেশ করিত, কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া পল্যঙ্কে আরোহণপূর্বক তদুপরি নিদ্রা যাইত, এবং রাত্রিশেষে, নিদ্রাভঙ্গ হইলে, গৃহ হইতে নির্গত হইয়া, স্বস্থানে গিয়া অবস্থিতি করিত। সে রাত্রিও, পল্যঙ্কে আরোহণ করিবার অভিপ্রায়ে, উহার পাদদেশে গমন করিয়াছিল; বোধ হয়, দেশুলিয়র বলপূর্বক কর্ণে ধরিয়া না রাখিলে, তদুপরি আরোহণ করিত।

যাহা হউক, কাউণ্ট ও কাউণ্টেস, এই রূপে ভৌতিক বৃত্তান্তের সিদ্ধান্ত হওয়াতে, অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, এবং দেশুলিয়রের সাহস, বুদ্ধিকৌশল ও অকুতোভয়তা দর্শনে চমৎকৃত হইয়া, মুক্ত কণ্ঠে তাঁহাকে শত শত সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। ফলতঃ, তিনি, স্ত্রীলোক হইয়া, সাহস ও অকুতোভয়তার যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, পুরুষজাতির মধ্যেও সচরাচর সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না।

পাঠশালার পণ্ডিত মশাই

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

টিপ টিপ করিয়া জল পড়িতেছে, আমি ছাতা মাথায় গ্রাম্য পথ দিয়া হাঁটিতেছি। বৃষ্টিটা একটু চাপিয়া আসিল। তখন পথের ধারে একখানা আটচালা দেখিয়া তাহার পরচালার নিচে আশ্রয় লইলাম। দেখিলাম, ভিতরে কতগুলি ছেলে বসিয়া পড়িতেছে। একজন পণ্ডিত মহাশয় বাংলা পড়াইতেছেন। কান পাতিয়া একটু পড়ানোটা শুনিলাম, দেখিলাম পণ্ডিত মহাশয়ের ব্যাকরণের উপর বড় অনুরাগ। একটি উদাহরণ দিতেছি।

পণ্ডিত মহাশয় একজন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বল দেখি, ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিলে কী হয় ?

ছাত্রটি কিছু মোটা-বুদ্ধি, নাম শুনিলাম ভোঁদা। ভোঁদা ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল—আজ্ঞে, ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত করিলে ভুক্ত হয়।

পণ্ডিত মহাশয় ছাত্রের মূর্খতা দেখিয়া চটিয়া উঠিলেন এবং তাহাকে মূর্খ! গর্দভ! প্রভৃতি নানাবিধ সংস্কৃত বাক্যে অসংস্কৃত করিলেন। ছাত্রও

কিছু গরম হইয়া উঠিল, বলিল—কেন পণ্ডিত মশায়! ভুক্ত শব্দ কি নাই?

পণ্ডিত। থাকিবে না কেন? ভুক্ত কিসে হয়, তা কি জানিস না?

ছাত্র। তা জানিব না কেন? ভাল করিয়া চিবাইয়া গিলিয়া ফেলিলেই ভুক্ত হয়।

পণ্ডিত। বেল্লিক! বানর! তাই কি জিজ্ঞাসা করছি?

তখন ভোঁদার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি তাহার পার্শ্ববর্তী ছাত্র রামকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভাল রাম, তুমিই বল দেখি, ভুক্ত শব্দ কী প্রকারে হয়?

রাম বলিল—আজ্ঞে, ভুজ ধাতুর উত্তর ক্ত করিলে ভুক্ত হয়।

পণ্ডিত মহাশয় ভোঁদাকে বলিলেন—শুনলি রে ভোঁদা? তোর কিছু হবে না!

ভোঁদা রাগিয়া বলিল—না হয় না হোক—আপনার যেমন পক্ষপাত!

পণ্ডিত। পক্ষপাত আবার কী রে, হনুমান!

ভোঁদা। ওর কপালে ভুজো আর আমার কপালে ভূ?

ছাত্র যে সুচর্বণীয় ভুজো এবং অদৃষ্টের তারতম্য স্মরণ করিয়া অভিমান করিয়াছে, পণ্ডিত মহাশয় তাহা বুঝিলেন না। রাগ করিয়া ভোঁদাকে এক ঘা প্রহার করিলেন এবং আদেশ করিলেন—এখন বল, ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত করিলে কী হয়?

ভোঁদা। (চোখে জল) আজ্ঞে, জানি না।

পণ্ডিত। জানিস নে? ভূত কিসে হয়, জানিস নে?

ভোঁদা। আজ্ঞে, তা জানি। মলেই ভূত হয়।

পণ্ডিত। শুয়োর! গাধা! ভূ-ধাতুর উত্তর ক্ত করিলে ভূত হয়।

ভোঁদা, এতক্ষণে বুঝিল। মনে মনে স্থির করিল, মরিলেও যা হয়, ভূ ধাতুর উত্তর করিলেও তাই হয়। সে বিনীতভাবে পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল—আজ্ঞে, ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত করিলে কি শ্রাদ্ধ করিতে হয়?

পণ্ডিত মহাশয় আর সহ্য করিতে পারিলেন না। বিরাশি সিক্কা ওজনে ছাত্রের গালে এক চপেটাঘাত করিলেন। ছাত্র পুস্তকাদি ফেলিয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ি চলিয়া গেল। তখন বৃষ্টি ধরিয়া আসিয়াছিল, রঙ্গ দেখিবার জন্য আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। ভোঁদার মাতার গৃহ বিদ্যালয় থেকে বড় বেশি দূর নয়, ভোঁদা গৃহ-প্রবেশ কালে কান্নার স্বর দ্বিগুণ বাড়াইল এবং আছাড়িয়া পড়িল, দেখিয়া ভোঁদার মা কাছে আসিয়া সান্ত্বনায় প্রবৃত্ত হইল। জিজ্ঞাসা করিল—কেন, কী হয়েছে বাবা?

ছেলে। আমি পড়া বলতে পারি নাই বলে পণ্ডিত মশাই আমায় মেরেছে।

মা। অধঃপেতে বুড়ো! আক্কেল নেই। আমার এই একরত্তি ছেলে! পড়া বলতে পারেনি বলে ছেলেকে মারে! আজ ওকে আমি একবার দেখব!

এই বলিয়া গাছ-কোমর বাঁধিয়া ভোঁদার মাতা পণ্ডিত মহাশয়ের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় চলিলেন, আমিও পিছু পিছু চলিলাম। সেই সুপুত্রবতীকে অধিক দূর যাইতে হইল না, তখন পাঠশালা বন্ধ হইয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয় গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, পথিমধ্যেই উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। তখন ভোঁদার মা বলিল—হ্যাঁ গা পণ্ডিত মহাশয়, আমার একরত্তি ছেলে পড়া বলতে পারেনি বলে কি এমন মারতে হয়?

পণ্ডিত। ওগো এমন কিছু শক্ত কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। কেবল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ভূত কেমন করে হয়।

ভোঁদার মা। ভূত হয় গঙ্গা না পেলেই। তা, ওসব কথা ও ছেলে-মানুষ কেমন করে জানবে গা? ওসব কথা আমাদের জিজ্ঞাসা কর।

পণ্ডিত। ওগো সে-ভূত নয় গো।

ভোঁদার মা। তবে কি গোভূত?

পণ্ডিত। সে-সব কিছু নয় গো, তুমি মেয়েমানুষ কী বুঝবে? বলি একটা ভূত শব্দ আছে।

ভোঁদার মা। ভূতের শব্দ আমি অমন কত শুনেছি। তা ও ছেলে-মানুষ, ওকে কি ওসব কথা বলে ভয় দেখাতে আছে?

আমি দেখলাম যে, এ পণ্ডিতে পণ্ডিতে সমস্যা শীঘ্র মিটিবে না। আমি এ রঙ্গের অংশ পাইবার আকাঙ্ক্ষায় অগ্রসর হইয়া পণ্ডিত মহাশয়কে বলিলাম—মহাশয়, ও স্ত্রীলোক, ওর সঙ্গে বিচার ছেড়ে দিন, আমার সঙ্গে বরং এ-বিষয়ে কিছু বিচার করুন।

পণ্ডিত মহাশয় আমাকে ব্রাহ্মণ দেখিয়া একটু সম্ভ্রমের সহিত বলিলেন—আপনি প্রশ্ন করুন।

আমি বলিলাম—ভূত ভূত করিতেছেন, বলুন দেখি ভূত কয়টি?

পণ্ডিত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—ভাল, ভাল, পণ্ডিতে পণ্ডিতের মতই কথা কয়, শুনলি ভোঁদার মা? তারপর আমার দিকে ফিরিয়া এমনই মুখখানা করিলেন, যেন বিদ্যার বোঝা নামাইতেছেন। বলিলেন—ভূত পাঁচটি।

তখন ভোঁদার মা গর্জিয়া উঠিয়া বলিল,—তবে রে বুড়ো? তুই এই বিদ্যায় আমার ছেলে মারিস? ভূত পাঁচটা! পাঁচ ভূত, না বারো ভূত?

পণ্ডিত। সে কী বাছা, ও ঠাকুরটিকে জিজ্ঞাসা কর, ভূত পঞ্চ। ক্ষিত্যপ্—

ভোঁদার মা। বারো ভূত নয় তো আমার এতটা বিষয় খেলে কে? আমি কি এমনই দুঃখী ছিলাম?

ভোঁদার মা তখন কাঁদিতে আরম্ভ করিল। আমি তখন তাহার পক্ষাবলম্বন পূর্বক বলিলাম—উনি যা বলিলেন তা হতে পারে। অনেক সময়েই শুনা যায়, অনেকের বিষয় লইয়া ভূতগণ আপনাদিগের পিতৃকৃত্য সম্পন্ন করে। কখনো শোনেন নাই, অমুকের টাকাটায় ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ হইতেছে?

কথাটা শুনিয়া পণ্ডিতমহাশয় ঠিক বুঝিতে পারিলেন না আমি ব্যঙ্গ করিতেছি, কি সত্য বলিতেছি। কেননা বুদ্ধিটা কিছু স্থূল, তাঁকে একটু ভেকাপনা দেখিয়া আমি বলিলাম—মহাশয়, এ বিষয়ে প্রমাণ প্রয়োগ তো সকলেই অবগত আছেন। মনু বলিয়াছেন—

কৃপণানং ধনঞ্চৈব পোষ্যকুষ্মাণ্ডপালিনাম্
ভূতানাং পিতৃশ্রাদ্ধেষু ভবেন্নষ্টং ন সংশয়ঃ ॥*

পণ্ডিত মহাশয়ের সংস্কৃত জ্ঞান ঐ ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত পর্যন্ত। কিন্তু এদিকে বড় ভয়, পাছে সেই শিষ্যমণ্ডলীর সম্মুখে, বিশেষত ভোঁদার মা-র সম্মুখে আমার কাছে পরাস্ত হয়েন, অতএব যেমন শুনিলেন—ভূতানাং পিতৃশ্রাদ্ধেষু ভবেন্নষ্টং ন সংশয়ঃ—অমনই উত্তর করিলেন—মহাশয়, যথার্থই আজ্ঞা করিয়াছেন। বেদেই তো আছে—

অস্তি গোদাবরীতীরে বিশালঃ শাল্মলীতরুঃ।

শুনিয়া ভোঁদার মা বড় তৃপ্ত হইল, এবং পণ্ডিতমহাশয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিল—তা, বাবা! তোমার এত বিদ্যা, তবু আমার ছেলে মার খেল?

পণ্ডিত। আরে বেটি, তোর ছেলেকে এমনই বিদ্বান করিব বলিয়াই

---

* কৃপণদিগের ধন আর যাঁহারা পোষ্যপুত্রস্বরূপ কুষ্মাণ্ডগুলি প্রতিপালন করেন তাহাদিগের ধন ভূতের বাপের শ্রাদ্ধে নষ্ট হইবে সন্দেহ নাই।

তো মারি। না মারিলে কি বিদ্যা হয়?

ভোঁদার মা। বাবা! মারিলে যদি বিদ্যা হয়, তবে আমাদের বাড়ির কর্তাটির কিছু হল না কেন? ঝাঁটায় বল, কোঁস্তায় বল, আমি তো কিছুতেই কসুর করি না।

পণ্ডিত। বাছা! ওসব কি তোমাদের হাতে হয়? ও আমাদের হাতে।

ভোঁদার মা। বাবা! আমাদের হাতে কিছুই জোরের কসুর নাই। দেখিবে? এই বলিয়া ভোঁদার মা একগাছা বাকারি কুড়াইয়া লইল। পণ্ডিত মহাশয় এইরূপ হঠাৎ অধিক বিদ্যালাভের সম্ভাবনা দেখিয়া সেখান হইতে ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রস্থান করিলেন।

শুনিয়াছি, সেই অবধি পণ্ডিত মহাশয় আর ভোঁদাকে কিছু বলেন নাই। ভূ ধাতু লইয়া পাঠশালায় আর গোলযোগ হয় নাই। ভোঁদা বলে—মা এক বাঁকারিতে পণ্ডিত মহাশয়কে ভূতছাড়া করিয়াছে।

হঠাৎ অবতার

কালীপ্রসন্ন সিংহ

বাবু পদ্মলোচন ওরফে হঠাৎ অবতার ১১৯২ সালে তাঁর মাতামহ নাউপাড়ামুষলীর মিত্তিরদের বাড়ি জন্মগ্রহণ করে। নাউপাড়ামুষলী গ্রামখানি মন্দ নয় অনেক কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের বাস আছে; গাঁয়ের জমিদার মজফ্ফর খাঁ, মোছলমান হয়েও গরু জবাই প্রভৃতি দুষ্কর্মে বিরত ছিলেন, মোল্লা ও ব্রাহ্মণ উভয়কেই সমান দেখতেন—মানীর মান রাখতেন ও লোকের খাতির ও সেলামালেকীর গুণো কত্তেন না, ফারসীতে তিনি বড় লায়েক ছিলেন, বাঙ্গলা ও উর্দুতেও তাঁর দখল ছিল; মজফ্ফর খাঁ গাঁয়ের জমিদার ছিলেন বটে কিন্তু ধোপা নাপিত বন্ধ করা, হুঁকা মারা, ঢ্যালা ফ্যালা ও বিয়ে ভাটির হুকুম হাকাম ও নিষ্পত্তি করার ভার মিত্তির বাবুদের ওপরই দেওয়া হয়। পূর্ব্বে মিত্তির বাবুদের বড় জলজলাট ছিল, মধ্যে পরিবারের অনেকে মরে যাওয়ায় ভাগা ভাগা ও বহু গুষ্টি নিবন্ধন কিঞ্চিৎ দৈন্যদশায় পড়তে হয়েছিল কিন্তু নিঃস্বত্ব হয়েও গ্রামস্থ লোকেদের কাছে মনের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নি।

পদ্মলোচনের জন্মদিনটি সামান্য লোকের জন্মদিনের মত অমনি যায় নি, সে দিন—হঠাৎ মেঘাড়ম্বর করে সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হয়—একটি সাপ আঁতুড়ঘরের দরজায় সমস্ত রাত্তির বসে বসে ফোঁস ফোঁস করে, আর বাড়ির একটা পোষা টিয়ে পাখি হঠাৎ মরে গিয়ে দাঁড়ে ঝুলে থাকে, পদ্মলোচনের পিতামহী এ সকল লক্ষণ শুভ নিমিত্ত বিবেচনা করে বড়ই খুসি হয়ে আপনার পরবার একখানি লালপেড়ে সাড়ি দাইকে বকসিস দ্যান, অভ্যাগত ঢুলী ও বাজন্দরেরাও একটি সিকি আর এক হাঁড়ি নারকেলনাড়ু পেয়েছিল। ক্রমে মহা আনন্দে আটকৌড়ে সারা হলো, গাঁয়ের ছেলেরা "আটকৌড়ে বাট্‌কৌড়ে ছেলে আছে ভাল; ছেলেরা বাবার দাড়িতে বসে হাগ" বলে কুলো বাজিয়ে ফুটকড়াই, বাতাসা ও এক এক চকচকে পয়সা নিয়ে আনন্দে বিদেয় হলো। গোভাগাড় থেকে একটা মরা গরুর মাথা কুড়িয়ে এনে আঁতুড়ঘরের দরজায় রেখে "দোরষষ্ঠী" বলে হলুদ

ও দুর্ব্বো দিয়ে পুজো করা হলো। ক্রমে ১৫ দিন ২০ দিন এক মাস সম্পূর্ণ হলে গাঁয়ের পঞ্চানন্দতলায় ষষ্ঠী পুজো দিয়ে আঁতুড় ওঠানো হয়।

ক্রমে পদ্মলোচন তিথিগত চাঁদের মতন বাড়তে লাগলেন। গুলিডাণ্ডা, কপাটি কপাটি, চোর চোর, তেলী হাত পিছলে গেলি প্রভৃতি খেলায় পদ্মলোচন প্রসিদ্ধ হয়ে পডলেন। পাঁচ বছরে হাতেখড়ি হলো, গুরুমশায়ের ভয়ে পদ্মলোচন পুকুরপাড়ে, নলবনে ও বাঁশবাগানে লুকিয়ে থাকেন, পেট কামডানি ও গা বমি বমি প্রভৃতি অন্তঃশিলে রোগেরও অভাব রইলো না; ক্রমে কিছুদিন এই রকমে যায়, একদিন পদ্মলোচনের বাপ মলেন, তাঁর মা আগুন খেয়ে গেলেন, ক্রমে মাতামহ, মামা ও মামাতো ভায়েরাও একে একে অকালে ও সময়ে সল্লেন সুতরাং মাতামহ মিত্তিরদের ভিটে পুরুষশূন্য প্রায় হলো; জমিজমাগুলি জয়কৃষ্ণের মত জমিদারে কতক গিলে ফেল্লে, কতক খাজনা না দেওয়ায় বিকিয়ে গেল, সুতরাং পদ্মলোচনকে অতি অল্প বয়সে পেটের জন্যে অদৃষ্ট ও হাতযশের ওপর নির্ভর কত্তে হলো। পদ্মলোচন কল্‌কাতায় এসে এক বাঁসাডেদের বাসায় পেটভাতে ফাই ফরমাস, কাপড় কোঁচানো ও লুচি ভাজা প্রভৃতি কর্মে ভর্তি হলেন,—অবকাশ মত হাতটাও পাকানো হবে—বিশেষতঃ কুঠেলরা লেখাপড়া শেখাবেন প্রতিশ্রুত হলেন।

পদ্মলোচন কিছুকাল ঐ নিয়মে বাঁসাডেদের মনোরঞ্জন কত্তে লাগলেন; ক্রমে দু' এক বাবুর অনুগ্রহ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় মাথালো মাথালো জায়গায় উমেদারি আরম্ভ কল্লেন। সহরের যে বডমানুষের বৈঠকখানায় যাবেন প্রায় সর্ব্বত্রই লোকারণ্য দেখতে পাবেন, যদি ভিতরকার খবর নেন তা হলে পাওনাদার, মহাজন, উঠ্‌নোওয়ালা, দোকানদার, উমেদার, আইবুড়ো ও বেকার কুলীনের ছেলেই বিস্তর দেখ্‌তে পাবেন—পদ্মলোচনও সেই ভিড়ের মধ্যে একটি বাড়ালেন; ক্রমে অষ্ট প্রহর ঘণ্টার গরুড়ের মত উমেদারিতে অনবরত এক বৎসর হাঁটাহাঁটি ও হাজ্‌রের পর দু' চারখানা সই সুপারিস্‌ও হস্তগত হলো; শেষে এক সদয়হৃদয় মুচ্ছুদ্দী আপনার হাউসে একটি ওজোন সরকারী কর্ম্ম দিলেন।

পদ্মলোচন কষ্টভোগের একশেষ করেছিলেন, ভদ্রলোকের ছেলে হয়েও কাপড় কোঁচান, লুচি ভাজা, বাজার করা, জল তোলা প্রভৃতি অপকৃষ্ট কাজ স্বীকার কত্তে হয়েছিল, ক্রমশ লুচি ভাজতে ভাজতে ক্রমে লুচিভাজায়

তিনি এমনি তৈরী হয়ে উঠলেন যে, তাঁর লুচি অনেক ঘটক ও মেঠাইওয়ালা বামুনেও ভাজতে পাত্তো না। বাঁসাড়েরা খুসি হয়ে তাঁরে "মেকর" খেতাব দেয়, সুতরাং সেই দিন থেকে তিনি মেকর পদ্মলোচন দত্ত নামে বিখ্যাত হলেন।

ভাষাকথায় বলে "যখন যার কপাল ধরে মুতে বসে...." যখন পড়্‌তা পড়তে আরম্ভ হয়, তখন ছাইমুটো ধল্লে সোনামুটো হয়ে যায়। ক্রমে পদ্মলোচন দত্তের শুভাদৃষ্ট ফল্‌তে আরম্ভ হলো—মুচ্ছুদ্দী অনুগ্রহ করে সিপসরকারী কর্ম দিলেন। সায়েবরাও দত্তজার চালাকি ও কাজের হুঁসিয়ারিতে সন্তুষ্ট হতে লাগলেন—পদ্মলোচন ততই সায়েবদের সন্তুষ্ট করবার অবসর খুঁজতে লাগলেন—একমনে সেবা করলে ভয়ঙ্কর সাপও সদয় হয়, পুরাণে পাওয়া যায় যে তপস্যা করে অনেকে হিন্দুদের ভূতের মত ভয়ানক দেবতাগুলোকেও প্রসন্ন করেচে। ক্রমে সায়েবরাও পদ্মলোচনের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর ভালো করবার চেষ্টায় রইলেন ; একদিন হাউসের সদরমেট কর্মে জবাব দিলে—সায়েবরা মুচ্ছুদ্দীকে অনুরোধ করে পদ্মলোচনকে সেই কর্মে নিযুক্ত কল্লেন।

পদ্মলোচন সিপসরকার হয়েও বাঁসাড়েদের আশ্রয় পরিত্যাগ করেন নি, কিন্তু সদরমেট হয়ে সেখানে থাকা আর ভাল দেখায় না বলেই অন্যত্র একটু জায়গা ভাড়া করে নিয়ে একটি খোলার ঘর প্রস্তুত করে রইলেন। কিন্তু এ অবস্থায় তাঁরে অধিকদিন থাকতে হলো না। তাঁর অদৃষ্ট শীঘ্রই লুচির ফোস্‌কার মত ফুলে উঠ্‌লো।...ক্রমে মুচ্ছুদ্দীর সঙ্গে সায়েবদের বড় একটা বনিবনাও না হওয়ায় মুচ্ছুদ্দী কর্ম ছেড়ে দিলেন, সুতরাং সায়েবদের অনুগ্রহধর পদ্মলোচন বিনা টাকায় মুচ্ছুদ্দী হলেন।

টাকায় সকলই করে! পদ্মলোচন মুচ্ছুদ্দী হবামাত্র, অবস্থার পরিবর্তন বুঝতে পাল্লেন, তার পরদিন সকালে সেই খোলার ঘর বালাখানাকে ভ্যাংচাতে লাগলো—উমেদার, দালাল, প্যায়দা, গদিওয়ালা ও পাইকেরে ভরে গ্যালো, কেউ পদ্মলোচন বাবুকে নমস্কার করে হাঁটু গেড়ে জোড়হাত করে কথা কয়, কেউ "আপনার সোনার দোত কলম হোক" "লক্ষপতি হোন" "সম্বৎসরের মধ্যে পুত্তুর সন্তান হোক" "অনুগতের হুজুর ভিন্ন গতি নাই" প্রভৃতি কথায় পদ্মলোচনকে তদ্দুলে পাঁউরুটি হতেও ফোলাতে লাগলেন—ক্রমে দুরবস্থা দুকুরে লোচ্চার মত মুখে কাপড় দিয়ে নুকুলেন—।

····হ্জ্কদারেরা আজকাল "পদ্মলোচনকে পায় কে" বলে ঢ্যাড্রা পিটে দিলেন, প্রতিধ্বনি—রেও রাম্ন, অগ্রদানী ও গাইয়ে বাজিয়ে সেজে এই কথাটি সর্বত্র ঘোষণা করে বেড়াতে লাগলেন—সহরে ঢিঢি হয়ে গেল—পদ্মলোচন এক জন মস্ত লোক।

কলকাতা সহরে কতকগ্লি বেকার "জয়কেতু" আছেন, যখন যার নতুন বোলবালাও হয় তখন তাঁরা সেইখানে মেশেন, তাঁকেই জাতের শ্রেষ্ঠ দেখেন ও অনন্যমনে তাঁরই উপাসনা করেন; আবার যদি তাঁর চেয়ে কেউ উঁচু হয়ে পড়েন তবে তাঁরে পরিত্যাগ করে উঁচুর দলে জমেন; আমরা ছেলেবেলা ব্ড়ো ঠাকুরমার কাছে "ছাঁদিন দড়ি ও গোদা বাড়ির" গল্প শ্নেছিলাম, এই মহাপ্র্ষরা ঠিক সেই ছাঁদিন দড়ি গোদা বাড়ি! গল্পে আছে, "রাজপ্ত্র জিজ্ঞাসা কল্লেন, ছাঁদিন দড়ি গোদা বাড়ি! এখন তুমি কার?"—"না আমি যখন যার তখন তার!" তেমনি হ্তোম প্যাঁচা বলেন সহ্রে জয়কেতুরাও "যখন যার তখন তার"!!!

জয়কেতুরা ভদ্রলোকের ছেলে, অনেকে লেখাপড়া জানেন, তবে কেউ কেউ ম্র্ত্তিমতী মা! এঁদের অধিকাংশই পৌত্তলিক, কুলীন বাম্ন, কায়স্থ কুলীন বেকার পেনস্নে ও ব্রোকদই বিস্তর। বহ্ কালের পর পদ্মলোচন বাব্ কলকাতা সহরে বাব্ বলে বিখ্যাত হন, প্রায় বিশ বৎসর হলো সহরের "হঠাৎ বাব্র" উপসংহার হয়ে যায় তন্নিবন্ধন "জয়কেতু" "মোসাহেব" "ওস্তাদজী" "ভড়জা" "ঘোষজা" "বোসজা" প্রভৃতি বরাখ্রেরা জোয়ারের বিষ্ঠার মত ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছিলেন, স্তরাং এখন পদ্মলোচনের "তপর্ণের কোষায়" জ্ড়াবার জায়গা পেলেন!

জয়কেতুরা ক্রমে পদ্মলোচনকে ফাঁপিয়ে তুল্লেন, পড়্তাও ভালো চল্লো—পদ্মলোচন অ্যাম্বিশনের দাস হলেন, হিতাহিত বিবেচনা দেনাদার বাব্দের মত গাঢাকা হলেন। পদ্মলোচন প্রকৃত হিন্দ্দের ম্কোস পরে সংসার রঙ্গভ্মিতে নাবলেন—ব্রাহ্মণের পাদ্ধ্লো খান—পা চাটেন—দলাদলির ও হিন্দ্ ধর্মের ঘোঁট করেন—ঠাকুর্ণ বিষয় ও সখীসম্বাদ গাওনার পক্ষে প্রকৃত ব্লটিং পেপার; পদ্মলোচনের জোরদণ্ডপ্রতাপ! বৈঠকখানায় ব্রাহ্মণ ও অধ্যাপক ধরে না, মিউটিনির সময় গবর্মেণ্ট যেমন দোচোকোব্রত ভলন্টিয়ার জ্টিয়েছিলেন, পদ্মলোচন বাব্ হয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সংগ্রহ কত্তে বাকী রাখলেন না, এসিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়ামের মত বিবিধ আশ্চর্য্য জীব একত্র কল্লেন—বেশীর ভাগ জ্যান্ত!!!

বাঙ্গালি বদমায়েস ও দুর্ব্বুদ্ধির হাতে টাকা না থাকলে সংসারের কিছু মাত্র ক্ষতি কত্তে পারে না, বদমায়িসী ও টাকা একত্র হলে হাতা পর্য্যন্ত মারা পড়ে, সেটি বড় সোজা কথা নয়, শিবকেষ্টো বাঁড়ুজ্যে পর্য্যন্ত মারা যান! পদ্মলোচনও পাঁচজন কুলোকের পরামর্শে বদমায়িসী আরম্ভ কল্লেন—পৃথিবীর লোকের নিন্দা করা, খোঁটা দেওয়া ও টিট্‌কারি করা তাঁর কাজ হলো, ক্রমে তাতেই তিনি এমনি চ্যেড়ে উঠলেন যে, শেষে আপনাকে আপনি অবতার বলে বিবেচনা কত্তে লাগলেন; পরিষদেরা অবতার বলে তাঁরে স্তব কত্তে লাগলো, বাজে লোকে "হঠাৎ অবতার" খেতাব দিলে—দর্শক ভদ্দরলোকেরা এই সকল দেখে শুনে অবাক্ হয়ে ক্ল্যাপ দিতে লাগলেন!

পদ্মলোচন যথার্থই মনে মনে ঠাউরেছিলেন যে, তিনি সামান্য মনুষ্য নন, হয় হরি নয় পীর কিম্বা ইহুদীদের ভাবী মেসায়া—তারই সফল ও সার্থকতার জন্য পদ্মলোচন বুজরুকি পর্য্যন্ত দেখাতে ত্রুটি করেন নাই।

বিলাতী জুজেস্ ক্রাইষ্ট—এক টুকরো রুটিতে এক শ লোক খাইয়েছিলেন—কাণা ও খোঁড়া ফুঁয়ে ভাল কত্তেন। হিন্দুমতের কেষ্টও পুতনা বধ, শকট ভঞ্জন প্রভৃতি অলৌকিক কার্য্য করেছিলেন। পদ্মলোচন আপনারে অবতার বলে মানাবার জন্য সহরে হুজুক তুলে দিলেন যে, "তিনি এক দিন বারো জনের খাবার জিনিসে এক শ লোক খাইয়ে দিলেন"; কাণা খোঁড়ারা সর্ব্বদাই হাতা বেড়ির, ধ্বজবজ্রাঙ্কুশযুক্ত

পদ্মহস্ত, পাবার প্রতীক্ষায় দরজায় দাঁড়িয়ে থাকেন,…প্রভৃতি নানাবিধ বুজরুকি প্রকাশ কত্তে লাগলেন। এই সকল শুনে চতুষ্পাঠীওয়ালা মহাপুরুষরা মড়কের মত নাচতে লাগলেন—টাকার এমনি প্রতাপ যে, চন্দ্রকে দেখে রত্নাকর সাগরও কেঁপে ওঠেন,—অন্যের কি কথা। ময়রার দোকানে যত রকমারি মাছি, বসন্তি বোল্‌তা আর ভোঁভুঁয়ে ভোমরা দেখা যায়, বইয়ের দোকানে তার কটা থাকে—সেথায় পদার্থহীন উই পোকারা—আনসাড়ে আরসুলোর দল, আর দু'একটা গোডিমওয়ালা ফচ্‌কে নেংটি ইঁদুর মাত্র!

হঠাৎ টাকা হলে মেজাজ যে রকম গরম হয়, এক দম গাঁজাতেও তত হয় না; "হঠাৎ অবতার" হয়েও পদ্মলোচনের আশা নিবৃত্তি হয় নাই—বাদসাই পেলেই যে সে আশা নিবৃত্তি হবে তারও সম্ভাবনা কি! কিছুদিনের মধ্যে পদ্মলোচন কলিকাতা শহরের এক জন প্রধান হিন্দু হয়ে পড়েন—তিনি হাই তুল্লে হাজার তুড়ি পড়ে—তিনি হাঁচলে জীব! জীব! জীব! শব্দে ঘর কেঁপে ওঠে! ওরে! ওরে! হুজুর ও "যো হুকুমের" হল্লা পড়ে গেল, ক্রমে সহরের বড় দলে খপর হলো যে কলকাতার ন্যাচ্‌র্যাল হিষ্ট্রীর দলে একটি নম্বরে বাড়লো!

ক্রমে পদ্মলোচন নানা উপায়ে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় কত্তে লাগলেন, অবস্থার উপযুক্ত একটি নতুন বাড়ি কিন্‌লেন, সহরের বড়মানুষ হুলে যে সকল জিনিসপত্র ও উপাদানের আবশ্যক, সভাস্থ আত্মীয় ও মোসাহেবেরা ক্রমশঃ সেই সকল জিনিষ সংগ্রহ করে ভাণ্ডার ও উদর পুরে ফেল্লেন।….

হায়! যাদের জন্মগ্রহণে বঙ্গভূমির দুরবস্থা দূর হবার প্রত্যাশা করা যায়, যারা প্রভূত ধনের অধিপতি হয়ে স্বজাতি সমাজ ও বঙ্গভূমির মঙ্গলের জন্য কায়মনে যত্ন নেবে, না সেই মহাপুরুষরাই সমস্ত ভয়ানক দোষ ও মহাপাপের আকর হয়ে বসে রইলেন, এর বাড়া আর আক্ষেপের বিষয় কি আছে? আজ একশ বৎসর অতীত হলো, ইংরেজরা এ দেশে এসেচেন, কিন্তু আমাদের অবস্থার কি পরিবর্ত্তন হয়েচে? সেই নবাবী আমলের বড়মানুষী কেতা, সেই পাকানো কাছা, সেই কোঁচান চাদর, লপেটা জুতো ও বাবরি চুল আজও দেখা যাচ্ছে, বরং গৃহস্থ মধ্যস্থ লোকের মধ্যে পরিবর্তন দেখা যায়, কিন্তু আমাদের হুজুরেরা যেমন তেমনিই রয়েছেন! আমাদের ভরসা ছিল, কেউ হঠাৎ বড়মানুষ হলে রিফাইন্ড গোছের বড়মানুষীর নজির হবে কিন্তু পদ্মলোচনের দৃষ্টান্তে আমাদের সে আশা

সমূলে নির্ম্মূল হয়ে গেল—পদ্মলোচন আবার কফিন চোরের বেটা ম্যাক্‌মারা হয়ে পড়লেন।....

পদ্মলোচনের গুটি চার ছেলে হয়েছিল, ক্রমে জ্যেষ্ঠটি বড় হয়ে উঠলো সুতরাং তাঁর বিবাহে বিলক্ষণ ধুমধাম হবার পরামর্শ হতে লাগলো!

ক্রমে বড়বাবুর বিয়ের উজ্জুগ হতে লাগলো, ঘটক ও ঘট্‌কীরা বাড়ি বাড়ি মেয়ে দেখে বেড়াতে লাগলেন—"কুলীনের মেয়ে, দেখতে পরমা সুন্দরী হবে, দশ টাকা যোত্তোর থাকবে" এমনটি শীগ্‌গির ফুটে ওঠা সোজা কথা নয়; শেষে অনেক বাছা গোছা ও দেখা শোনার পর সহরের আগ্‌ড়োম ভোঁম সিঙ্গির লেনের আত্মারাম মিত্তিরের পৌত্তুরীরই ফুল ফুটলো! আত্মারামবাবু খাস হিন্দু, কাপ্তেনির কর্ম্মে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় করেছিলেন, আত্মারাম বাবুর সংসারও রাবণের সংসার বল্লে হয়—সাত সাতটি রোজগেরে বেটা, পরীর মত পাঁচ মেয়ে আর গড়ে গুটি চল্লিশে পৌত্তুর পৌত্তুরী, এ সওয়ায় ভাগ্নে জামাই কুটুম্ব-সাক্ষাৎ বাড়িতে গিজ-গিজ করে—সুতরাং সর্ব্বগুণাক্রান্ত আত্মারাম পদ্মলোচনের বেয়াই হবার উপযুক্ত স্থির হলেন; শুভ লগ্নে মহা আড়ম্বর করে লগ্নপত্রে বিবাহের স্থির হলো, দলস্থ সমুদায় ব্রাহ্মণরা মর্য্যাদা মত পত্রের বিদেয় পেলেন, রাজভাট ও ঘটকেরা ধন্যবাদ দিতে দিতে চল্লো; বিয়ের ভারী ধুম। সহরে হুজুক উঠ্‌লো পদ্মলোচন বাবুর ছেলের বিয়েয় পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ—গোপাল মল্লিক ছেলের বিয়েতে খরচ করেছিলেন বটে, কিন্তু এত নয়।

দিন আস্‌চে; দেখতে দেখতেই এসে পড়ে, ক্রমে বিবাহের দিন ঘুনিয়ে এলো—বিয়েবাড়িতে নহবত বসে গেল। অধ্যক্ষ ভট্টাচার্য্য ও দলস্থদের ঘোঁট বাদান সুরু হলো—ত্রিশ হাজারা জোড়া শাল, সোনার লোহা, ও ঢাকাই সাড়িওয়ালা দু লক্ষ সামাজিক ব্রাহ্মণপণ্ডিত দলে বিতরণ হলো, বড়মানুষদের বাড়িতেও শাল ও সোনাওয়ালা লোহা, ঢাকাই কাপড়, গ্যাঁদ্‌ড়া কন্দক্‌, গোলাব ও আতর, ও এক এক জোড়া শাল সওগাত পাঠান হলো; কেউ কেউ আদর করে গ্রহণ কল্লেন, কেউ কেউ বলে পাঠালেন যে আমরা ঢুলী বা বাজান্দরে নই যে শাল নেবো! কিন্তু পদ্মলোচন হঠাৎ অবতার হয়ে শ্রীরামচন্দ্রের মত আত্মবিস্মৃত হয়েছিলেন সুতরাং সে কথা গ্রাহ্য কল্লেন না! পারিষদ, মোসাহেব ও বিবাহের অধ্যক্ষেরা বলে উঠ্‌লেন—ব্যাটার অদৃষ্টে নেই!

এদিকে বিয়ের বাইনাচ আরম্ভ হলো, কোথাও রূপোর বালা, লাল কাপড়ের তকমা ও উর্দ্দীপরা চাকরেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোথাও অধ্যক্ষরা গড়ের বাজনা আন্‌বার পরামর্শ কচ্চেন—কোথাও বরের সজ্জা তৈরির জন্য দর্জীরা একমনে কাজ কচ্চে—চার দিকেই হৈ হৈ ও রৈ রৈ শব্দ—বাবুর দেওয়া শালে সহরের রাস্তার অর্দ্ধেক লোকই লালে লাল হয়ে গেল, ঢুলী ও বাজন্দরেরা তো অনেকের বিয়েতেই পুরনো শাল পেয়ে থাকে কিন্তু পদ্মলোচনের ছেলের বিয়েয় ভদ্দর লেকেও শাল পেয়ে লাল হয়ে গেলেন।

১২ই পৌষ শনিবার বিবাহের লগ্ন স্থির হয়েছিল, আজ ১২ই পৌষ; আজ বিবাহ। আমরা পূর্ব্বেই বলেছি যে সহরে ঢি ঢি হয়ে গিয়েছিল যে "পদ্মলোচনের ছেলের বিয়েয় পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ" সুতরাং বিবাহের দিন বৈকাল হতে রাস্তায় ভয়ানক লোকারণ্য হতে লাগলো, পাহারা-ওয়ালারা অতি কষ্টে গাড়ি ঘোড়া চলবার পথ করে দিতে লাগলো। ক্রমে সন্ধ্যার সময় বর বেরুলো— প্রথমে কাগজের ও অব্বরের হাত ঝাড়, পাঞ্জা ও সিঁড়ি ঝাড়, রাস্তার দু' পাশে চল্লো, ঐ রেশালার আগে আগে দুটি চল্‌তি নবৎ ছিল, তার পেছনে গেট—দালান ও কাগজের পাহাড়—পাহাড়ের ওপর হর পার্ব্বতী, নন্দী, ষাঁড়, ভৃঙ্গী, সাপ ও নানা রকম গাছ—তার পেছনে ঘোড়াপংখী, হাতীপংখী, উটপংখী ও ময়ূরপংখী; পংখী-গুলির ওপরে বারোজন করে দাঁড়ি, মেয়ে ও পুরুষ সওদাগর সাজা, ও দুটি করে ঢোল। তার আশে পাশে তক্তানামার ওপরে "মগের নাচ" "ফিরিঙ্গীর নাচ" প্রভৃতি নানা প্রকার সাজা সং! তার পশ্চাৎ এক শ ঢোল, চল্লিশটি জগঝম্প ও গুটি ষাইটেক্‌ ঢাক, মায় রোশন-চৌকি—শানাই, ভোড়ং ও ভেঁপু—তার কিছু অন্তরে এক দল নিমখাসা রকমের চুনোগলির ইংরিজি বাজনা। মধ্যে বাবুর মোসাহেব, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, পারিষদ, আত্মীয় ও কুটুম্বরা। সকলেরই একরকম শাল, মাথায় রুমাল জড়ান, হাতে এক এক গাছি ইষ্টিক; হঠাৎ বোধ হলো যেন এক কোম্পানি ডিজার্মড্‌ সেপাই। এই দলের দুই ধারে লাল বনাতের খাসগোলাপ, ও রুপোর ডাণ্ডতে রেশমের নিশেন ধরা তক্‌মাপরা মুটে ও ক্ষুদে ক্ষুদে ছোঁড়ারা, মধ্যে খোদ বরকর্তা, গুরু, পুরোহিত, বাছালো বাছালো ভুঁড়ে ভুঁড়ে ভট্‌চায্যি ও আত্মীয় অন্তরঙ্গরা; এর পেছনে রাঙ্গামুখো ইংরিজি বাজনা, সাজা সায়েব তুরুকসওয়ার, বরের ইয়ারবক্স, খাস দরওয়ানরা, হেড

খান্‌সামা ও র‍ুপোর স‍ুখাসনে বর ; স‍ুখাসনখানির চার দিকে মায় বাতি বেললণ্ঠান টাঙ্গান, সামনে র‍ুপোর দশ-ডেলে বসা ঝাড়, দ‍ুই পাশে চামরধরা দ‍ুটো ছোঁড়া ; শেষে বরের তোরঙ্গ, প্যাটরা, বাড়ির পরামাণিক, সোনার দানা গলায় ব‍ুড়ি ব‍ুড়ি গ‍ুট কত দাসী ও বাজে লোক, তার পেছনে বরযাত্রীর গাড়ির সার—প্রায় সকলগ‍ুলির উপরে এক এক চাকর, ডবল বাতি দেওয়া হাতলণ্ঠন ধরে বসে যাচ্চে ।

ব্যাণ্ড, ঢাক, ঢোল ও নাগরার শব্দে, লোকের রল্লা ও অধ্যক্ষদের মিছিলের চীৎকারে কল্‌কেতা কাঁপতে লাগ্‌লো, অপর পাড়ার লোকেরা তাড়াতাড়ি ছাতে উঠে মনে কল্লে ওদিকে ভয়ানক আগ‍ুন লেগে থাকবে, রাস্তার দ‍ুধারি বাড়ির জানালা ও বারাণ্ডা লোকে প‍ুরে গেল,···হ‍ুতোম প্যাঁচা অন্তরীক্ষ থেকে নক্‌শা নিতে লাগ্‌লেন—ক্রমে বর কনেবাড়ি পেশীছল । কন্যাকর্ত্তারা আদর ও সম্ভাষণ করে বরযাত্তোরদের অভ্যর্থনা কল্লেন—পাড়ার মৌতাতী ব‍ুড়ো ও বওয়াটে ছোঁড়ারা গ্রামভাটির জন্য বরকর্ত্তাকে ঘিরে দাঁড়ালো—বর সভায় গিয়ে বসলেন, ভাটেরা ছড়া পড়তে লাগলো, মেয়েরা বারাণ্ডা থেকে উঁকি মাত্তে লাগ্‌লো, ঘটকরা মিত্তিরবাব‍ু ও দত্তবাব‍ুর কুলজী আউড়ে দিলে ; মিত্তিরবাব‍ু কুলীন স‍ুতরাং বল্লালী রেজেষ্টরীতে তাঁর বংশাবলি রেজেষ্টরী হয়ে আছে, কেবল দত্তবাব‍ুর বংশাবলিটি বানিয়ে নিতে হয় !

ক্রমে বরযাত্র ও কন্যাযাত্রেরা সাপ্টা জলপান করে বিদেয় হলেন, বর স্ত্রী আচারের জন্য বাড়ির ভিতরে গেলেন । ছাঁদনাতলায় চারটি কলাগাছের মধ্যে আলপনা দিয়ে একটি পিঁড়ে রাখা হয়েছিল, বর চোরের মত হয়ে সেইখানে দাঁড়ালেন, মেয়েরা দাড়া গ‍ুয়া পান, বরণডালা, মঙ্গলের ভাঁড়ওয়ালা কুলো ও পিদ্দিম দিয়ে বরণ কল্লেন, শাঁক বাজানো ও উল‍ু উল‍ুর চোটে বাড়ি সরগরম হয়ে উঠ্‌লো, ক্রমে মাগ শাশ‍ুড়ী এয়োরা সাত বার বরকে প্রদক্ষিণ কল্লেন—শাশ‍ুড়ী বরের হাতে মাকু দিয়ে বল্লেন, "হাতে দিলেম মাকু একবার ভ্যা কর ত বাপ‍ু !" বর কলেজ বয়, আড়-চকে এয়োদের পানে তাকাচ্ছিলেন···স‍ুতরাং "মনে মনে কল্লেম" বল্লেন—অমনি শালজরা কান মলে দিলে, শালীরা গালে ঠোনা মাল্লে ; শেষ গ‍ুড় চাল, তুক্‌ তাক্‌ ও ওষ‍ুদ বিশ‍ুদ ফ‍ুর‍ুলে উচ্ছ‍ুগ্‌গ‍ু করবার জন্য কনেকে দালানে নিয়ে যাওয়া হলো, শাস্ত্রমত মন্ত্র পড়ে কনে উচ্ছুগ্‌গ‍ু হলেন, প‍ুর‍ুত ও ভট্টাচার্য্যরা সন্দেশের সরা নিয়ে সল্লেন, বরকে বাসরে নে যাওয়া হলো ।

বাসরটিতে আমোদের চূড়ান্ত হয়।····

বাসি বিয়ের উজ্জুগ হতে লাগ্‌লো। হলুদ ও তেল মাখিয়ে বরকে কলতলায় কনের সঙ্গে নাওয়ান হলো, বরণডালায় বরণ ও কতক কতক তুক্‌তাকের পর, বর কনের গাটছারা কিছুক্ষণের পর খুলে দেওয়া হয়।

এদিকে ক্রমে বরযাত্র ও বরের আত্মীয় কুটুম্বরা জুটতে লাগ্‌লেন, বৈকালে পুনরায় সেই রকম মহাসমারোহে বর কনেকে বাড়ি নে যাওয়া হলো, বরের মা বর কনেকে বরণ করে ঘরে তুল্লেন, এক কড়া দুধ দরজার কাছে আগুনের ওপর বসান ছিল, কনেকে সেই দুধের কড়াটি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলো, "মা! কি দেখ্‌চো? বল যে আমার সংসার উতলে পড়্‌চে দেখচি।" কনেও মনে মনে তাই বল্লেন। এ সওয়ায় পাঁচ গিন্নিতে নানা রকম তুক্‌তাক্‌ কল্লে পর বর কনে জিরুতে পেলেন, বিয়ে বাড়ির কথঞ্চিৎ গোল চুক্‌লো—ঢুলীরা ধেনো মদ খেয়ে আমোদ কত্তে লাগলো, অধ্যক্ষরা প্রলয় হিন্দু সুতরাং একটা একটা আগাতোলা দুর্গোমণ্ডা ও এক ঘটি গঙ্গাজল খেয়ে বিছানায় আড় হলেন, বর কনে আলাদা আলাদা শুলেন ····বে বাড়ির বড়গিন্নির মতে আজকের রাত—কালরাত্তির।

শীতকালের রাত্তির শিগ্‌গির যায় না। এক ঘুম, দু'ঘুম, আবার প্রস্রাব করে শুলেও বিলক্ষণ এক ঘুম হয়; ক্রমে গুড়ুম করে তোপ পড়ে গেল—প্রাতঃস্নানে মেয়েগুলো বক্‌তে বক্‌তে রাস্তা মাথায় করে যাচ্চে,—বুড়ো বুড়ো ভট্‌চাযিরা স্নান করে "মহিম্নঃ পারন্তেঃ" মহিম্নস্তব আওড়াতে আওড়াতে চললেন।····

ক্রমে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ফুলশয্যার তত্ত্ব এলো, পদ্মলোচন মহাসমাদরে কনের বাড়ির চাকরাণীদের অভ্যর্থনা কল্লেন, প্রত্যেককে একটি করে টাকা ও একখানি করে কাপড় বিদেয় দিলেন। দলস্থ ও আত্মীয়রা কিছু কিছু করে অংশ পেলেন, ঢাকী ঢুলী ও রেশালার লোকেরা বক্‌সিস পেয়ে বিদেয় হলো; মহাসমারোহে পাঁচ লক্ষ টাকার বিবাহ শেষ হয়ে গেল; কোন কোন বাড়ির গিন্নিরা সামিগ্রী পেয়ে হাঁড়ি পুরে পুরে শিকেয় টাঙ্গিয়ে রাখলেন, অধিক অংশ পচে গেল, কতক বেরালে ও ইঁদুরে খেয়ে গেল, তবু পেট ভরে খওয়া কি কারেও বুক বেঁধে দিতে পাল্লেন না—বড়মানুষ-দের বাড়ির গিন্নিরা প্রায়ই এই রকম হয়ে থাকেন, ঘরে জিনিস পচে গেলেও লোককে হাত তুলে দিতে মায়া হয়। শেষে পচে গেলে মহারাণীর খানায় ফেলে দেওয়া হবে সেও ভাল। কোন কোন বাবুরও এ স্বভাবটি

আছে—সহরের এক বড়মানুষের বাড়িতে পূজার সময় নবমীর দিন গুটি ষাইটেক্ পাঁঠা বলিদান হয়ে থাকে; পূর্ব্বপরম্পরায় সেগুলি সেই দিনেই দলস্থ ও আত্মীয়দের বাড়ি বিতরিত হয়ে আসচে, কিন্তু আজকাল সেই পাঁঠাগুলি নবমীর দিন বলিদান হলেই গুদোমজাত হয়; পূজোর গোল চুকে গেলে পূর্ণিমার পর সেইগুলি বাড়ি বাড়ি বিতরণ হয়ে থাকে; সুতরাং ছয় সাত দিনের মরা পচা পাঁঠা কেমন উপাদেয়, তা পাঠক! অপনিই বিবেচনা করুন। শেষে গ্রহীতাদের সেই পাঁঠা বিদেয় কত্তে ঘর হতে পয়সা বার কত্তে হয়। আমরা যে পূর্ব্বে আপনাদের কাছে সহরের সর্দ্দার মূর্খের গল্প করেচি, ইনিই তিনি।

এদিকে ক্রমে বিবাহের গোল চুকে গেল, পদ্মলোচন বিষয় কর্ম্ম কত্তে লাগলেন। তিনি নিত্য নৈমিত্তিক দোল, দুর্গোৎসব, প্রভৃতি বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ ফাঁক দিতেন না; ঘেঁটুপূজোতেও চিনির নৈবিদ্দি ও সকের যাত্রা বরাদ্দ ছিল।····নিজের ছেলের বিবাহের সময় তিনি আগে চল্লিশ জন আইবুড়ো বংশজের বিবাহ দিয়ে দেন। ইংরিজি লেখাপড়ার প্রাদুর্ভাবে, রামমোহন রায়ের জন্মগ্রহণে ও সত্যের জ্যোতিতে হিন্দুধর্মের যে কিছু দুরবস্থা দাঁড়িয়েছিল, তিনি কায়মনে পুনরায় তার অপনয়নে কৃতসংকল্প হলেন। কিন্তু তিনি, কি তাঁর ছেলেরা দেশের ভালোর জন্য এক দিনও উদ্যত হন নি—শুভ কর্ম্মে দান দেওয়া দূরে থাকুক, সে বৎসরের উত্তর পশ্চিমের ভয়ানক দুর্ভিক্ষেও কিছুমাত্র সাহায্য করেন নি, বরং দেশের ভালো করবার জন্য কেউ কোন প্রস্তাব নিয়ে তাঁদের কাছে উপস্থিত হলে তারে কৃশ্চান ও নাস্তিক বলে তাড়িয়ে দিতেন—এক শ বেলেল্লা বামুন ও দুই শ মোসাহেব তাঁর অন্নে প্রতিপালিত হতো—তাতেই পদ্মলোচনের বংশ মহান্ পবিত্র বলে সহরে বিখ্যাত ছিল। লেখাপড়া শেখা বা তার উৎসাহ দেওয়ার পদ্ধতি পদ্মলোচনের বংশে ছিল না, সুদ্ধ নামটা সই কত্তে পাল্লেই বিষয় রক্ষা হবে, এই তাঁদের বংশপরম্পরার স্থির সংস্কার ছিল। সরস্বতী ও সাহিত্য ভদ্রলোকদের সঙ্গে ঐ বংশের সম্পর্ক রাখতেন না! উনবিংশতি শতাব্দীতে হিন্দুধর্মের জন্য সহরে কোন বড়মানুষ তাঁর মত পরিশ্রম স্বীকার করেন নাই। যেরকম কাল পড়েছে, তাতে আর কেউ যে তাদৃক যত্নবান হন; তারো সম্ভাবনা নাই। তিনি যেমন হিন্দুধর্মের বাহ্যিক গোঁড়া ছিলেন, অন্যান্য সৎকর্মেও তাঁর তেমনি বিদ্বেষ ছিল; বিধবাবিবাহের নাম শুনলে তিনি কানে হাত

দিতেন—ইংরিজি পড়লে পাছে খানা খেয়ে কৃশ্চান হয়ে যায়, এই ভয়ে তিনি ছেলেগুলিকে ইংরিজি পড়ান নি—অথচ বিদ্দেসাগরের উপর ভয়ানক বিদ্বেষ নিবন্ধন সংস্কৃত পড়ানও হয়ে ওঠে নাই বিশেষত শূদ্রের সংস্কৃততে অধিকার নাই এটিও তাঁর জানা ছিল, সুতরাং পদ্মলোচনের ছেলেগুলিও "বাপকা বেটা—সেপাইকা ঘোড়া"র দলেই পড়ে।

কিছু দিন এই রকম অদৃষ্টচর লীলা প্রকাশ করে আশী বৎসর বয়সে পদ্মলোচন দেহ পরিত্যাগ কল্লেন—মৃত্যুর দশ দিন পূর্ব্বে এক দিন হঠাৎ অবতারের সর্ব্বাঙ্গ বেদনা করে। সেই বেদনাই ক্রমে বলবতী হয়ে তাঁরে শয্যাগত কল্লে—তিনি প্রকৃত হিন্দু, সুতরাং ডাক্তারি চিকিৎসায় ভারি দ্বেষ কত্তেন, বিশেষতঃ তাঁর ছেলেবেলা পর্য্যন্ত সংস্কার ছিল ডাক্তারি ওষুধ মাত্রেই মদ মেশান, সুতরাং বিখ্যাত কবিরাজ মশাইদের দ্বারা নানা প্রকার চিকিৎসা করান হয় কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না, শেষে আত্মীয়রা কবিরাজ মশাইদের সঙ্গে পরামর্শ করে শ্রীশ্রী৺ভাগীরথীতটস্থ কল্লেন; সেখানে তিনি রাত্তির বাস করে মহাসমারোহে প্রায়শ্চিত্তের পর সজ্ঞানে রাম ও হরিনাম জপ কত্তে কত্তে প্রাণত্যাগ করেন।

পাঠকগণ! আপনারা অনুগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে বহুদূর এসেছেন। যে পদ্মলোচন আপনাদের সম্মুখে জন্মালেন আবার মলেন তাঁর সুদ্ধ নিজের চরিত্র আপনারা অবগত হলেন এমন নয়, সহরের বড়মানুষদের মধ্যে অনেকেই পদ্মলোচনের জুড়িদার, কেউ কেউ দাদা হতেও সরেস! যে দেশের বড়লোকের চরিত্র এই রকম ভয়ানক, এই রকম বিষময়, সে দেশের উন্নতি প্রার্থনা করা, নিরর্থক! যাঁদের হাতে উন্নতি হবে, তাঁরা আজও পশু হতেও অপকৃষ্ট ব্যবহারের সর্বদাই পরিচয় দিয়ে থাকেন, তাঁরা ইচ্ছা করে আপানা আপনি বিষময় পথের পথিক হন; তাঁরা যে সকল দুষ্কর্ম করেন, তার যথারূপ শাস্তি নরকেও দুষ্প্রাপ্য।

জন্মভূমি-হিতচিকীর্ষুরা আগে এই সকল মহাপুরুষদের চরিত্র সংশোধন করবার যত্ন পান, তখন দেশের অবস্থায় দৃষ্টি করবেন, নতুবা বঙ্গদেশের যা কিছু উন্নতি প্রার্থনায় যত্ন নেবেন, সকলই নিরর্থক হবে।

আলালের ঘরের দুলাল লেখক-বাবু টেকচাঁদ ঠাকুর বলেন "সহরের মাতাল বহুরূপী" কিন্তু আমরা বলি, সহরের বড়মানুষরা নানারূপী—এক এক বাবু এক এক তরো, আমরা চড়কের নক্‌শায় সেগুলির প্রায়ই

গড়ে বর্ণন করেচি, এখন ক্রমশ তারই সবিস্তার বর্ণন করা যাবে—তারি প্রথম উঁচু দল খাস হিন্দু ; এই হঠাৎ অবতারের নক্শাতেই আপনারা সেই উঁচু-কেতার খাস হিন্দু দলের চরিত্র জানতে পার্ব্বেন—এই মহাপুরুষেরাই রিফর্মেশনের প্রবল প্রতিবাদী—বঙ্গসুখসৌভাগ্যের প্রলয় কণ্টক ও সমাজের কীট !

হঠাৎ অবতারের প্রস্তাবে পাঠকদের নিকট আমরাও কথঞ্চিৎ আত্ম-পরিচয় দিয়ে নিয়েছি ; আমরা ক্রমে আরো যত ঘনিষ্ঠ হবো, ততই রং ও নক্শার মাজে মাজে সং সেজে আসবো—আপনারা যত পারেন হাততালি দেবেন ও হাসবেন !

হাবা

গিরীশচন্দ্র ঘোষ

ভিজিতে ভিজিতে বিশ্বনাথ গোলপাতার ছাতা ঘাড়ে করিয়া বাড়ীতে আসিলেন।

গৃহিণী বলিলেন,—"না ভিজলে নয় ?"

বিশ্বনাথ উত্তর করিলেন,—"স্ত্রীলোকটি মারা যায়।"

গৃ। এখন তুমি যে মারা যাও, তার কি ? বেলা তৃতীয় প্রহর, এখনও উদরে অন্ন নাই, ভোরের বেলা এমন দুর্যোগেও বাহির হইয়াছ।

বি। কি জান, পরোপকার পরমধর্ম্ম। শিশু সন্তানটি জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা, তুমি যে বাইরে গেলে, আমার পুজার জুতো আনিবে বলেছিলে, তা কৈ আমাকে দাও।" কুক্ষণে বিশ্বনাথের মনে উদয় হইল, "আমি অভাগা, পরোপকারক ! আমার উপকার কই ?"

বিশ্বনাথ আহারাদি করিয়া শয়ন করিলেন। এমন সময়ে তাঁহাকে এক ব্যক্তি বাহির্ব্বাটীতে ডাকিল। তিনি দেখা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে গা ?" আগন্তুক উত্তর করিল,—"হরমণির চরমকাল উপস্থিত, আপনাকে কি বলিবেন।" বিশ্বনাথ উত্তর করিলেন,—"যাও, যাচ্চি।" কিন্তু গেলেন না। পুজার সময় বিশ্বনাথ ছেলেটিকে জুতো দিতে পারেন নাই, এই ক্ষোভ তাঁহার হৃদয়ে বলবান্ হইতে লাগিল। অনেক উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, পরের জন্য সকলই ব্যয় হইয়াছে, আজ সেই ক্ষোভ হইল। তেমন বয়স নয় যে, পুনরায় উপার্জ্জন করিতে পারেন। যাহা আয় আছে, সংসার নির্ব্বাহ হয়—মোটা ভাত, মোটা কাপড় ; তাহাতে আর বিশ্বনাথের তৃপ্তি নাই। কোথায় অর্থ পাইব, কি হইলে অর্থ হইবে, এই ভাবনায় ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। এমন সময় বহির্ব্বাটীতে আবার ডাক হইল,—"বিশ্বনাথ বাবু বাড়ীতে আছেন ?" বিশ্বনাথ বাহিরে গেলেন, আগন্তুককে বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ ?" আগন্তুকের নাম কেনারাম। উত্তর করিলেন,—"মহাশয়ের কৃপায় যে চাকরীটুকু পাইয়াছিলাম, তাহা যায় যায় হইয়াছে, দশজনের কথায় রায় বাহাদুর আমায় চোর

ঠাওরাইয়াছেন।" বিশ্বনাথ উত্তর করিলেন,—"আমি কি করিব?"

কে। দুই এক কথা আমার হয়ে বলে দিবেন।

বি। আমার লাভ?

কেনারাম উত্তর বুঝিতে পারিলেন না। "লাভ" এ কথা বিশ্বনাথের মুখে পূর্ব্বে কখন শুনেন নাই; সুতরাং উত্তর করিলেন,—"আজ্ঞে?" বিশ্বনাথ বলিলেন—"আজ্ঞে রাখ। লাভ এ কথার অর্থ বুঝ না?" কেনারাম কেমন কেমন হইয়া বলিলেন,—"তাই ত, তাই ত!" কেনারামের কার্য্যসিদ্ধি হইল না। বিশ্বনাথেরই কিছুই ভাল লাগে না। যাহার জুতার জন্য তাঁহার মন বিচলিত হইয়াছে, তাহাকেও দেখিলে তাঁহার রাগ হয়। মনে ভাবেন, "পল্লীতে এমন কে আছে যে, আমার দ্বারা উপকৃত হয় নাই? কেহ লাটসাহেবের দেওয়ান, কেহ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, কাহারও একমাত্র সন্তান আমার যত্নেই বাঁচিয়াছে, কাহারও আমার অর্থে জেল নিবারণ হইয়াছে, কিন্তু আমার দৈন্যদশা কে দেখে?" পরোপকার যে সুদে খাটাইবার জিনিষ নয়, তাহা বিশ্বনাথ বুঝিতে পারিলেন না। বলিয়াছি বিশ্বনাথের কিছুই ভাল লাগে না, ক্রমে ঘরে দোর দিলেন, গৃহিণীরও প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। তিনি অর্থোপার্জ্জনের নানাপ্রকার উপায় অবধারিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার বিবেচনায় পরপীড়ন ব্যতীত অর্থোপার্জ্জন হয় না, এই কথাই সাব্যস্ত হইল। "পরপীড়ন করিব? ক্ষতি কি?" একবার একটু ক্ষতি মনে উদয় হইয়াছিল, তাহা রহিল না। সাব্যস্ত হইল, পরপীড়ন করিব। বিশ্বনাথ ঘরের দোর খোলেন না।

দোর খুলিয়া দেখিলেন, ঘনঘটাবৃত রজনী, টিপ টিপ বৃষ্টি পড়িতেছে, আকাশে তারা নাই, স্বভাবে শব্দ নাই। কেবল এক একবার রোদনস্বরে সমীরণ বহিতেছে। দেখিতে দেখিতে অন্ধকার ভয়ঙ্কর বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু তথাচ বিশ্বনাথ বাহিরে যাইবেন না। এরূপ যাওয়া বিচিত্র নহে। অনাথা বা অভাগিনীর রোদনাশ্রু মুছাইতে বার বার গিয়াছেন, কিন্তু আজ অন্ধকারের প্রতি লক্ষ্য হইল। মনে মনে কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রবাবুর চরমকাল উপস্থিত, তাহা তিনি জানেন। দেবেন্দ্রবাবুর অতুল ঐশ্বর্য্য, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি চক্ষু মুদিলে শিশু সন্তানগুলি অনাথ হইবে, কারণ তাঁহার আত্মীয় কেহই নাই। দেবেন্দ্রবাবুর রুগ্নশয্যাগারে লোকের অভাব নাই, সকলেই দেবেন্দ্রবাবুর নিমিত্ত যে প্রাণ দিতে হইবে না, সেই প্রাণ দেবার জন্য প্রস্তুত। কোঁচা বা

অঞ্চল বার বাব চক্ষে উঠিতেছে। কিন্তু একটি রমণী তাঁহার শিয়রে বসিয়া আছে, সে চক্ষু মুছিতেছে না। সৌদামিনীকে পূর্ণযৌবনা বলিলেও বলা যায়, অল্পবয়সে দুটি সুসন্তান হইয়াছে। সৌদামিনী পরম লজ্জাশীলা, কিন্তু আজ লজ্জা নাই। মনে মনে দশবার করিয়াছেন যে, একবার বাহিরে যাইয়া কাঁদি, কিন্তু সে সময়ে যদি দেবেন্দ্র একবার ইঙ্গিত করে—"জল চাই বা বাতাস চাই" কে সে ইঙ্গিত বুঝিবে? পতিপরায়ণা সৌদামিনী কাঁদিবার অবকাশ পান নাই। এমন সময়ে বিশ্বনাথ উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার-বাবুকে ইঙ্গিত করিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন। কি কথা কহিলেন, পুনর্ব্বার ঘরে প্রবেশ করিলেন। সৌদামিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা, আহার হইয়াছে?" এ কথায় সৌদামিনীর চোখে জল আসিল, কিন্তু উত্তর করিতে পারিলেন না, বিশ্বনাথ কথার প্রতীক্ষা করিলেন না, বাহিরে গেলেন, সকলেই বুঝিল যে, সৌদামিনীর নিমিত্ত আহার আনিতে যাইতেছেন। কারণ, এইরূপই বিশ্বনাথের কার্য্য। বিশ্বনাথ খাদ্যসামগ্রী লইয়া আসিলেন, যেন সেই অবস্থায় চিরদিন আনিতেন, কার্য্য সমান হইল, কিন্তু সে ভাব নাই, সৌদামিনীকে বলিলেন, "আমি শিয়রে

বসিতেছি, তুমি বাহিরে যাইয়া যৎকিঞ্চিৎ আহার কর।" ক্ষুধার অনুরোধে যত হ'ক বা না হ'ক, বিশ্বনাথের কথার অনুরোধে সৌদামিনী উঠিতে বাধ্য হইলেন। বিশ্বনাথ শিয়রে বসিলেন, সকলকে বলিলেন—"ডাক্তারবাবু

আমায় বলিয়াছেন, এত লোকসমাগম ভাল নয়।" সকলেই বাহিরে গেল। তখন বিশ্বনাথ ধীরে ধীরে দেবেন্দ্রের কর্ণে বলিতে লাগিলেন,—"দেবেন্দ্র-বাবু, দুটি ছোট ছোট ছেলে, উইল করিলে ভাল হয়।" দেবেন্দ্র উত্তর করিলেন,—"বিশ্বনাথবাবু, আমার কি এমন অবস্থা, তবে কেন সৌদামিনী বলে, আমি বাঁচিব ?" বিশ্বনাথ প্রত্যুত্তর দিলেন, "আমি তা বলিতেছি না, কিন্তু সকল অবস্থাতেই লোকের উইল করা ভাল।"

দেবেন্দ্র বলিলেন,—"বুঝিলাম, কিন্তু সৌদামিনী যেন এ কথা না শুনে।"

বিশ্বনাথ বলিলেন,—"শুনা আবশ্যক! কারণ, তিনি ব্যতীত অছি হইবার জন্য কাহাকেও দেখি না। অছির সকল বৃত্তান্ত জানা আবশ্যক।"

দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন,—"কেন মহাশয়, আপনি হউন না ?"

বিশ্বনাথ উত্তর করিলেন,—"আমার ইচ্ছা বটে, কিন্তু ভয় পাই, পাঁচজনে কি বলিবে।"

দে। "পাঁচজনে যাহাই বলুক, কিন্তু আপনাকে ইহা স্বীকার পাইতে হইবে। সৌদামিনী ছেলেমানুষ, আমার সন্তানগুলির আর উপায় দেখি না।"

বি। "ভাল, ঝঞ্ঝাট বাড়িবে, কি করিব ? আমি স্বীকৃত।"

দেবেন্দ্রের মৃত্যু হইল। সৌদামিনী তিন দিবস কাঁদিলেন। কোলের ছেলেটি একদিন মার কান্নায় কাঁদিয়াছিল, আর দুই দিন কাঁদে নাই। দাসী দুধ দিয়াছে, তাই খাইয়া পাশে বসিয়া আছে। কি জানি কেন ভরসা করিল, সৌদামিনীকে 'মা' বলিয়া ডাকিল। সৌদামিনী উঠিলেন, হাবাকে কোলে লইয়া বলিলেন,—"আমার নীরদ কোথা ?" নীরদের মা'র কাছে আসিতেও লজ্জা হইয়াছিল, কিন্তু আসিল। হাবাকে কোলে লইলেন, নীরদকে চুম্বন করিলেন মাত্র। দাস দাসীর অভাব নাই, তথাপি গৃহ জনশূন্য। এমন সময়ে একজন দাসী সঙ্গে করিয়া বিশ্বনাথ উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, মাগো, গৃহিণী পীড়িত, হরমণিকে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম, তাহার নিকট শুনিলাম, তুমি তিন দিন আহার কর নাই। শোক কর শোকেরই কারণ বটে, কিন্তু একবার ছেলেগুলিকে না দেখিলে ত নয় ? মা, চিনির পানা আনিয়াছি, একটু মুখে দাও।"

সৌদামিনী মুখে দিলেন। বিশ্বনাথ বলিলেন,—"উঠ, স্নান কর। রাধামণি দুটি প্রসাদ আনিয়াছে, তাহাও খাও। আমি আসিতেছি, তোমার

সহিত বিশেষ কথা আছে।"

সৌদামিনী তখন হাবাকে কোলে করিয়াছে, নীরদের মুখ দেখিয়াছে, "কাঁদিব" ভাবিল, "কিন্তু মরিব না।" উঠিল, রাধামণির প্রসাদও স্পর্শ করিল।

সন্ধ্যাকালে বিশ্বনাথ আসিলেন, বলিলেন,—"মা, তোমার স্বামী আমার প্রতি একটি গুরুতর ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। আমি কখন বিষয়ী নহি, এ বিষয়কার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ করিব, এই ভাবিতেছি। যদি কেহ তেমন থাকে, আমি দেখিব শুনিব, সে কার্য্য নির্ব্বাহ করে, তাহা হইলে ভাল হয়। দেখ, তুমি যুবতী, আজি তোমার নিকট দুইবার আসিতে হইল। কর্ম্মোপলক্ষে আসিতে যাইতে হইবে, তাই ভাবিতেছি।"

সৌদামিনী উত্তর করিলেন,—"বাবা, তুমি না আসিলে কে ছেলে দুটিকে দেখিবে, আর আমার ত কেহ নাই যে দেখে?"

আরও কথোপকথন হইল, সৌদামিনী ভাবিলেন, বিশ্বনাথ যথার্থই মহাত্মা।

দিন যায়, থাকে না। সৌদামিনীর মুখে সৌদামিনীর ন্যায় মাঝে মাঝে হাস্য দেখা দেয়, কিন্তু ঘনমালা ঘুচে নাই। বিশ্বনাথকে মহাত্মা জানিতেন, কিন্তু সে বিশ্বাসের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। তিনি সহজ জ্ঞানে অনুমান করিতেন যে, তাঁহার স্বামী যথেষ্ট সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আজি এ বাড়ী, কাল সে বাড়ী বেচিবার আবশ্যক নাই। বিশ্বনাথ বলেন আবশ্যক, সুতরাং স্বাক্ষর দেন কিন্তু এবার যে কথা হইতেছে, তাহাতে স্বাক্ষর দিতে তিনি ইচ্ছুক নহেন। বিশ্বনাথের আর দৈন্যদশা নাই, কিন্তু ভিজিতে ভিজিতে গোলপাতার ছাতা ঘাড়ে করিয়া গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক গ্রাসে গ্রাসে গৃহিণীর তিরস্কার খাইয়া যে সুখে ছিল, তাহা আর বিশ্বনাথের নাই।

'পরোপকার পরম ধর্ম্ম" এই কথাই প্রচার. তাহাতে এখন অনেকের বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসের উপস্বত্ব বিশ্বনাথ ভোগ করেন।

পাঠক, সেই ছেলেটিকে মনে করুন, যার জুতার নিমিত্ত বিশ্বনাথের দুর্দ্দশা।—সে মোট কাটে, সৌরভকে রাখিয়াছে, পূজাতে সৌরভের মাকে বারাণসীর সাড়ী দিয়াছে। বিশ্বনাথের তাহার সহিত দেখা হয়, ইহাতে যদি সুখ থাকে—থাকুক।

বিশ্বনাথ নীরদকেও দেখে। নীরদ তাহার পুত্রের সমবয়স্ক। মাতার প্রতি অচলা ভক্তি। যদি কখনও মাকে কাঁদিতে দেখে, ভয়ে সৌদামিনী

কাঁদে না, বলে—"মা গো, হাবাকে আমি মানুষ ক'রে তুলব আর আমি কি মোট বইতে পারিব না।" সেই সময় নীরদ একবার হাসে, নচেৎ সমবয়স্ক তাহার হাসি দেখে নাই।

রূপ কি পদার্থ বুঝিতে পারিলাম না। যখন দেবেন্দ্রের শিয়রে সৌদামিনীকে দেখিয়াছিলাম, আমাদের পরম রূপসী বলিয়া জ্ঞান হইয়াছিল। পরিচ্ছদের ত্রুটি ছিল না, বিনা পরিচ্ছদে দেখিলে দেবেন্দ্র পাছে ভয় পান, এই নিমিত্তই পরিচ্ছদ ছিল—এখন তাহার আবশ্যক নাই। ম্লানচীর, রুক্ষকেশ, চোখের কোলে কালী পড়িয়াছে, তথাপি রূপ কেন ধরে না? এ কি রূপ? এ কি সন্ন্যাসিনী? না তা ত নয়। নীরদ ও হাবা দুটি ছেলে রহিয়াছে, সন্ন্যাসিনী নয়। যদি কেহ নিরাভরণার সৌন্দর্য্য দাও, যদি কেহ পতিপরায়ণার সৌন্দর্য্য দাও, যদি কেহ স্থলপদ্মের সৌন্দর্য্য স্বীকার কর, যদি কেহ মেঘাবৃত চন্দ্রমার শোচনীয় সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া থাক, যদি কেহ মেঘমলিন দিনকরের রশ্মি পদ্মের উপর পড়িতে দেখিয়া থাক, তাহার চক্ষে সৌদামিনীর রূপ ধরিবে না।

বাতুল বিশ্বনাথ সেরূপ দেখিয়াছিল। এখন আর শিশুসন্তানের জুতার অভাব মনে নাই, সৌদামিনী সম্বন্ধে অনেক গর্হিত কার্য্য করিয়াছে, কি জানি, যদি তাহার ফলভোগ করিতে হয়? "নীরদ, নীরদের ন্যায় গম্ভীর, সকলই করিতে পারে। অধিক বয়স হইয়াছে, ক্ষতি কি? আমি মনে করিলে সৌদামিনীর ত কিছুই থাকিবে না। অনেক দিন সৌদামিনী কি বলি বলি করিয়াছে, কিন্তু বলে নাই।"

তুমি বুঝ নাই, সৌদামিনী বলি বলি করিয়াছে যে, তুমি দুরাত্মা, কিন্তু বলে নাই। বদ্ধশ্বাস বশতঃ যে উন্নত হৃদয় দেখিয়াছ, তাহা প্রেম নয়, যে লজ্জা দেখিতেছ, তাহা কি বলিব? সৌদামিনী বুদ্ধিমতী, সকলই বুঝিয়াছে। তোমায় যে বার বার ডাকে, ইচ্ছা করে, বলে,—"কেন এ অভাগিনীর সর্ব্বনাশ কর।" কিন্তু অবলা ভয়ে বলিতে পারে না।

গভীরা রজনী, আকাশে চন্দ্র হাসিতেছে, এমন সময় বিশ্বনাথ সৌদামিনীর বাটীতে উপস্থিত, বিশেষ কার্য্য। দাসী সৌদামিনীর শয়ন গৃহে লইয়া গেল, বিশ্বনাথ দাসীকে বাহিরে যাইতে বলিলেন। সৌদামিনী উঠিয়া বসিয়াছেন, কিন্তু ঘুমের ঘোর ভাঙ্গে নাই, কত রাত্রি জানেন না; অবশ্যই বিশেষ কার্য্য ভাবিলেন। বিশ্বনাথ একবার বাহিরে গিয়া কে কোথায় আছে দেখিলেন, তাহা সৌদামিনী বুঝেন নাই। অকস্মাৎ

সৌদামিনীর পদপ্রান্তে পড়িয়া বলিলেন,—"আমায় দয়া কর !" সৌদামিনী কিছুই বলিলেন না। নীরবে বাহিরে যাইয়া নীরদের নিকট বসিলেন। বিশ্বনাথ চতুর, চলিয়া গেলেন। অনেক ভাবিয়া গেলেন। কার্য্য সিদ্ধ হইল না, ঠিক বিপরীত হইল, এক সিদ্ধান্তের বিপরীত সিদ্ধান্ত কত ভাবনায় হয়, পাঠক ভাবুন, আমরা নীরদের কাছে যাই।

পরচর্চাপ্রিয় লোকের কুৎসার অভাব নাই। বিশ্বনাথ বারবার আইসে কেন ? ইহা যে জিজ্ঞাস্য, তাহা নীরদ শুনিয়াছে। আজি মাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, এত রাত্রে বিশ্বনাথ বাবু কেন আসিয়াছিলেন ?"

সৌ। তুমি কি তা জানিতে পারিয়াছ ? আমি তোমায় সেই কথাই বলিতে আসিয়াছি।

নী। মা, এ কি মা ?

সৌ। এ কি ? আর বলিব না, নীরদ, আমার বোধ হয়, যদি পুরুষের সহিত আমার না সাক্ষাৎ হইত, আমি দুঃখিনী হইতাম না।

হাবার ঘরে গেলেন, হাবা নিদ্রিত।

সৌদামিনী তাহাকে জাগাইলেন। হাবা বলিল,—"মা তুমি ত আমায় একলা আজ কেন দেখিতে আসিয়াছ ? আমি আর ভয় পাই না।"

সৌদামিনী বলিলেন,—"হাবা, ওঠ, আমার বিপদ, স্বামী নাই, তুই সন্তান, তোরে না বলিয়া কারে বলিব ?"

হাবা বোকা ছেলে, পিট্ পিট্ করিয়া চাহিল। সেই শিশু সন্তানের চাহনীতে বহু দিন পরে সৌদামিনী সুখী হইলেন।

"মা, তুমি দাদাকে বল না, দাদার গায়ে বেশী জোর, আমার গায়ে তত জোর নাই। চল মা, আমরা পালাই।" সৌদামিনীর মনে দুঃখ বলিবার স্থান ছিল না, এই নিমিত্ত এই শিশু সন্তানকে বলিতে গিয়েছিলেন, এ অবস্থা মনুষ্যের হয়। কিন্তু ছেলেটি বলিল পালাই। কেন পালাইব ? হাবা বলিয়াছে, পালাই, পালাইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু হাবা আবার বলিল,—"মা, চল পালাই, তোর আর বিশ্বনাথবাবুর সঙ্গে দেখার দরকার নাই, আমি জানি, আর তোর কিছু বিপদ নাই, সে এক একবার আদর করিয়া চায়, আমার বোধ হয়, আমায় মারতে বলে।"

হাবা,—হাবা নয়,—হাবা যেন উন্মাদ।

সৌ। হাবা, ঘুমো।

হা। না মা, চল, আমরা দুজনে পালাই। দাদা যায় ভাল, নয় আমরা

দুজনে পালাই।

পূর্ব্বদিকে স্বর্ণকান্তি মেঘ দর্শন দিল। সরোবরে নির্ম্মল হিল্লোল বহিতে লাগিল। কলনাদে বালকুল 'মা' বলিয়া ডাকিল। হাবাও ডাকিল,—"মা কই চল!"

সৌদামিনী হাবাকে অনেক বুঝাইলেন, হাবা বুঝিল না। কি জ্ঞান হাবা পাইয়াছিল, জানি না, কিন্তু কখন কখন সেই জ্ঞান মনুষ্য হৃদয়ে উদয় হয়, কারণ খুঁজিলে পাওয়া যায় না, কিন্তু সেটি সত্য! সৌদামিনী হাবাকে বুঝাইয়া রাখিলেন। যিনি অস্বীকার করুন, পুরুষমাত্রেই জানেন যে, তিনি রমণী প্রিয়; বিশ্বনাথের অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। তিনি বুঝেন নাই যে, তিনি সৌদামিনীর উপযুক্ত কিছুতেই নহেন। "কি, এত স্পর্দ্ধা, আমাকে বিমুখ করে?" তাঁহার রোষের উদয় হইল।

অবিলম্বে সৌদামিনী সর্ব্বস্বান্ত হইল। হাবা বলিল,—"এখন মা চল।"

সৌদামিনী হাবাকে কোলে লইতে চাহিলেন, ভারি ছেলে কোলে করিতে পারিলেন না। হাবা বলিল, "মা, তুই কি আমায় কোলে করিতে পার্‌বি? এখন তোমাকে কোলে করিয়া পথে লইয়া যাইব।"

সৌ। কোথায় যাবি হাবা?

হা। কুটীরে।

সৌদামিনী অশ্রুসংবরণের চেষ্টা করিতেছিলেন, হাবা বলিল,—"কেন মা, কাঁদ? খুব কাঁদ, কেঁদে চল যাই।"

সেদিন প্রাতে নীরদ বাটীতে নাই। সৌদামিনী তিন দিন অপেক্ষা করিলেন, যথাসাধ্য তত্ত্ব করিলেন, কিন্তু নীরদকে দেখিতে পাইলেন না। হাবা বলিল,—"দাদা আমাদের সঙ্গে যাবে না।" সাতদিন কাঁদিয়া সৌদামিনী হাবার সঙ্গে চলিলেন। মধ্যে বিশ্বনাথ-প্রেরিত অনেক লোক তাঁহার সুখ-সম্ভাবনা বলিয়াছে। সপ্তাহ পরে সৌদামিনী হাবার সঙ্গে বাহির হইলেন। হাবার সঙ্গে চলিতেছেন, পথে একজন মাতালের সহিত দর্শন, মাতাল কিছু না বলিয়া হাবাকে ধরিল—বার বার মুখ দেখিতে লাগিল। হাবা ভয় পাইল না। পরক্ষণে মাতাল কহিল,—"তুই কে রে—কে রে?" হাবা বলিল,—"আমি দেবেন্দ্রবাবুর ছেলে।"

মা। তোর সঙ্গে মাগীটা কে রে?

হাবা। আমার মা।

শুনিবামাত্র মাতাল সৌদামিনীর পদপ্রান্তে টিপ করিয়া গড় করিল, কিন্তু অঞ্চল ধরিতেও ত্রুটি করিল না। অঞ্চল ধরিয়া হাবাকে ডাকিতে লাগিল,—"আয়, এ দিকে আয়, টেনে নিয়ে যাই চল!" হাবার টানিতে ইচ্ছা হইল, কহিল—"মা, চল, এর সঙ্গে যাই।"

আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই, সে অবস্থাতেও সৌদামিনীকে মাতালের বাটীতে লইয়া যাওয়া যায়, পাঠক বিশ্বাস করুন, মাতাল হইলে কি হয়? যদি তার ভাবের ত্রুটি না হইয়া থাকে। আর হবার পরামর্শে বাহির হইয়াছেন, অলঙ্কার মাত্র সম্বল, কোথায় যাইবে, তার স্থির নাই; ইহাতে মাতাল কি, পুরাতন গল্পের ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী ডাকিলেও যাইতে পারা যায়। অনাথিনী মাতালের গৃহে গেলেন। বহির্ব্বাটী হইতে মাতাল আপনার গৃহিণীকে ডাকিল,—সৌদামিনীর সাহস বাড়িল। গৃহিণী বাহিরে আসিল। মাতাল কহিল, "এই নাও।"

গৃহিণী। "কি লব?" না বুঝিয়া দুজনকে পরম যত্নে বাটীর ভিতর লইয়া গেল, সেই দিন গৃহিণীর যত্নে সেই গৃহে বাস।

পরদিন প্রাতে অরুণোদয়ে কুসুমকলির ন্যায় উন্মীলিত-চক্ষু মাতাল সৌদামিনীকে বলিল,—"মা, এ ঘর ছেড়ে যেতে পাবে না। মেদিনীপুরে তোমার মনে পড়ে, একটা ছোঁড়া পালিযে এসেছিল। বাড়ীর লোকের বালাই বিদায় হ'ল জ্ঞান। মা বাপ ছিল না, এক কাকাবাবু। তিনি ছেলেটাকে পাওয়া যায় না ব'লে পার পেলেন। দেবেন্দ্রবাবু স্কুলে দিয়া আমায় উকীল করেছেন। বেশ দুটাকা পাই। মা, আমার মনে হচ্চে, তুমিও ছেলেটাকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্চো। এখন ধ'রে তোমায় ঘরে রাখি।" সোজা কথা। সৌদামিনীর বিশ্বাস জন্মাইল, সেই স্থানেই রহিলেন। একদিন মাতাল মদ খাইয়া আসিয়াছে। সৌদানিনী জানেন না, সৌদামিনী যত্ন করিয়া বলিতে গেলেন,"বাবা, তুমি আমার ছেলে।" মাতাল উত্তর করিল,—"তার হিসাব কি?" সৌদামিনী ভাবিলেন, "এ কি উত্তর!" কিন্তু ভয় হইল না, মাতাল তখন ভাবিতেছিল যে নীরদ নামে এক সন্তান এই অনাথিনীর আছে; বিশ্বনাথ নামে কে কোথায় আছে; তাহাকে নীরদ নামে এক ব্যক্তি খুন করিয়াছে। মাতাল যোগাযোগ করিয়া স্থির করিয়াছিল যে, সেই নীরদ ইহারই সন্তান। এই কথা ভাবিতেছিল যে, কেমন ক'রে তাহাকে বাঁচাই। তাই উত্তর করিল,—"তার হিসাব কি?" যথার্থই সৌদামিনীর পুত্র নীরদ বিশ্বনাথকে খুন করিয়াছে। তার কল্পনা

ছিল, আগে বিশ্বনাথকে, পরে মাকে খুন করিব। কিন্তু কি জানি, যখন তাহার উপর ফাঁসীর হুকুম হইয়াছিল,—খুন করিবার জন্য নহে, একবার মাকে দেখিতে চাহিয়াছিল। মাতাল বা উকিল, যে কোথায় বুঝেন, এ সকল কথাই জানিত। কাল ফাঁসী হইবে, এমন পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে জননীকে বলিতে পারে না। উকিল ভাবিতেছিল, "দূর হ'ক বালাইয়ে কাজ নাই, কাল আপীল করিব।" দীপে দীপপ্রজ্বলনের ন্যায় হৃদি-বেদনায় হৃদিবেদনা হরণ করা যায়। এই স্বতঃসিদ্ধে রমণী রমণীর নিকট হৃদয়ভাব ব্যক্ত করে। সেইদিন ফাঁসীর দিন। প্রমদা (মাতালের স্ত্রী) বলিল,—"মা গো, আজ তোমার নীরদের ফাঁসী। তোমায় দেখিতে চাহিয়াছিল, ভয়ে উনি বলেন নাই।"

উন্মাদিনী শুনিলেন, ক্ষণেক স্তম্ভিত হইলেন, রহিলেন না। হাবা রাখিবার চেষ্টা করিল না, পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। দ্রুতপদে,—অতি দ্রুত-পদে উন্মাদিনী চলিতে লাগিলেন। দিক্‌নির্ণয় নাই, অথচ যে দিকে ফাঁসী হইতেছে, সেই দিকে চলিতেছেন। কোমলপদ বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল। রুক্ষকেশ আকাশে দুলিল, পবনে বসন উড়িতে লাগিল; তথাপি উন্মাদিনী চলিলেন। অতি দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন। জনসমাগমে স্থান নাই। ফাঁসীদর্শনেচ্ছু নির্দয়-হৃদয় উন্মাদিনীকে দেখিয়া গলিল। সকলে স্থান দিতে লাগিল। ঠিক ফাঁসীর সময়। উন্মাদিনী নিকটে উপস্থিত। কহিলেন,—"নীরদ, আমি অসতী নহি।"

নীরদ ফাঁসীতে ঝুলিল। উন্মাদিনীর মথা কানে গেল কি না জানি না। উন্মাদিনী সেখানেই মরিলেন।

হাবা পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছিল, সেও পড়িয়া গিয়াছিল। এক দৌড়ে মাতাল বাড়িতে লইয়া আসিল।

যথানিয়মে সৌদামিনীর সৎকার হইল। ক্রমে হাবা সংসারী হইল। উকীলের কৌশলে পিতৃঅর্জ্জিত অর্থ পাইল, কিন্তু সেই ফাঁসী ও মাতার মৃত্যু ভুলিল না। সন্তানকে চুম্বন করিতে করিতে বলিত,—"মা আমায় এইরূপ চুম্বন করিতেন।"

বিদ্যাধরীর অরুচি

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

গোলাপীর হিংসা

গোলাপী ঝি বলিল,—"দেখ বিদ্যাধরি! বাবুর মুখে তুমি আর চুণকালি দিও না। আমাদের বাবু একজন বড় উকীল। নীলাম্বর ঘোষের নাম কে না জানে? তাঁর বাড়ীর ঝি হইয়া তুমি মুদীর দোকানে একটু গুড়, উড়ের দোকানে একটি ফুলুরী, ময়রার দোকানে একটু চিনির রস, রাঁয়বামনীর কাছে একটু মোচার ঘণ্ট, যার-তার কাছে যা-তা জিনিস মাগিয়া বেড়াইলে বাবুর অপমান হয়। বাবুর কথা দূরে থাক্, আমাদের পর্য্যন্ত ঘাড় হেঁট হয়। তোমার মাগার জ্বালায় লোকের কাছে আমরা মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারি না।"

বিদ্যাধরী ফোঁস করিয়া বলিল,—"তোমরা সকল তাতেই আমার ছল ধর। মা আমারে একটু ভালবাসেন তাই সকলে তোমরা ফাটিয়া মর। আমার অরুচি, মুখে কিছু ভাল লাগে না। চড়াই পাখির আহার। না খাইয়া যেন দড়ি হইয়া যাইতেছি। গতর না থাকিলে পরের বাড়ি কাজ করিব কি করিয়া? তাই তেঁতুল দিয়া, গুড় দিয়া, যা দিয়া পারি একমুঠা ভাত খাইতে চেষ্টা করি। আমি গরীব মানুষ। পয়সা কোথা পাইব যে, সন্দেশ, রসগোল্লা কিনিব? মুদী আমাকে ভালবাসে, তাই সেদিন সে আমাকে একটু গুড় দিয়াছিল। ময়রা আমাকে ভালবাসে, তাই সেদিন আমাকে শালপাতের ঠোঙা করিয়া রসগোল্লার খানিক রস দিয়াছিল। তাতে তোমরা হিংসায় ফাটিয়া মর কেন বল দেখি?"

পিতেম বলিল,—"তোমার অরুচি। পাথরটি টইটুম্বর করিয়া বামুন-ঠাকুর তোমাকে ভাত দেয়, তারপর দুইবার-তিনবার তুমি ভাত চাহিয়া লও। এই ত' তোমার অরুচি; এর উপর যদি রুচি থাকিত, তাহা হইলে ঘোড়াশালের ঘোড়া, হাতীশালের হাতী খাইতে। অনেক বাবুর বাড়ী চাকুরী করিয়াছি, অনেক ঝি দেখিয়াছি, কিন্তু তোমার মত মাগন্তড়ে বেহায়া ঝি কখনও দেখি নাই। বামুন-ঠাকুর! তুমি বল দেখি, এ মাগী

তিনজনের খোরাক একেলা খায় কি না।”

ছিদেম বলিল,—“দেখ বিদ্যাধরি! লোকের কাছে গিয়া যা-তা মাগা ভাল নয়, তাতে মনিবের অপমান হয়। আমি রসুই করি, নিজে আমি তোমাকে ভাত দিই। সকলের চেয়ে তোমাকে আমি বেশী তরকারী দিই। তোমার বাছা, আবার অরুচি কোথায়?”

গোলাপী বলিল,—“নোলা যদি সামলাইতে না পার, সন্দেশ-রসগোল্লা যদি খাইতে সাধ হয়, তাহা হইলে পয়সা দিয়া কিনিয়া খাও না কেন? তুমি গরীব, তোমার পয়সা নাই? তোমার গলায় অমন মোটা সোনার দানা, হাতে অমন মোটা তাগা! আর কতবার তুমি আমাকে বলিয়াছ যে, তোমার খোলার ঘরে তক্তোপোষের খুবোর নীচে তুমি ছয়শ টাকা হাঁড়ি করিয়া পুতিয়া রাখিয়াছ। সর্ব্বশুদ্ধ তোমার সেই যার নাম—হাজার টাকা আছে। বিধবা হইয়া পর্য্যন্ত আমি চাকরাণীগিরি করিতেছি। আমার হাজারটা কড়াকড়ি নাই। এই পিতেম ছেলেবেলা হইতে খানসামাগিরি করিতেছে। কত টাকা সে করিয়াছে? ছিদেম বামুনঠাকুর দেশে জমি বাঁধা দিয়া বে করিয়াছে। এখনও সে, সে দেনা শোধ করিতে পারে নাই। তবে তার মেয়েটি বড় হইয়া উঠিয়াছে, সেই মেয়েটিকে বেচিয়া যদি সে কিছু সমস্থান করিতে পারে।”

বিদ্যাধরী বলিল,—“আমার পৃথিবীতে কে আছে? একদিন একমুঠা ভাত দেয়, এমন আর কেহ নাই। কাজেই মাহিনাটি যাহা পাই, সেটি আমাকে রাখিতে হয়; ধারধোর দিয়া সেটিকে আমাকে বাড়াইতে হয়। তোমার ভাবনা কি বাছা! তোমার ভাই আছে, ভাইপো আছে। অসময়ে তারা তোমার খোঁজখবর লইবে।”

ছিদেম বলিল,—“সকলের কাছে তুমি বল যে, তুমি না খাইয়া খাইয়া রোগা হইয়া যাইতেছ। কিন্তু রোজ রোজ তুমি মোটা হইতেছ। তোমার গায়ে মাছি বসিলে, মাছি পিছলাইয়া পড়ে।”

বিদ্যাধরী বলিল,—“তুমি আমায় খুঁড়িলে। তোমার মা’গ মরুক, তোমার মেয়ে মরুক। মেয়ে বেচিয়া টাকা করিবার অহঙ্কার তোমার ঘুচুক।”

ছিদেম ব্রাহ্মণ বলিল,—“দেখলে পিতেম! দেখলে গোলাপী! আমি এমন কি বলিয়াছি যে মাগী আমাকে এমন শক্ত গালি দিল। গিন্নী-মায়ের মাগিশো ঝি, তাই জন্য এত অহঙ্কার! গিন্ন-মা বলেন যে, আমার

মাথা ঘোরে, আমার বুক ধড়-ধড় করে, আমার তিনশ ষাটখানা ব্যায়রাম। বিদ্যাধরী সেই কথায় বাতাস দেয়। তাই গিন্নী-মা ইহাকে এত ভালবাসেন। কিন্তু সকল কথা যদি বলিয়া দিই, তাহা হইলে দুইদিন এখানে থাকিতে পারে না। হাঁ রে মাগী! সেদিন গিন্নী-মায়ের জন্য চা করিবার সময় একথাবা চিনি কে মুখে দিয়াছিল? কড়ার একপাশে সরের উপর একটু ছেঁদা করিয়া দুধ খাইবার জন্য সকলে আমরা এক একটি নল করিয়াছি। সেই নল দিয়া সকলে আমরা এক-আধ ঢোঁক দুধ খাই-ই। কিন্তু সেদিন সমুদয় কড়া হইতে দুধের সরটুকু কে তুলিয়া খাইয়াছিল। সেদিন মাছ কুটিতে কুটিতে কে কইমাছের পেট থেকে ডিমটুকু বাহির করিয়া লইয়াছিল?"

গোলাপী বলিল—"পূর্ব্বে চাইল, ডাল, তেল যাহা কিছু আমরা বাঁচাইতাম, সকলে ভাগ করিয়া লইতাম। এখন তুমি সেগুলি সব নিজে লও। এ কি ভাল? আমরা কি চাকরি করিতে আসি নাই? সেদিন মোচার ঘণ্টের জন্য উপর হইতে ভিজে ছোলা আর নারিকেলকোরা আসিয়াছিল। তাহার অর্দ্ধেকগুলি তুমি নিজে খাইলে। তারপর, একদিন সকালবেলা গিন্নীর জন্য টাটকা গরম গরম জিলাপি আসিয়াছিল। তাহার পাশ হইতে পাপড়ি ভাঙ্গিয়া তুমি এতগুলি জমা করিলে। সবগুলি তুমি নিজে খাইলে। কোন্ বলিলে যে, গোলাপী! তুইও দুই-একটা পাপড়ি খা। কেন বাছা, আমাদের কি মুখ নাই? না—ভাল-মন্দ জিনিষ খাইতে আমাদের সাধ হয় না?"

নীলাম্বর ঘোষের রান্নাঘরে চারিজনে এইরূপ তুমুল বাকযুদ্ধ বাধিয়া গেল। একদিকে ছিদেম ব্রাহ্মণ, পিতেম চাকর ও গোলাপী ঝি। এদিকে তিনজন, অন্যদিকে বিদ্যাধরী ঝি একা! সপ্তরথিবেষ্টিত অভিমন্যু কতক্ষণ বিপক্ষের সহিত সংগ্রাম করিতে পারে? বিদ্যাধরীকে শীঘ্রই পরাভব মানিয়া, সে স্থান হইতে প্রস্থান করিতে হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পুরুষোত্তমের সৌভাগ্য

কাঁদিতে কাঁদিতে গিন্নী-মায়ের নিকট গিয়া বিদ্যাধরী বলিল,—"মা! বামুনঠাকুর বলে যে, তোমার কোন ব্যায়রাম নাই,—সব ঠাট।

তোমার মাথা ঘোরে না, বুক ধড়-ধড় করে না! সোহাগ করিয়া তুমি বাবুর টাকার শ্রাদ্ধ করিতেছ। তোমার অরুচি নাই, তোমার গায়ে মাছি বসিলে, মাছি পিছলাইয়া পড়ে।”

গিন্নী বলিলেন,—“বটে! বামুনের তো আস্পর্ধা কম নয়, ছোট মুখে বড় কথা।

বিদ্যাধরী বলিল,—“আমিও মা সেই কথা বলি। আমি বলিলাম, দেখ বামুনঠাকুর, মনিবকে অমন কথা বলিতে নাই, মাকে আমি অষ্টপ্রহর দেখিতেছি। তাঁর যে কত অসুখ, সেকথা আর বলিব কি! কেবল আমার সেবার জোরে তিনি বাঁচিয়া আছেন। এই কথা মা,—আমি যেই বলিয়াছি, আর পোড়ারমুখো বামুন আমাকে কেবল ধরিয়া মারে নাই। কত গালি দিল, কত কুকথা সে যে আমাকে বলিল,—সেকথা মা, তোমাকে আমি আর কি বলিব! সে একা নয়। বাবুর সখের চাকর, পোড়ার-মুখো পিতেম, আর আঁটকুড়ি গোলাপীও তার সঙ্গে যোগ দিল! তুমি আমায় মা, একটু ভালবাসো, সেইজন্য সকলের হিংসা। তা আমি মা! আর তোমার কাছে থাকিতে চাই না। তুমি মা, অন্য ঝি দেখিয়া লও।”

পরদিন নীলাম্বরবাবু ছিদেম ব্রাহ্মণকে ডিস্‌মিস করিলেন ও পিতেম এবং গোলাপীকে অনেক তিরস্কার করিলেন।

বিদ্যাধরী নিজে মনোনীত করিয়া আর একজন ব্রাহ্মণকে লইয়া আসিল। এ ব্রাহ্মণের যেরূপ মুখশ্রী, লক্ষ লোকের মধ্যেও সেরূপ একটা মুখশ্রী হয় না। মুখমণ্ডলটি প্রকাণ্ড, কিন্তু যতটা দীর্ঘে, প্রস্থে ততটা নহে। বর্ণ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। কিন্তু বসন্তের দাগে সমুদয় মুখখানি নানা আকারের গর্তে এত পূর্ণ হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণের প্রকৃত বর্ণ কি, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। গণ্ডদেশের উপর হাড় দুইটি এত উচ্চ হইয়া আছে যে, দুই পার্শ্বে চক্ষু দুইটি যেন দুইটি কূপের মত বোধ হয়। দুই চক্ষুর মাঝখানে নাসিকা অতি দীর্ঘ ও উচ্চ। মুখের হাঁ বৃহৎ পুষ্করিণীর ন্যায় প্রশস্ত। সে মুখের হাসি দেখিলে মানুষের আত্মা-প্রাণ শুকাইয়া যায়। চক্ষু ও চুলের বর্ণ তাম্রের ন্যায়; হাজার তেল মাখিলেও চুলের রুক্ষতা যায় না। ব্রাহ্মণের নাম পুরুষোত্তম, বাস উৎকল দেশে।

ঝগড়ার পর বিদ্যাধরী, কিছুদিন ধরিয়া মুদী ও ময়রা কাহার নিকট আর কিছু চায় নাই।

দুই দিন পরে সে পুরুষোত্তমকে বলিল—"বামুনঠাকুর ! আমাকে তুমি যেমন-তেমন ঝি মনে করিও না। এই দেখ, গলায় আমার কেমন সোনার দানা ; এই দেখ, হাতে আমার মোটা তাগা। আর আমার ঘরে হাঁড়ি করিয়া ছয়শ টাকা আমি পুঁতিয়া রাখিয়াছি। কোন কুলে আমার কেহ নাই। আমি অধিক দিন বাঁচিব না। আমার বড় অরুচি। বৈকালবেলা রোজ চক্ষু জ্বালা করিয়া জ্বর হয়। বাঁচিতে আমার সাধ নাই। মরণ হইলেই বাঁচি ! কিন্তু পোড়া যম আমাকে ভুলিয়া আছে। আত্মহত্যা করিলে অগতি হইবে, তা না হইলে আমি কোন্ কালে আফিম খাইয়া, কি গলায় দড়ি দিয়া, কি জলে ডুবিয়া মরিতাম। যাহা হউক, অধিক দিন আমি আর বাঁচিব না। আমার গহনা ও টাকাগুলি আমার মরণের পর তোমার মত কোন একটি ব্রাহ্মণের ছেলে পায়, তাহাই আমার ইচ্ছা।"

পুরুষোত্তমের মুখ প্রফুল্ল হইল। সে বলিল, "না, না ;—তুমি এখন অনেকদিন বাঁচিবে। তোমার ব্যায়রাম তত কঠিন নয়। টাকা পাই না পাই,—মায়ের মত আমি তোমাকে সেবা করিব। সময়-অসময়ে আমি তোম্যাকে দেখিব।"

বিদ্যাধরী বলিল,—"সে আর অধিক দিন দেখিতে হইবে না। নিজের শরীর আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। তাছাড়া বাঁচিতে আর আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই। টাকাগুলি তোমাকে আমি দিয়া যাব। বাবু উকীল ; উইল কাহাকে বলে, তা আমি জানি। গিন্নীর নামে বাবু উইল করিয়াছেন। একখানা কাগজে লিখিলেই হবেই যে, অমুককে আমার টাকা-গহনা দিয়া যাইলাম ! তা করিলেই তুমি সব পাইবে। কিন্তু একথা প্রকাশ করিও না।"

সেইদিন হইতে পুরুষোত্তম যত মাছ, যত তরকারী বিদ্যাধরীর পাতে চাপাইতে লাগিল। পিতেম ও গোলাপী কিছু পায় না। সেজন্য তাহারা ক্রমাগত গজ গজ করিতে লাগিল, কিন্তু বাবুর তিরস্কারের ভয়ে প্রকাশ্য ঝগড়া করিতে পারিল না।

চারি-পাঁচ দিন পরে বিদ্যাধরী একখানা কাগজ আনিয়া পুরুষোত্তমের হাতে দিল। পুরুষোত্তম সেই কাগজ কোন লোককে দিয়া পড়াইয়া দেখিল : বিদ্যাধরীর মৃত্যুর পর সমুদয় সম্পত্তি সে পাইবে, কাগজে এইরূপ লেখা ছিল। পুরুষোত্তম আরও জানিয়া দেখিল যে, এরূপ কাগজকে উইল বলে, এইরূপ উইল করিয়া লোক আপনার সম্পত্তি অন্য লোককে প্রদান করে।

পুরুষোত্তমের মন আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। সেইদিন হইতে গোয়ালিনীকে বলিয়া বিদ্যাধরীর জন্য সে এক পোয়া করিয়া দুধের রোজ করিয়া দিল। সেইদিন হইতে সে নিজের পয়সা দিয়া মেঠাইমোণ্ডা প্রভৃতি ভাল ভাল জিনিস বিদ্যাধরীকে খাওয়াইতে লাগিল।

একদিন বিদ্যাধরী বলিল,—"আমার আর বিলম্ব নাই। কবিরাজ মহাশয় বলিলেন যে,—'বিদ্যাধরি! দিন দিন তুই যেন পাখী হইয়া যাইতেছিস্। মুখে যেন তোর কালি মাড়িয়া দিয়াছে, বড় জোর আর তিন মাস।' আমি বলিলাম,—'কবিরাজ মহাশয়। বাঁচিতে আর আমার ইচ্ছা নাই। রোগের যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। নিজ হাতে বিষ খাইয়া মরিলে অগতি হইবে। ঔষধের সঙ্গে যদি একটু বিষ দিয়া আমাকে মারিতে পারেন, তাহা হইলে আপনার বড় পুণ্য হয়।' কবিরাজ মহাশয় বলিলেন,—'না রে না! তা আর করিতে হইবে না। তোর নাড়ীর গতিক যেরূপ তাহাতে বড় জোর আর তিন মাস।"

পুরুষোত্তম বিদ্যাধরীর দিকে চাহিয়া দেখিল। পূর্ব্বে যদি সে এক-পাথর ভাত খাইত, এখন সে দুই পাথর ভাত খায়। রোগা হওয়া দূরে থাকুক, পুরুষোত্তমের নিকট হইতে ভাল ভাল আহারীয় দব্য পাইয়া দিন দিন সে যেন ফুলিয়া উঠিতেছিল। আজ তিন মাস পুরুষোত্তম তাহার সেবা করিতেছিল। আজ তিন মাস সে আপনর মাহিনা দেশে পাঠায় নাই। সমুদয় টাকা বিদ্যাধরীর জন্য খরচ করিয়াছিল।

আরও তিন মাস কাটিয়া গেল। বিদ্যাধরী মরে না! ভাল ভাল জিনিস খাইয়া তাহার শরীরে বরং কান্তি ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। এ পর্য্যন্ত বিদ্যাধরীর জন্য পুরুষোত্তমের পঁচিশ টাকা খরচ হইয়াছিল। পুরুষোত্তমের মনে খটকা জন্মিল।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রাণমুগরো গাছের শিকড়

একদিকে পিতেম চাকর ও দোলাপী ঝি, অপর দিকে পুরুষোত্তম ব্রাহ্মণ ও বিদ্যাধরী ঝি, ইহাদের মধ্যে সর্ব্বদা ঝগড়া হইতে লাগিল। একদিন বিদ্যাধরীকে গোলাপী বলিল,—"তোমার কি বিবেচনা! আজ সকালবেলা বাবুর জন্য তুমি সন্দেশ কিনিয়া আনিলে। বাবুকে দিবার

পূর্ব্বে, বামুনঠাকুরকে তুমি দুইবার চাটিতে দিলে, তাহার পর সন্দেশটি তুমি নিজে দশবার চাটিলে। কোন্ বলিলে যে, গোলাপী! তুই দুইবার চাট। কোন জিনিস পাইলে সকলকে ভাগ দিয়া খাইতে হয়। আমিও ঝি, তুমিও ঝি। আমাকে ভাগ দিয়া না খাইলে তোমার অধর্ম হয়, তা জান? মাথার উপর ভগবান আছেন, তিনি বিচার করিবেন। আর এই চাবড়ামুখো বামুনের কি আক্কেল? আহা, মুখখানি তো নয়—যেন ডায়মনকাটা আড়াই হাত শীতলা। পোড়ারমুখোরা আর ঠাকুর খুঁজিয়া পায় নাই, জগন্নাথকে ঠাকুর করা হইয়াছে; না আছে নাক, না আছে কান। যে হাতে বিদ্যাধরীকে সব জিনিস দিস্, জগন্নাথের মত তোর সেই হাত ঠুঁটো হউক। মরণ আর কি?"

গোলাপীর গালিতে পুরুষোত্তমের শরীর জর্‌জর্ হইল। এদিকে বিদ্যাধরীর অরুচি দিন দিন বাড়িতে লাগিল। বিদ্যাধরী বলে,—"বামুন-ঠাকুর, বড় অরুচি! যদি ক্ষীরমোহন পাই, তাহা হইলে বোধ হয় কষ্টেশ্রেষ্টে একটা খাইতে পারি।" আবার কোন কোনদিন সে বলে,—"সরভাজা বেচিতে আসিয়াছে। বড় অরুচি। একটু যদি সরভাজা পাই, তাহা হইলে চেষ্টা করিয়া দেখি, খাইতে পারি কি না।" আবার কোনদিন বলে,—"বামুনঠাকুর, শুনিয়াছি বাগবাজারে একরকম সন্দেশ আছে, তাহার নাম 'আবার খাব', যদি আনিয়া দিতে পার, তাহা হইলে একটু রুচি হয়।" এইরূপ নিত্য নত্য বিদ্যাধরীর আবদার। পুরুষোত্তম কি করিবে? যখন এত টাকা খরচ করিয়াছে, তখন বিদ্যাধরীর সঙ্গে সহসা চটাচটি করিতে পারে না। কাজেই সেই সমুদয় দ্রব্য তাহাকে আনিয়া দিতে হয়। কিন্তু বিদ্যধরীর মরণ হওয়া দূরে থাকুক, দিন দিন সে তেলের কুপোর মত মোটা হইতে লাগিল। পুরুষোত্তম তাহার শরীরের দিকে চাহিয়া দেখে আর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে। একদিন পুরুষোত্তম মুদীর দোকানে বসিয়া আছে। মুদী জিজ্ঞাসা করিল,—"ব্রাহ্মণঠাকুর! তোমাদের বিদ্যাধরী ঝিয়ের অরুচি সারিয়াছে?"

পুরুষোত্তম উত্তর করিল,—"বিদ্যাধরীর অরুচি! আগে যদি সে এক-পাথর ভাত খাইত, এখন সে দুই পাথর ভাত খায়।"

"বটে!" এই কথা বলিয়া মুদী একটি নিশ্বাস ফেলিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া মুদী বলিল,—"বিদ্যাধরীর ব্যায়রাম বাড়িতেছে? কবিরাজ মহাশয় তাহার নাড়ী ধরিয়া বলিয়াছেন যে, সে আর অধিক দিন বাঁচিবে না। সেই-

জন্য আমার নিকট হইতে প্রতিদিন সে এক ছটাক ঘি লইয়া যায়, আর পানা করিয়া খাইবার জন্য রোজ সে আধ পোয়া বাতাসা লইয়া যায়।"

পুরুষোত্তম জিজ্ঞাসা করিল,—"দাম দেয় ?"

মুদী উত্তর করিল,—"না; আমার ছেলেকে সে বড় ভালবাসে। বিদ্যাধরীর যাহা কিছু আছে, সে আমার ছেলেকে দিয়া যাবে। আমার ছেলের নামে সে উইল করিয়াছে।"

পুরুষোত্তমের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। মুদী তাহার সছিদ্র বাক্স হইতে উইল বাহির করিয়া তাহাকে দেখাইল। পুরুষোত্তমও আপনার উইল আনিয়া মুদীকে দেখাইল। তখন ইহারা বুঝিল যে, সমুদয় বিদ্যাধরীর চালাকি; দানা, অনন্ত ও টাকার লোভ দেখাইয়া তাহাদের নিকট হইতে সে ফাঁকি দিয়া খাইতেছে। অনুসন্ধান করিতে করিতে আরও প্রকাশ পাইল যে, ময়রাকে একখানি সেইরূপ উইল দিয়া বিদ্যাধরী অনেক টাকার সন্দেশ খাইয়াছে। গোয়ালাকে সেইরূপ একখানি উইল দিয়া সে দুধ, রাবড়ী ও মাখন খাইয়াছে। উড়ে দোকানদারকে উইল দিয়া, সে মুড়ির চাক্তি আর তেলেভাজা বেগুনি খাইয়াছে। এইরূপ সকলকে এক একখানি উইল দিয়া, অনেক লোকের নিকট হইতে সে অনেক দ্রব্য খাইয়াছে।

একটা সামান্য স্ত্রীলোক তাহাকে ফাঁকি দিয়াছে—সেই লজ্জায় পুরুষোত্তম কাহাকেও কোন কথা বলিল না। বিশেষতঃ সে ভাবিল যে,—"মাগীর কাছ হইতে এ টাকা যেমন করিয়া হউক, আমায় আদায় করিতে হইবে। একথা লইয়া যদি আমি গোল করি, তাহা হইলে সকলে কেবল হাসিবে, আমার টাকা আদায় হইবে না।"

কিন্তু কিরূপে সে টাকা আদায় করিবে? ঝগড়া করিলে কোন ফল হইবে না; ফাঁকি দিয়া আদায় করিতে হইবে।

পুরুষোত্তম ভাবিতে লাগিল। দুই-তিন দিন চিন্তা করিয়া একদিন সন্ধ্যাবেলা বিদ্যাধরীকে নিভৃতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার জন্য কাল আমি যে মাছের ঝোল রাঁধিয়াছিলাম, তাহা খাইয়া তুমি কেমন আছ? পেট-জ্বালা বুক-জ্বালা করিতেছে?"

বিদ্যাধরী বলিল,—"কেন, পেট-জ্বালা বুক-জ্বালা করিবে কেন? সে মাছের ঝোলে কি ছিল?"

পুরুষোত্তম উত্তর করিল,—"এমন কিছুই নয়! তবে তুমি বলিয়াছিলে যে, মরণ হইলেই বাঁচি। তোমাকে যদি কেহ বিষ দিয়া মারে, তাহা হইলে

তাহার অনেক পুণ্য হয়। মনে নাই? তুমি কবিরাজ মহাশয়ের কাছ হইতে সেইজন্য ঔষধ চাহিয়াছিলে। আমি ভাবিলাম যে,—'আহা! বিদ্যাধরী রোগের যন্ত্রণায় বড় কষ্ট পাইতেছে, বাঁচিতে ইচ্ছা নাই, তা আমি উহাকে একটু বিষ দিই, যাহাতে শীঘ্র উহার গঙ্গালাভ হয়! তাই আমাদের দেশের প্রাণমুগরো গাছের শিকড় বাটিয়া মাছের ঝোলের সহিত মিশাইয়া দিয়াছিলাম।"

বিদ্যাধরী যেন আকাশ হইতে পড়িল। শশব্যস্ত হইয়া সে বলিল,— "বলিস্ কিরে আঁটকুড়ির বেটা। আমাকে বিষ দিয়েছিস! বলিস কি রে —উনুনমুখো ডেক্‌রা বামুন!"

পুরুষোত্তম বলিল,—"তা তুমি তো নিজে আমাকে বারবার বলিয়াছ যে, একতিল আমার বাঁচিতে ইচ্ছা নাই। এখন অমন কথা বলিলে চলিবে কেন?"

বিদ্যাধরী বলিল,—"ওরে সর্ব্বনেশে! ওরে আঁটকুড়ো উড়ে বামুন! তোর মনে কি এই ছিল? ওঃ! আমার পেট জ্বলিয়া গেল, আমার বুক জ্বলিয়া গেল। প্রাণ যায়, মা। আমার প্রাণ যায়।"

এইরূপ বলিতে বলিতে বিদ্যাধরী সেইখানে ধড়াস করিয়া শুইয়া পড়িল, আর কাঁদিতে কাঁদিতে ক্রমাগত বলিতে লাগিল, "আমার পেট গেল, আমার বুক গেল, আমার প্রাণ যায়। ও গিন্নী-মা! তোমার বিদ্যাধরী ঝি যায়। শীঘ্র ডাক্তার লইয়া এস। ও পিতেম! ও গোলাপী! শীঘ্র আয় রে। সকলে মিলিয়া আমার প্রাণ বাঁচা রে। ও মা কালি! আমাকে বাঁচাও মা। তোমাকে জোড়া পাঁঠা দিব, মা! হে বাবা তারকনাথ! আমাকে বাঁচাও বাবা, গণ্ডি দিয়া আমি তোমার মন্দিরে গিয়া পূজা দিব বাবা!"

পাছে অধিক চীৎকার করে,—সেজন্য হাত দিয়া পুরুষোত্তম তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। পুরুষোত্তম বলিল,—"চুপ চুপ।"

বিদ্যাধরী পুনরায় ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল,—আর বলিল,—"হাঁ রে আঁটকুড়ির বেটা। কি গাছের শিকড় দিয়াছিস? চুপ করিব? এখনি আমি থানায় যাইব। তোর হাতে হাতকড়ি দিয়া তোকে ফাঁসিকাটে ঝুলাইব। ও পিতেম ওরে শীঘ্র পাহারাওলাকে ডাক!' এই আঁটকুড়ির বেটা আমাকে বিষ দিয়াছে। আমার টাকা পাইবে, সেজন্য বেটা আমাকে খুন করিয়াছে। ওঃ! পেট আমার জ্বলিয়া গেল! হায় হায়! আমার কি হইল।"

পুরুষোত্তম বলিল,—"চুপ চুপ। যদি তুমি একান্তই মরিতে না ইচ্ছা কর, তাহা হইলে বিষের কাটান করিতে আমি জানি। সে ঔষধ ডাক্তার-বৈদ্য কেহই জানে না। পুলিশের লোকে যদি আমাকে ধরিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে সে ঔষধ তোমাকে কে দিবে? তাহা হইলে বেঘোরে তুমি মারা যাইবে।"

বিদ্যাধরী বলিল,—"ওরে আঁটকুড়ির বেটা! তবে সে ঔষধ শীঘ্র আনিয়া দে।"

পুরুষোত্তম বলিল,—"সে ঔষধ আনিতে পাঁচ টাকা খরচ হইবে। আমার কাছে এখন একটি পয়সাও নাই। টাকা কোথায় পাইব যে, সে ঔষধ আনিব? আজ এক শিশি খাইলে আপাততঃ তোমার প্রাণটা বাঁচিবে। কিন্তু তাহার পর আরও পাঁচ ছয় শিশি খাইলে বিষটা নির্দোষ হইয়া তোমার শরীর হইতে যাইবে। আমি গরীব মানুষ। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা আমি কোথায় পাইব। আগে যদি বলিতে যে, আমার মরিতে ইচ্ছা নাই, তাহা হইলে মাছের ঝোলের সহিত আমি বিষ দিতাম না।"

বিদ্যাধরী বলিল,—"ওরে আঁটকুড়ির বেটা। আমি তোকে টাকা দিতেছি। তুই আমার প্রাণ বাঁচা। তুই আমার বাবা। তুই আমার প্রাণরক্ষা কর। ও মা, আমার পেট জ্বলিয়া খাক হইয়া গেল।"

পেটে হাত দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিদ্যাধরী ছোট এক অন্ধকার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। সেই ঘর হইতে পাঁচটি টাকা আনিয়া পুরুষোত্তমের হাতে দিয়া বলিল,—"যা বাবা, যা শীঘ্র যা। যা করিয়াছিস্ তা করিয়াছিস। এখন আমার প্রাণ বাঁচা।"

পুরুষোত্তম বলিল,—"কোন ভয় নাই। ঔষধ খাইলেই তুমি ভাল হইয়া যাইবে। কাহাকেও কোন কথা বলিও না। আমি শীঘ্র ফিরিয়া আসিতেছি। যতক্ষণ না ফিরিয়া আসি, ততক্ষণ খিড়কীর দিকে কলের নীচে বসিয়া মাথায় ও পেটে একটু একটু জল দিতে থাকো।"

চতুর্থ অধ্যায়

গজকচ্ছপের যুদ্ধ

এই কথা বলিয়া পুরুষোত্তম বাটী হইতে বাহির হইল। বলা বাহুল্য যে, বিদ্যাধরীকে প্রকৃত সে বিষ দেয় নাই। আপনার টাকা আদায় করিবার

নিমিত্ত সে এইরূপ ফন্দি করিয়াছিল।

বাটী হইতে বাহির হইয়া সে চারি পয়সা দিয়া একটা শিশি কিনিল। রাস্তার কল হইতে শিশিটি জলে পরিপূর্ণ করিল। তাহার পর এক পয়সার সোডা কিনিয়া সেই জলের সহিত মিশ্রিত করিল। এইরূপে মিছামিছি একটা ঔষধ প্রস্তুত করিয়া সে বাটী প্রত্যাগমন করিল। মনে করিল যে, এবার পাঁচ টাকা আদায় হইল। আর পাঁচ-ছয় শিশি এইরূপ ঔষধ দিতে পারিলেই তাহার সমুদয় আদায় হইবে।

পুরুষোত্তম যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিল, তখন অল্প অল্প অন্ধকার হইয়াছিল। সে দেখিল যে, রান্নাঘরের নিকট পিতেম ও গোলাপী বসিয়া সুড়বুড করিয়া কথা কহিতেছে। কয়মাস ধরিয়া পুরুষোত্তম অন্য চাকর-চাকরাণীদিগকে বঞ্চিত করিয়া, বিদ্যাধরীকে অধিক মাছ ও তরকারী দিয়াছিল, সেজন্য তাহার উপর সকলের রাগ। বিষ প্রদানের কথা পাছে পিতেম কি গোলাপী শুনিয়া থাকে, সেই ভয়ে পুরুষোত্তমের প্রাণ উড়িয়া গেল।

তাহাকে অধিকক্ষণ চিন্তা করিতে হইল না। পিতেম তাহাকে ডাকিয়া বলিল,—"বামুনঠাকুর! সর্ব্বনাশ করিয়াছ। বিদ্যাধরীকে বিষ দিয়াছ। পুলিশের লোক টের পাইলে এখনি তোমাকে বাঁধিয়া লইয়া যাইবে। তাহার পর তোমার ফাঁসি হইবে।"

পুরুষোত্তমের মুখ শুকাইয়া গেল। সে বলিল,—আমি সত্য তাহাকে বিষ দিই নাই। মিছামিছি করিয়া বলিয়াছি।"

পিতেম বলিল,—"সেকথা কে বিশ্বাস করিবে? যদি বিষ দাও নাই, ওষুধ আনিবার জন্য তাহার নিকট হইতে পাঁচ টাকা লইয়াছ কেন? তবে বিদ্যাধরী উন্মাদ, পাগল হইয়াছে কেন?"

আশ্চর্য হইয়া পুরুষোত্তম বলিল,—"উন্মাদ পাগল হইয়াছে? আমি সত্য বলিতেছি, তাহাকে আমি পাগল হইবার ঔষধ দিই নাই।"

পিতেম বলিল,—"সে ভয়ানক উন্মাদ হইয়াছে। আমরা দুইজনে তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারি না। অনেক কষ্টে তাহাকে আমরা একটু সুস্থ করিয়াছি। কিন্তু সুস্থ হইয়া সে আর এক সর্ব্বনাশ করিয়াছে। বরাবর উপরে গিয়া গিন্নী-মায়ের খাটে গিয়া শুইয়াছে। মা বাগানের কলতলায় কাপড় কাচিতে গিয়াছেন। উপরে আসিয়া দেখেন যে, বিদ্যাধরী তাঁহার বিছানায় শুইয়া আছে, তাহা হইলে আর রক্ষা রাখিবেন না।

বাবুও এখনি বাড়ী আসিবেন। সকল কথা তখন প্রকাশ হইবে। তখন নিশ্চয় পুলিশ ডাকিয়া তোমাকে ধরাইয়া দিবেন।"

পুরুষোত্তম ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। সে বলিল,—"দোহাই ভাই! আমি তোমার পায়ে পড়ি। আমাকে এ বিপদ্ হইতে রক্ষা কর। এখন কি করিলে আমি রক্ষা পাই, তা বল ভাই।"

পিতেম উত্তর করিল,—"আমরা অনেক কষ্টে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিছুতেই তাহাকে গিন্নীর খাট হইতে উঠাইতে পারি নাই। তুমি যদি পাঁজা করিয়া কোনরূপে তাহাকে নীচে আনিতে পার, তাহা হইলে উপায় হইতে পারে। কিন্তু আর বিলম্ব করিলে চলিবে না। গিন্নী এখনি উপরে আসিবেন। নিজের বিছানায় বিদ্যাধরীকে দেখিলে তিনি আর রক্ষা রাখিবেন না।"

পুরুষোত্তম বলিল—"তবে আমি এখনি যাই।"

গোলাপী বলিল,—"না, অমনি গেলে হইবে না। তাহাকে পাঁজা করিয়া ধরিলেই চীৎকার করিয়া সে ফাটাইয়া দিবে। তাহার চীৎকারে গিন্নী দৌড়িয়া আসিবেন, তাহা হইলে সকল কথা প্রকাশ পাইবে।"

পুরুষোত্তম জিজ্ঞাসা করিল,—"তবে কি করি?"

গোলাপী ঘরের ভিতর হইতে একটি বড় থলি আনিয়া পুরুষোত্তমের হাতে দিয়া বলিল,—"উপরে গিন্নীর ঘরে গিয়া টপ করিয়া বিদ্যাধরীর মুখে এই থলিটি পরাইয়া দিবে। তাহার পর দুই হাতে পাঁজা করিয়া তাহাকে ধরিবে। কিন্তু সাবধান! মুখ হইতে থলি যেন সে খুলিতে না পারে। তাহার পর জোর করিয়া তাহাকে নীচে নামাইয়া আনিবে। তাহাকে যদি আমাদের কাছে আনিতে পার, তখন আমরা তাহাকে বুঝাইয়া ঠাণ্ডা করিব।"

থলিটি হাতে লইয়া আর কোন কথা না বলিয়া পুরুষোত্তম তড়তড় করিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিল। তাহার পর দ্রুতবেগে গিন্নীর ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। তখন অন্ধকার হইয়াছে, তখনও আলো জ্বালা হয় নাই। গিন্নীর খাটের উপর যে শুইয়াছিল, পুরুষোত্তম নিকটে গিয়া সহসা তাহার মুখে থলিটি পরাইয়া দিল। মস্তকে, বক্ষঃস্থলে, পৃষ্ঠদেশে, দুই হাতে, কোমর পর্যন্ত তাড়াতাড়ি থলিটি টানিয়া দিল। তাহার পর তাহাকে পাঁজা করিয়া ধরিয়া হিঁচড়াইতে হিঁচড়াইতে ঘরের ভিতর হইতে বাহির করিল। সে চীৎকার করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু থলির ভিতর

হইতে কোন শব্দ বাহির হইল না, থলির ভিতর হইতে ঘড়ঘড় আর গোঁ-গোঁ শব্দ হইতে লাগিল। তাহার হাত দুইটি আবদ্ধ ছিল। যথাসাধ্য পা দিয়া সে পুরুষোত্তমকে লাথি মারিতে লাগিল, আর ছটফট করিয়া যথাসাধ্য আপনাকে ছাড়াইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু উড়ে বামুন নাছোড়বান্দা। কতক টানিয়া কতক হিঁচড়াইয়া পুরুষোত্তম তাহাকে সিঁড়ির নিকট পর্য্যন্ত আনিল। এমন সময় সে থলির ভিতর হইতে আপনার দুই হাতের কতকটা বাহির করিয়া ফেলিল।

সেই দুই হাতে পুরুষোত্তমকে প্রাণপণে খিমচাইতে আর থলি ভেদ করিয়া ভিতর হইতে পুরুষোত্তমকে কামড়াইতে লাগিল, আর দুই পায়ে লাথি মারিতে লাগিল। সিঁড়ির উপরে যেন গজকচ্ছপের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। তাহার আঁচড়ানি-কামড়ানিতে পুরুষোত্তম বড়ই বিব্রত হইল। অনেক চেষ্টা করিয়াও সে তাহাকে সিঁড়িতে নামাইতে পারিল না। দুই পা আগে যায়, আর এক পা পশ্চাতে গিয়া পড়ে। সিঁড়ির ঠিক উপরে তাহাকে লইয়া পুরুষোত্তম এইরূপ টানাটানি করিতেছে, এমন সময় সিঁড়ির একটু নিম্নে বাড়ীর কর্তাবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।
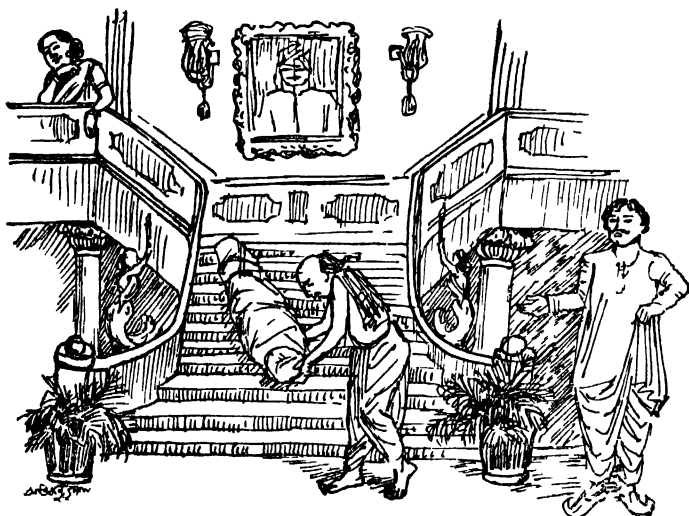
একে উড়ে ব্রাহ্মণের সেই অদ্ভুত মূর্তি। সেই মূর্তি গুণমোড়া আর একটা মূর্তিকে লইয়া টানা হেঁচড়া করিতেছে। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বাবু ভাবিলেন, এ ভূত, না প্রেত, না পাগল, এ কি? ঘোরতর

বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"এ কি! এ কি!"

চমকিত হইয়া পুরুষোত্তম বাবুর দিকে চাহিয়া দেখিল, সে দেখিল যে, দুইটা পৈঠার নীচে সিঁড়িতে স্বয়ং বাবু দাঁড়াইয়া আছেন, আর তাহার ঠিক পশ্চাতে আলো হাতে করিয়া স্বয়ং বিদ্যাধরী ঝি দাঁড়াইয়া আছে।

বাবুর পশ্চাতে সিঁড়ির উপর বিদ্যাধরীকে দেখিয়া পুরুষোত্তমের প্রাণ উড়িয়া গেল। তৎক্ষণাৎ সে চটমোড়া সেই স্ত্রীলোককে সেই স্থানে ফেলিয়া দ্রুতবেগে বাবুর পাশ দিয়া সিঁড়ি হইতে নামিল। নীচে নামিয়া তৎক্ষণাৎ সে বাটী হইতে পলায়ন করিল। আপনার মাহিনা কি কাপড়-চোপড় লইতে আর সে ফিরিয়া আসিল না। সে পর্য্যন্ত পুরুষোত্তম ব্রাহ্মণের আর কোন সন্ধান কেহ পায় নাই। পুরুষোত্তম যখন চলিয়া গেল, তখন বিদ্যাধরী ঝি, গোলাপী ঝি ও পিতেম চাকর সকলেই হাবা সাজিল। তাহারা বলিল,—"ব্রাহ্মণ কেন এরূপ কাজ করিয়াছে, তাহার বিন্দুবিসর্গ কিছুই আমরা জানি না।" সেজন্য এ ব্যাপার কেন যে ঘটিয়াছিল, নীলাম্বর বাবু এখনও তাহার সবিশেষ কারণ জানিতে পারেন নাই। তাঁহার ধারণা এই যে, উড়ে ব্রাহ্মণ হয় পাগল হইয়াছিল, আর না হয় তাহাকে ভূতে পাইয়াছিল।

যাহা হউক, নীলাম্বরবাবু তাড়াতাড়ি স্ত্রীলোকের মাথা হইতে থলিটি খুলিয়া লইলেন। বলা বাহুল্য যে, থলির ভিতর হইতে তাঁহার স্ত্রীর মুখ বাহির হইয়া পড়িল। গিন্নী তখন জ্ঞানশূন্য, মূর্চ্ছিত। অনেক কষ্টে পুনরায় তাঁহার চেতনা হইল। তাহার পর, হিষ্টিরিয়া রোগ দ্বারা তিনি আক্রান্ত হইলেন। ছয়মাসকাল পর্য্যন্ত নানা রোগে তিনি কষ্ট পাইলেন। ডাক্তার-বৈদ্য দেখাইয়া অনেক টাকা খরচ করিয়া, নীলাম্বরবাবু এখন তাঁহাকে ভাল করিয়াছেন। সকলে এখন সুখে-স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছেন।

শাদা মন কালো মন

শিবনাথ শাস্ত্রী

মন কি কখনও শাদা কি কালো হয়? মন না শাদা না কালো, না লম্বা না চওড়া, অথচ আমরা কথায়-কথায় বলিয়া থাকি, অমুক লোকটার মনটা বড় শাদা। যার মনে কোনো কপটতা নাই, হিংসা বিদ্বেষ নাই, তার মনটা শাদা মন হইতে পারে; তবে কালো মন কেন হইবে না? একটি শাদা আর একটি কালো মনের গল্প বলি।

কলিকাতার এক বাড়ীতে দুইটি পরিবার একত্রে বাস করিতেন। একজনেরা ঘোষ আর একজনেরা মিত্র। ঘোষদের দুইটি মেয়ে, একটি ছেলে: বিমলা, চপলা ও যতীন। মিত্রদের এক মেয়ে ও দুই ছেলে: সরলা, সুরেশ ও যোগেশ। ঘোষেদের ছেলেমেয়েগুলি শ্যামবর্ণ, বরং বড় মেয়েটিকে কালো বলা যায়, কিন্তু মিত্রদের সন্তানগুলি ফুটফুটে গৌরবর্ণ। ঘোষেদের কর্ত্তা প্রকাশবাবু কিছু অধিক বেতনের কর্ম্ম করেন পৈত্রিক সম্পত্তিও কিছু আছে, সুতরাং তাঁহার টাকাকড়ির বড় অনটন নাই। মিত্র-পরিবারকে কিছু টানাটানি করিয়া সংসার চালাইতে হয়।

এইরূপে দুই পরিবার একত্রে বাস করেন। এক বাড়ী, কিন্তু খাওয়া-দাওয়া স্বতন্ত্র। বড় মেয়ে দুইটির বয়স প্রায় একই এবং তাহারা দুজনে এক স্কুলেই পড়ে।

একবার প্রকাশবাবু পশ্চিমে গিয়াছিলেন। তিনি ফিরবার সময় নিজের সন্তানদের জন্য ঘর সাজাবার মতো নানা রকম শ্বেত পাথরের জিনিষ এনেছিলেন। কেবল নিজের ছেলেমেয়ের জন্য জিনিষ আনা ভাল দেখায় না, এজন্য বন্ধুর ছেলেমেয়েদের জন্যও কিছু কিছু জিনিষ এনেছিলেন। সন্ধ্যার পর বন্ধুর ছেলেমেয়েদিগকে ডাকিয়া তিনি জিনিষ-গুলি উপহার দিলেন। বিমলা দেখিল যে, সে জিনিষগুলি তাদের মতো উৎকৃষ্ট নয়; সেজন্য তার মনে একটু সঙ্কোচ হইতে লাগিল, কিন্তু তখন কিছু বলিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে পিতৃদত্ত কতকগুলি ভাল-ভাল জিনিষ আঁচলে লুকাইয়া সরলার ঘরে গেল। গিয়া দেখিল, সরলা একখানা বড়

আয়নাতে আপনার মুখ দেখিতেছে। দেখিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, 'সরলা, ভাই, আমি তোমার আলমারী সাজাতে এসেছি। বাবা যে জিনিষগুলি দিয়াছেন দাও দেখি, তাছাড়া আমিও কতকগুলি জিনিষ এনেছি। তুমি ত জান, ভাই, আমার অনেক আছে, আমার আর দরকার নাই, গোটা কত জিনিষ বড় ভাল বোধ হইল। তাই তোমাকে দিতে এসেছি। আমি নিজে তোমার আলমারী সাজিয়ে দিব।'

সরলা বিরক্তভাবে নাকটা শিকের উপর তুলিয়া বলিল, 'না ভাই, আমার ভাল জিনিষে কাজ নাই, আমরা গরীব মানুষ, আমাদের যা আছে তাই ভাল, তুমি যা এনেছ তা ত নেবই না, বরং তোমার বাবা যা দিয়েছেন তাও নিয়ে যাও।' এই বলিয়া তাড়াতাড়ি জিনিষগুলি বাহির করিয়া ফেলিয়া দিল।

বিমলা—'ছি-ভাই, তা কি করিতে আছে, বাবা কি মনে করিবেন, মেসোমশাই ও মাসীমা শুনিলে রাগ করিবেন। কেন সরলা, তুমি এমন কর, আমারা তো তোমাকে ভালবাসি।'

এই বলিয়া সরলার গলা জড়াইতে গেল। সরলা অমনি হাতখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, 'নেও, নেও তোমার আদর রেখে দাও।'

বিমলা কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, পরে নিজে যে জিনিষগুলি আনিয়াছিল সেগুলি লইয়া বিষণ্নমুখে চলিয়া গেল। তাহার পিতা সরলাকে যে জিনিষগুলি দিয়াছিলেন, তাহা মাটিতে পড়িয়া রহিল।

পরদিন প্রভাতে সরলার এক জেঠতুতো ভাই বেড়াইতে আসিল। সরলা তার সঙ্গে গল্প করিতে এমনই মত্ত হইল যে পড়াশুনা কোথায় রহিল তাহার ঠিকানা নাই। এমন কি তাহার ছোট ভাইয়ের পীড়া মা তাহাকে যে ঔষধ খাওয়াইতে বলিয়াছিলেন তাহাও মনে নাই। সেদিন তাদের ঝি আসে নাই, তার মাকে বাসন মাজিতে, কুটনা বাটনা করিতে ও ঘরের সকল কাজ করিতে হইতেছে। তিনি কাজ করিতে করিতে একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সরলা, ঔষধটা খাওয়ালি ?' সে গল্প করিতে করিতে বিরক্তভাবে বলিল, 'আমি পারব না, তুমি এসে খাওয়াও।' তার মা ঔষধ খাওয়াইতে আসিয়া তাহাকে অনেক তিরস্কার করিলেন ; মায়ে-ঝিয়ে খুব ঝগড়া হইয়া গেল।

সেদিন সরলা স্কুলে পাঠ বলিতে পারিল না। শিক্ষয়িত্রী বলিলেন,

'তোমাকে সমুদয় সময় ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।'

সরলা বলিল, 'আমার ছোট ভাই-এর ব্যায়রাম, তাতে আমাদের ঝি আসে নাই। ঘরের কাজ করতে হয়েছে, পড়া করিতে পারি নাই।'

শিক্ষয়িত্রী তাকে বেশ চিনিতেন, তাঁহার মনে হইল ভায়ের পীড়ার কথা ছলমাত্র। তিনি বলিলেন, 'তা আমি শুনব না, তোমাকে দাঁড়াইতে হবে।'

তখন সরলা বলিল, 'ও-ক্লাস থেকে বিমলাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন আমার ভায়ের ব্যায়রাম সত্যি কি না।'

শিক্ষয়াত্রী বিমলাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বিমলা আসিয়া বলিল, 'ওর ভাইয়ের ব্যায়রাম বটে, সে সমস্ত রাত্রি চীৎকার করেছে, তার উপর আবার কালকে ওদের ঝি আসে নাই, ওদের সময়ে খাওয়া দাওয়া ভার হয়েছে।'

শুনিয়া শিক্ষয়িত্রী সরলাকে সে-যাত্রা নিষ্কৃতি দিলেন।

ক্রমে ইস্কুলের প্রাইজের সময় উপস্থিত। সরলার কিরূপ প্রাইজ পাইবার কথা তাহা ত বুঝিতেই পারিতেছ। তাহার পরীক্ষা এমনই খারাপ হইয়া গেল যে ক্লাসে উঠিতে পারে কি না সন্দেহ। বিমলা কিন্তু প্রথম প্রাইজ পাইল। সরলা সেদিন স্কুলে গেল না, পিতা-মাতার কাছে গালি খাইয়া মুখটি বিরক্ত করিয়া সমস্ত দিন কাটাইল। ভয়ানক খেঁকি, যে

কথা কইতে যায়, তাহাকে যেন খাইতে আসে। বিমলা বৈকালে প্রাইজ বইগুলি লইয়া ঘরে আসিল। অপরাপর বইয়ের সঙ্গে সুন্দর ছবিযুক্ত একখানি গল্পের বই ছিল। বাড়ীর লোকের দেখা হইয়া গেলে সে দৌড়িয়া সেই সকল বই লইয়া সরলার কাছে গেল।

'দেখ ভাই, আমি কেমন বই পেয়েছি। এ বই আমরা দুজনে পড়ব। বাবা বলেছেন এ বেশ বই, আমরা পড়লে বুঝতে পারি।' বলিয়া গল্পের বইখানি খুলিয়া সরলাকে ছবি দেখাইতে গেল।

সরলা বামহস্তে বই ঠেলিয়া ফেলিয়া বলিল, 'তোমার বই তোমার থাক, অমন ঢের বই দেখেছি।'

বিমলা কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া বইখানি বন্ধ করিল ও বিষণ্নমুখে চলিয়া গেল।

পরদিন সরলা বিমলাকে বলিল, 'কালকে মন ভাল ছিল না, তাই তোমার বইটা ফিরাইয়া দিয়াছি, দেও দেখি আজ বইখানা একবার দেখি।'

বিমলা সরলার প্রসন্ন ভাব দেখিয়া যেন স্বর্গের চাঁদ হাতে পাইল। অমনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, বইগুলি আনিয়া দিল। বইগুলি দেখা সরলার অভিপ্রায় নয়, সে সেই ভাল ছবির বইখানি লইয়া তাহার মধ্য হইতে উৎকৃষ্ট একখানি ছবি-সমেত কতকগুলি পাতা ছিঁড়িয়া লইল। বইখানি একেবারে অকর্মণ্য হইয়া গেল।

সেইদিন বিমলার ছোট বোন ঐ বইয়ের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে পাতা নাই দেখিয়া বলিল, 'ও দিদি, যাঃ বইখানার কয়টা পাতা নাই।'

বিমলার যেন মনে হইতে লাগিল, সেখানে ঐ পাতা কয়টা ও একখানা ছবি ছিল, কিন্তু সাহস করিয়া আপনার স্মৃতিশক্তিকে বিশ্বাস করিতে পারিল না! কেহ যে হিংসা করিয়া বইয়ের পাতা ছিঁড়িতে পারে এ কথা তাহার মনেই যোগাইল না। সে ভাবিল, তবে বুঝি আমার দেখিবার ভুল হইয়াছে। সে বলিল, 'তবে আর কি হবে, এক একখানা বই ওরূপ হয়ে যায়।'

বইটার ক্ষতি হইল বিমলা আর সে কথা মনে রাখিল না। সেদিন রাত্রে সে প্রসন্নমনে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া ও তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইয়া সুখের শয্যায় শয়ন করিল। কিন্তু হিংসায় ও নিজ পাপের চিন্তায় সরলার ঘুম নাই। যতই সে বিমলার কথা ভাবে তার মনটা যেন গরগর করে। তার

আর কি ক্ষতি করিবে এই চিন্তায় তার ঘুম হয় না। সরলার মনে কোন ভাল চিন্তা নাই। এমন মনে কি ঈশ্বর চিন্তা আসে? সে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া শয়ন করিতে পারিল না।

কিছুদিন পরে সরলার মা পীড়িত হইলেন। সে সময়ে তিনি প্রায় একমাস কাল শয্যাতে পড়িয়াছিলেন। সে সময় সরলার কয় ভাইবোন বিমলাদের ঘরে খাইত। বিমলা সরলারা ছোট ভাইটিকে নাওয়াইয়া নিজে সঙ্গে করিয়া খাইত। স্কুল হইতে ফিরিয়াই মাসীমার কাছে গিয়া বসিত। বাতাস করিত, মাথা টিপিয়া দিত, মাসীমার ঘর গুছাইত। আর সরলা-সুন্দরী স্কুল হইতে আসিয়া নিজের অঙ্গরাগে নিযুক্ত হইতেন। মুখে সাবান ঘষিতে, চুল বাঁধিতে ও আয়নায় মুখ দেখিতে সমুদয় সময় কাটিয়া যাইত। তাহার মা বিমলাকে বলিতেন, 'ভাগ্যে তুমি ছিলে তাই আমি একটু জল পাচ্ছি। আমার মেয়েটির দ্বারা কোন কাজ হয় না।'

ইতিমধ্যে বিমলার আর একটি ভাই হইল। সে যখন আটমাসের ছেলে তখন একদিন বারান্ডায় হামা দিয়া বেড়াইতেছে ও আপনার মনে খেলা করিতেছে। সরলা বারান্ডার একধারে আপন মনে দাঁড়াইয়া আছে। সে দেখিতে পাইল, বিমলাদের খোকার হাতে একটি পয়সা রহিয়াছে এবং সে সেই পয়সাটা মধ্যে-মধ্যে মুখে দিবার চেষ্টা করিতেছে। মনে করিলেই সে ছেলের হাত হইতে পয়সা কাড়িয়া লইতে পারিত, অন্তত, চাকরাণীকে ডাকিয়া বলিতে পারিত, 'ওরে ঝি! খোকার হাত থেকে পয়সাটা নে, এখনি গালে দিবে।' কিন্তু তাহার কিছুই করিল না। খোকা পয়সাটা গালে দিল। অল্পক্ষণ পরেই পয়সাটা গলায় বাধিয়া একেবারে দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া ছেলে যায় আর কি! বাড়ীতে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। বিমলার মা রন্ধনশালাতে ছিলেন। দৌড়িয়া আসিয়া ছেলের ঘাড় নিচু করিয়া গলায় আঙুল দিয়া অতি কষ্টে পয়সাটি বাহির করিলেন। সরলা আর সে দেশে নাই। ছেলেটি খাবি খাইতে আরম্ভ করিল দেখিয়াই সে চলিয়া গিয়াছে ও নিজের ঘরে গিয়া বড় আয়নাতে মুখ দেখিতেছে। বিপদ কাটিয়া গেলে যখন সকলে জানিল যে সরলা সেখানে ছিল, তখন সরলার পিতামাতা তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, 'তুই ওখানে ছিলি অথচ পয়সাটি কেড়ে নিলি না?'

সরলা বলিল, 'ওদের ছেলে দেখা আমার কাজ না কি? যাদের ছেলে তারা দেখে না কেন?'

এবার স্কুলে সেলাইয়ের পরীক্ষা উপস্থিত। মেয়েরা একমাস ধরিয়া ঘরে নানাপ্রকার সেলাই করিতেছে। সরলা এক কৌশল খেলিয়াছে। সে গোপনে তাহার এক মাসীর বাড়ী হইতে ভাল-ভাল সেলাই চাহিয়া আনিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছে। মাঝে-সাঝে লোক দেখানো এক একবার একটু সেলাই লইয়া বসে।

ওদিকে বিমলা রাত্রিদিন পরিশ্রম করিয়া একখানি সুন্দর আসন প্রস্তুত করিল। সরলা নড়ে চড়ে আর দেখিতে আসে বিমলার আসন কতদূর হইল। দেখিয়াই বুঝিতে পারিল সে আসন দেখাইলে বিমলা খুব প্রশংসা পাইবে। সেটা তার প্রাণে সইল না। সেলাই দেখাইবার পূর্বদিন রাত্রে সরলা চুপি-চুপি একখানি কাঁচি লইয়া বিমলার বাক্স হইতে সেলাই বাহির করিয়া খণ্ড-খণ্ড় করিয়া কাটিয়া রাখিয়া আসিল।

পরদিন প্রাতে বিমলা সেলাই বাহির করিতে গিয়া দেখে তাহার সুন্দর আসনখানি খণ্ড-খণ্ড হইয়া আছে। দেখিয়া সে কাঁদিতে লাগিল, পিতা-মাতাকে দেখাইল। সকলেই বলিল ইঁদুরে কাটিয়াছে। সে বলিল— 'ইঁদুর তো আমার বাক্সে কখনও কিছু কাটে না আর আজও আর কিছু কাটে নাই।' যাহা হউক কেহ যে হিংসা করিয়া ওরূপ কাটিয়া রাখিতে পারে তাহা তাহার মনেই যোগাইল না। সে সরলার কাছে সেই কাটা সেলাই লইয়া গিয়া বলিল, 'দেখ ভাই ইঁদুর আমার সেলাইয়ের কি দুর্দশা করিয়াছে!'

সরলা যেন একেবারে গাছ হইতে পড়িয়া গেল। সে বলিল, 'ওমা, তাই ত! আহা এত সুন্দর আসনখানির এই দুর্দশা! তা কি করবে ভাই, অবোধ জানোয়ারের উপর ত আর কারও হাত নাই।'

যাহা হউক, বিমলা কাটা আসনখানি লইয়া স্কুলে গেল। শিক্ষয়িত্রী দেখিয়া অনেক দুঃখ করিলেন এবং আসনখানি সুন্দর হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে পুরস্কার দিবেন বলিয়া ঠিক করিলেন।

সরলা যখন বাক্স হইতে আপন সেলাই বাহির করিল, তখন শিক্ষয়িত্রীর তাক লাগিয়া গেল। সে যে এমন সেলাই করিতে পারে, তাঁহার সে বিশ্বাস ছিল না। তাঁহার মনে হইল সরলা অপর কাহারও সেলাই আনিয়াছে। তিনি সরলাকে বলিলেন, 'তুমি যে এমন সেলাই করিয়াছ তাহা আমার বিশ্বাস হইতেছে না। আচ্ছা তোমাকে চারি ঘণ্টা সময় দেওয়া হচ্ছে, তুমি ঐ নমুনা হইতে এইরূপ সেলাইয়ের কতকটা কর।'

এই বলিয়া সরলাকে একটি ঘরে বসাইয়া দিলেন।

বিমলা তাহার শাস্তি দেখিয়া বারবার বলিতে লাগিল, 'আমি কিন্তু বাড়িতে সরলাকে সেলাই করতে দেখেছি।'

শিক্ষায়িত্রী সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। সরলাকে কাজ দিয়া রাখিলেন। সরলা সমস্ত দিনে কিছু করিতে পারিল না। শেষে পীড়াপীড়ি করিতে আসল কথাটি বাহির হইয়া পড়িল। স্কুলশুদ্ধ সকলে জানিল যে সরলা অন্যের সেলাই নিজের বলিয়া চালাইতে গিয়াছে ও বিমলার সেলাই কাটিয়া দিয়াছে। এই কথাটা বাহির হওয়াতে সরলার ঘরের বাহির হওয়া কঠিন হইল। পিতা-মাতা আর কোনমতেই তাহাকে স্কুলে পাঠাইতে পারেন না। সে আর বিমলাদের ঘরের দিকে যায় না। বিমলা বন্ধুত্ব করিতে আসিলে অপমান করে। কাজেই তাহার পিতামাতাকে অন্যত্র উঠিয়া যাইতে হইল।

বেড়ালের স্বর্গ

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার খুড়ীমা আমাকে একটা 'আফোরা' বেড়াল দিয়ে গেছেন। এর-মত নির্বোধ জানোয়ার আমি আর কখনো দেখিনি। একদিন শীতের রাতে আগুনের সম্মুখে বসে আমার বেড়ালটা এই কথা আমাকে বলেছিল :—

আমার তখন দুই বৎসর বয়স, বেশ নাদুস-নুদুস শরীর, খুব সরল অন্তঃকরণ। এই সুকুমার বয়সে, এমন একটা জানোয়ারের সমস্ত লক্ষণ

প্রকাশ করতে লাগলেম—যারা গৃহস্থ জীবনের সমস্ত মাধুর্য্য অবজ্ঞা করে। কিন্তু বিধাতা তোমার খুড়ীর কাছে আমাকে রেখে দেওয়ায়, আমি বিধাতার নিকট খুব কৃতজ্ঞ। ঐ ভালো মেয়েমানুষটি আমাকে যারপরনাই ভালবাসতো। থালা-বাসন রাখবার আলমারটির ভিতর, আমার একটা প্রকৃত শয়ন-কক্ষ ছিল—পালোকের গদী ও তিনফের দেওয়া লেপ। খাবারও ঘরের খাবারের মত। রুটি না সুপ না,—মাংস ছাড়া আর কিছুই না

—বেশ তাজা লাল মাংস ! বেশ ! এই বিলাসের মধ্যে থেকে আমার শুধু একটি বাসনা—একটি স্বপ্ন ছিল, সে কি ? না,—খোলা জানালা দিয়ে গলে' ছাদের উপর ছুটে যাওয়া। আদর আমার ভাল লাগত না, নরম শয্যায় শুয়ে আমার গা-বমি-বমি করত। আর আমার দেহের স্থূলতা কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। সমস্ত দিন সুখে থেকে মনের মধ্যে একটা বিরক্তির ভাব এসেছিল।

একদিন জানালা থেকে গলা বের করে' সম্মুখে একটা ছাদ দেখতে পেলেম। সেইখানে চারটে বেড়াল ঝগড়া করছিল—তাদের গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে,—তাদের ল্যাজ উপর দিকে তোলা—ভরপুর দিনের আলোয় ছাদের নীল শ্লেটের উপর গড়াগড়ি দিচ্চে। আর মনের সুখে গালাগালি করছে। এমন অশ্চর্য দৃশ্য আমি কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি। এখন থেকে কতকগুলো বিশ্বাস মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে গেল। সযত্নে বন্ধ করা ঐ জানালার পিছনে যে ছাদটা আছে, সেই ছাদেই প্রকৃত সুখ।

আমি পালাবার একটা ফন্দি ঠিক করলাম। জীবনে লাল মাংস ছাড়া আর কিছু চাই।—সেই অজানা কিছু—সেই মনের ধ্যেয় বস্তু। একদিন ওরা রান্নাঘরের জানলা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল। সেই জানালার ঠিক নীচে যে ছোট একটা ছাদ ছিল, সেই ছাদের উপর লাফিয়ে পড়লেম।

॥ ২ ॥

এই ছাদগুলো কি সুন্দর ! ধারে ধারে বড় বড় নর্দমা ; তার থেকে সুমধুর গন্ধ আসছে। আমি আহ্লাদের সহিত এই সব নর্দমার ভিতর দিয়ে চলতে লাগলেম—এক জায়গায় একটা সুন্দর কাদায় আমার পা ডুবে গেল—এই কাদার মাধুর্য্য ও উষ্ণতা কথায় প্রকাশ করা যায় না। মনে হচ্ছিল যেন আমি মখমলের উপর দিয়ে চলচি। সুর্য্যের বেশ একটা উত্তাপ গায়ে লাগচে—সেই উত্তাপে গায়ের চর্বি যেন গলে পড়ছে।

এ কথা তোমার কাছে আমি গোপন করব না, আমার সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপছিল। আমার আনন্দের মধ্যে একটা ভয়ের ভাব ছিল। বিশেষতঃ আমার মনে পড়ে, আমি এমন ভয় পেয়েছিলুম যে, আর একটু হ'লে আমি নীচে মেঝের উপর পড়ে যেতাম। তিনটে বেড়াল—যারা একটা বাড়ীর ছাদ থেকে গড়িয়ে পড়েছিল—তারা ভীষণ ভাবে 'ম্যাও ম্যাও' শব্দ করতে করতে আমার কাছে এসে পড়ল। আমি প্রায় মূর্ছা যাবার মত হয়েছি

দেখে তারা আমাকে নির্বোধ মনে করে আমার সঙ্গে সেই রকম ব্যবহার করতে লাগল। আমাকে বল্লে, 'শুধু মজা করার জন্য আমরা ঐ রকম ম্যাও ম্যাও শব্দ করছিলাম।' তখন আমিও তাদের সঙ্গে 'মিউ মিউ' করতে লাগলেম। সে ভারী মজার। এই আমুদে বেড়ালদের গায়ে আমার মত বিশ্রী চর্ব্বি ছিল না। এই আমুদে দলের একটা বুড়ো বেড়ালের সঙ্গে আমার খুব ভাব হ'ল। সে বল্লে, 'আমার শিক্ষা সম্পূর্ণ করে দেবে?'—আমি কৃতজ্ঞতার সহিত এ প্রস্তাবে রাজী হলেম।

খুড়ীমার সেই আরামের শয্যা হ'তে এখন আমি কত দূরে! আমি নর্দমাতেই আহারাদি করতে লাগলেম। এখানকার চিনি দেওয়া দুধ আমার এমন মিষ্টি লাগল—এ রকম আমি আর কখনও খাইনি! এখানকার সবই ভাল—সবই সুন্দর মনে হ'তে লাগল। এই সময় একটা মাদী বেড়াল আমার পাশ দিয়ে গেল—মনোমুগ্ধকর অপূর্ব সুন্দরী!—তার মেরুদণ্ড কেমন নমনীয়। এই রকম অপূর্ব সুন্দরীদের আমি কেবল স্বপ্নেই দেখেছি। আমি ও আমার তিন সঙ্গী আমরা তাকে অভিবাদন করার জন্য, তার কাছে ছুটে গেলেম।

আমি সকলের আগে ছিলেম—দু' একটা প্রশংসার কথা সুন্দরীকে বলতে যাচ্ছি, এমন সময়—আমার সঙ্গীদের মধ্যে একজন, আমার ঘাড়ে এক কামড় দিলে। কামড় খেয়ে আমি চীৎকার করে উঠলেম।

বুড়ো বেড়ালটা আমাকে একদিকে টেনে নিয়ে বল্লে,—'ফোঃ', এ রকম সুন্দরী আরো ঢের মিলবে।'

॥ ৩ ॥

এক ঘণ্টাকাল ঘোরাঘুরি করে আমার ভয়ানক ক্ষিধে পেল। আমি আমার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলেম, 'বাড়ীর ছাদের উপর কি খাবার আছে?'

বন্ধু বিজ্ঞভাবে উত্তর করলে, 'যা পাওয়া যায় তাই।'

উত্তরটা আমার ভাল লাগল না। আমি খুব খোঁজাখুঁজি করেও কিছুই পেলেম না! শেষে দেখতে পেলেম, এক কোঠার ছাদের অধঃস্থ ঘরে অল্পবয়স্ক এক মজুরণী মধ্যাহ্ন-ভোজনের আয়োজন করছে। জানালার নীচে একটা টেবিলের উপর ক্ষুধা-উদ্রেককারী একটা টুকটুকে 'কাটলেট' রয়েছে। আমি সরল অন্তকরণে মনে মনে ভাবলেম—আমার ঠিক মনের মতন হয়েছে। আমি তখন টেবিলের উপর লাফিয়ে পড়ে—

কাটলেটটা খেতে গেলেম। স্ত্রীলোকটা আমাকে দেখতে পেয়ে আমার শিরদাঁড়ায় ঝাড়ু দিয়ে খুব এক ঘা বসিয়ে দিলে। আমি মুখ থেকে মাংসটা ফেলে দিয়ে দে ছুট। বুড়ো বেড়ালটা আমাকে বল্লে, 'তোমার নিজ গাঁয়ের বাইরে যাও কেন? টেবিলের উপর মাংস রাখা হয়, দূর থেকে তার ঘ্রাণেই সন্তুষ্ট হতে হয়। মাংস পেতে হলে নর্দমা খুঁজতে হয়।'

রান্নাঘরের মাংসের উপর যে বেড়ালের অধিকার নেই, এ-কথা আমি কখনই বুঝতে পারিনি! ক্ষিধেয় আমার পেট জ্বলছিল। বুড়ো বেড়ালটা বল্লে, 'রাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে!' আমি হতাশ হয়ে পড়লেম। তারপর রাস্তায় নেমে জঞ্জালের টিবিগুলো খুঁজে দেখতে হবে। রাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষা করা! ও তো কঠোর তত্ত্বজ্ঞানীর মত বেশ শান্তভাবে আমাকে উপদেশ দিলে। কিন্তু লম্বা উপোস করতে হবে মনে করেই যে আমার মাথা ঘুরছে—আমর মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম হয়েছে।

॥ ৪ ॥

ধীরে ধীরে রাত্রি এসে পড়ল। টিপটিপ ক'রে বৃষ্টি হচ্ছিল। খুব শীত করতে লাগল। তারপর মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল—বৃষ্টির ধারাগুলো খোঁচা খোঁচা অন্তর্ভেদী, দমকা বাতাসের যোগে যেন চাবুক মারছিল। একটা সিঁড়ি দিয়ে আমরা নামলেম। রাস্তাটা এমন বিশ্রী মনে হ'ল, কি বলব! সেখানে আর রোদ্দুরের তাপ নেই। রোদ্দুর-লাগা গরম ছাদে গিয়ে যে একটু রোদ পোয়াবো তার জো নেই। তেলা বাঁধানো রাস্তার উপর আমার পা পিছলে যাচ্ছিল, তখন আমার সেই তিন ফের দেওয়া লেপ, আমার সেই পালোকের গদি মনে পড়ল।

রাস্তায় পৌঁছিয়েই আমার বন্ধু বুড়ো বেড়াল থরথর করে কাঁপতে লাগল। তারপর সে শরীরকে কুণ্ঠিত করে খুব ছোট হয়ে, বাড়ীগুলো ঘেঁসে ঘেঁসে ছুটে চলতে লাগল। আর আমাকে বল্লে, শীগগির তার পিছনে আসতে। একটা বাড়ীর দরজা সামনে পেয়ে তার ভিতর আমরা তাড়াতাড়ি ঢুকে লুকিয়ে রইলুম ও আনন্দে রোঁয়া ফুলিয়ে ঘড় ঘড় শব্দ করতে লাগলেম। আমি জিজ্ঞাসা করলেম, 'আমাদের পালাবার কারণটা কি?'

সে বল্লে, 'একটা ঝুড়ি ও একটা আঁকড়া লাগানো ছড়ি হাতে একজন লোককে দেখনি?'

'হ্যাঁ, দেখেছিলাম।'

'আচ্ছা! সে যদি আমাদের দেখতে পেত তা হ'লে নির্ঘাৎ আমাদের মাথায় সেই লাঠির বাড়ি মারত। আর আমাদের পুড়িয়ে খেয়ে ফেলত!'

আমি বলে উঠলেম, 'আমাদের পুড়িয়ে খেয়ে ফেলত! তা হ'লে রাস্তাও আমাদের না? আমরা খেতে পাচ্চিনে, ওরা উল্টে আমাদেরই খেয়ে ফেলবে?'

যা হোক, লোকেরা তাদের দরজার সম্মুখে জঞ্জাল জড়ো করে রেখেছিল। আমি হতাশ হয়ে সেই জঞ্জালরাশি তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখলেম। আমি দু তিনটে মাংসহীন হাড় পেলেম—পোড়া কাঠের সঙ্গে এসে পড়েছিল। তখন আমি বুঝতে পারলেম, তাজা যকৃৎ কেমন রসালো! আমার বন্ধু বুড়ো বেড়াল মিস্ত্রীদের মত জঞ্জালের উপর নোখ দিয়ে আঁচড়াতে লাগল। সকাল পর্য্যন্ত সে আমাকে দৌড় করিয়েছিল—ব্যস্ত না হয়ে প্রত্যেক পাকা রাজপথে গিয়ে খোঁজাখুঁজি করছিলেম। প্রায় ১০ ঘণ্টা আমি বৃষ্টিতে ভিজেছিলেম। আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছিল। চুলোয় যাক রাস্তা! চুলোয় যাক স্বধীনতা! তখন আমার সেই কারাগারে যেতে আমি কতই লালায়িত হলেম।

ভোরের বেলা, বুড়ো বেড়ালটা আমার পা টানছে, আর একটা অদ্ভুত মুখের ভঙ্গী ক'রে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমার সাধ মিটেছে কি?'

আমি উত্তর করলেম, 'হ্যাঁ'।

'তুমি কি বাড়ী যেতে চাও?'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু বাড়ীটা খুঁজে যাব কেমন করে?'

'আমার সঙ্গে এসো। আজ সকালে তোমার মত মোটা বেড়ালকে দেখে আমি ঠিক বুঝতে পারলেম, স্বাধীনতার কঠোর আনন্দ তোমাদের জন্য নয়। তোমার বাসা আমি চিনি। আমি দরজা পর্য্যন্ত তোমাকে পেঁছে দেবো।'—এই কথা সাদাসিধে ভাবে বল্লে।

যখন আমরা পেঁছিলেম, সে মনের আবেগ কিছুমাত্র প্রকাশ না ক'রে শুধু বল্লে, 'আসি তবে। বিদায়।'

আমি বলে উঠলেম, 'না, তা হবে না। এই রকম ক'রে বিদায় নিলে চলবে না। আমার সঙ্গে তোমায় আসতে হবে, এক শয্যা এবং এক খাদ্য মাংস আমার সঙ্গে ভাগাভাগি করতে হবে। আমার মনিব খুব ভালো মেয়েমানুষ....'

সে আমার কথা শেষ করতে দিলে না।—'চুপ কর। তুমি অতি নির্ব্বোধ। তোমার পালোকের গদির ভিতর থাকলে আমি মরে' যাব। গোলাম জাতের বেড়ালদের পক্ষে তোমার ধরনের সংসার যাত্রা ভালো। একটা কারাগারের মূল্য দিয়ে, স্বাধীন বেড়ালরা তোমার শয্যা তোমার খাদ্য কখনই ক্রয় করবে না। বিদায়।'

সে আঁচড় পাঁচড় কেটে আবার ছাদের উপর উঠে পড়ল। আমি দেখতে পেলেম—তার পাতলা দেহযষ্ঠী উদীয়মান সূর্য্যের আলোয় কাঁপছে। যখন আমি বাড়ী ঢুকলেম, তোমার খুড়ীমা আমাকে চাবুক দিয়ে পিটিয়ে দিলেন—অতি আনন্দের সহিত আমি সেই প্রহার সহ্য করলেম। প্রহারের সঙ্গে সঙ্গে গরম হবার সুখটা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করতে লাগলেম। যখন তিনি আমাকে প্রহার করছিলেন, তখনি আবার তিনি আমাকে মাংস খেতে দেবেন, আর সেই মাংস খাবার যে কত সুখ, আমার কেবল তাই মনে হচ্ছিল।

আগুনের কাছে চার পা ছড়িয়ে দিয়ে আমার বেড়াল শেষে আমাকে এই কথা বললে—'দেখুন প্রভু, যে ঘরে খাদ্য থাকে, সেই ঘরে বদ্ধ হয়ে থাকা আর মার খাওয়া—এই হচ্ছে প্রকৃত সুখ ও প্রকৃত স্বর্গ।'

আমি বেড়ালের মুখপাত্র হয়ে এই কথা বলছি।"

ঝানু চোর চানু

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

ছেলেবেলা থেকেই চানু শয়তানের একশেষ, আশেপাশের লোকজন তার জ্বালায় অস্থির। চানুর বাবা বড় গরিব ছিল। চানু ভাবল, বিদেশ গিয়ে টাকা পয়সা রোজগার করে আনবে। যেমন ভাবা তেমনি কাজ, একদিন সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। খানিক দূর গিয়েই বনের ভিতর দিয়ে একটা নির্জন রাস্তা—চানু সেই রাস্তা ধরে চলল। সমস্ত দিন বৃষ্টিতে ভিজে শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে সধ্যার সময় পথের ধারেই একটি কুঁড়েঘর ছিল, সেখানে এসে উপস্থিত।

ঘরের ভিতরে আগুনের পাশে একটি বুড়ি বসেছিল, চানুকে দেখে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কি চাই বাপু তোমার ?'

চানু বলল, 'চাইব আর কি, কিছু খাবার-দাবার চাই, আর একটি বিছানা চাই !'

বুড়ি বলল, 'সরে পড় বাপু, এখানে কিছু পাবে না। আমার ছয়টি ছেলে, সারাদিন খেটেখুটে তারা এখনই বাড়ি ফিরবে। তোমাকে এখানে দেখতে পেলে তারা তোমার গায়ের চামড়া তুলে ফেলবে।'

চানু। 'সেটা আর বেশি কথা কি ? এই ঠাণ্ডায় বাইরে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে মরার চাইতে গায়ের চামড়া তুলবে সেইটাই বরং ভাল।'

বুড়ি দেখল সে সহজ লোকের পাল্লায় পড়ে নি ; কি আর করে, তখন চানুকে পেট ভরে খেতে দিল। শুতে যাবার সময় চানু বুড়িকে বলল, 'দেখো বুড়ি, তোমার ছেলেরা এসে যদি আমার ঘুম ভাঙায় তা হলে কিন্তু বড় মুশকিল হবে বলছি।'

পরের দিন ঘুম ভাঙলে পর চানু দেখল ছয় জন অতি বদ-চেহারার লোক তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে—সে তাদের দেখে গ্রাহ্যও করল না।

দলের সর্দারটি তখন চানুকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কে হে বাপু ? কি চাও এখানে ?'

চানু। 'আমার নাম সর্দার চোর, আমার দলের জন্য লোক খুঁজে বেড়াচ্ছি। তোমরা যদি চালাক চতুর হও তা হলে তোমাদের অনেক বিদ্যে

শিখিয়ে দেব।'

সর্দার বলল, 'আচ্ছা বেশ, তুমি তা হলে এখন উঠে একটু খাওদাও, তারপর দেখা যাবে এখন কে সর্দার!'

বিছানা থেকে উঠে সকলের সঙ্গে বসে চানু খেল। ঠিক তারপরই সকলে দেখল একটা সুন্দর ছাগল সঙ্গে নিয়ে একজন কৃষক বনের পাশে যাচ্ছে। তখন চানু বলল, 'আচ্ছা, তোমাদের কেউ কোনরকম জবরদস্তি না করে শুধু ফাঁকি দিয়ে ঐ লোকটার ছাগলটা নিয়ে আসতে পার?'

একজন একজন করে সকলেই বলল, 'না ভাই, আমরা কেউ তা পারব না।'

চানু। 'ব্যাস্, তাহলেই দেখো আমি তোমাদের সর্দার কিনা—আমি এখনি ছাগলটা নিয়ে আসছি।'

এই বলে সে তখনই বনের ভিতর দিয়ে গিয়ে রাস্তার মোড়ে তার ডান পায়ের জুতোটা রেখে দিল, তারপর ছুটে গিয়ে কিছু দূরের রাস্তায় আর একটা মোড়ে বাঁ পায়ের জুতোটাও রেখে রাস্তার ধারে বনের ভিতর চুপ করে লুকিয়ে রইল।

খানিক পরেই সেই কৃষক এসে প্রথম জুতোটা দেখে মনে করল, 'খাসা জুতোটা পড়ে রয়েছে, কিন্তু এক পাটি কি হবে, আর এক পাটিও থাকলে ভাল হত।'

খানিক দূরে এগিয়ে গিয়ে কৃষক আর-এক পাটি জুতো দেখে ভাবল, 'আমি কি বোকা, ও পাটিটা যদি নিয়ে আসতাম। যাই, তাহলে ওটা নিয়ে আসি গিয়ে।' একটা গাছে ছাগলটা বেঁধে সে চলল জুতো আনতে। এদিকে চানু কিন্তু ছুটে গিয়ে আগেই সেটা নিয়ে এসেছে। তারপর কৃষক ছাগলটাকে বেঁধে রেখে যখন চলে গেল তখন চানুও বাঁ পায়ের জুতোটা নিয়ে ছাগলের বাঁধন খুলে সেটাকেও নিয়ে বনের ভিতর দিয়ে বুড়ির কুঠিরে এসে উপস্থিত .

কৃষক গিয়ে প্রথম জুতোটাও পেল না, ফিরে এসে পরের জুতোটাও পেল না, তার উপর আবার যখন দেখল যে ছাগলটিও সেখানে নেই, তখন সে ভাবল, এখন করি কি? গিন্নিকে যে বলে এসেছি বাজারে ছাগলটা বেচে তার জন্যে একখানা গায়ের চাদর কিনে নিয়ে যাব! যাই তা হলে, চুপচাপ গিয়ে আর-একটা জন্তু নিয়ে আসি, তা নইলে যে ধরা পড়ে যাব, গিন্নি ভাববে আমি বোকার একশেষ।

এদিকে চানু ছাগল নিয়ে বুড়ির বাড়িতে যখন গেল তখন সেই চোরেরা

ত একেবারে অবাক ! চানুকে কত করে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু কিছুতেই সে বলল না কি করে সেই ছাগল আনল।

খানিক বাদেই সেই কৃষক একটা মোটাসোটা সুন্দর ভেড়া নিয়ে এসে উপস্থিত। চানু বলল, 'যাও দেখি, কে জবরদস্তি না করে ভেড়াটা আনতে পার।'

ছয় চোরের সকলেই অস্বীকার করল। তখন চানু বলল, 'আচ্ছা, দেখি আমি পারি কি না, আমাকে একটা দড়ি দাও দেখি।' দড়ি নিয়ে চানু বনের ভিতরে ঢুকে পড়ল।

এদিকে কৃষকটি তার ছাগল চুরির কথা ভাবতে ভাবতে রাস্তা দিয়ে চলেছে, মোড়ের কাছেই এসে দেখে গাছের ডালে একটা মড়া ঝুলছে। মড়া দেখেই তার গায়ে কাঁটা দিল, 'রক্ষা করো বাবা ! খানিক আগে ত এখানে মড়া-টড়া কিছু দেখতে পাইনি।' সামনের মোড়ে গিয়ে কৃষক দেখল, আর একটা মড়া গাছের ডালে ঝুলছে। 'রাম রাম রাম—এ হলো কি ? আমার মাথাটা গুলিয়ে যায় নি ত ?' কৃষক তাড়াতাড়ি চলল। কিন্তু কি সর্বনাশ। রাস্তার আর-একটা মোড়ে গিয়ে দেখে সেখানেও একটা মড়া ঝুলছে ! পর পর তিনতিনটে মড়া এতটা কাছাকাছি ঝুলছে দেখে তার মনে সন্দেহ হলো —'নাঃ, এ কখনই হতে পারে না। আমারই বোধ করি মাথা খারাপা হয়েছে। আচ্ছা, দেখে আসি আগের মড়া দুটো এখনো গাছে ঝুলছে কি না।' কৃষক সবে মাত্র মোড়টা ফিরেছে তখন ডালের মড়া চট করে নেমে এসে বাঁধন খুলে ভেড়াটাকে নিয়ে বনের ভিতর দিয়ে একেবারে বুড়ির বাড়ি গিয়ে হাজির।

এদিকে কৃষক গিয়ে দেখল মড়া-টরা কিছুই গাছে ঝুলছে না। ফিরে এসে দেখল তার ভেড়াটাও নেই, কে জানি দড়ি খুলে নিয়ে চম্পট দিয়েছে। তখন তার মনটা কেমন হলো তা বুঝতেই পার ! বেচারি মাথা খুঁড়তে লাগল—'হায়, হায় ! কার মুখ দেখে আজ বেরিয়েছিলাম, এখন গিন্নি কি বলবে ? সমস্ত সকালটাই মাটি হয়ে গেল ; ছাগল, ভেড়া দুটোই গেল, এখন করি কি ? একটা কিছু এনে বাজারে বিক্রি করে গিন্নির শাল না কিনলেই চলবে না। আসবার সময় দেখেছিলাম ষাঁড়টা মাঠে চরে বেড়াচ্ছে, যাই সেটাই গিয়ে নিয়ে আসি—গিন্নি দেখতে পাবে না।'

চানু যখন চোরদের বাড়ি ভেড়া নিয়ে গিয়ে উপস্থিত, তখন চোরদের আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। সর্দার চোরটি বলল, 'আর একটা যদি এরকম চালাকি খেলতে পার তাহলে তোমাকে আমাদের সর্দার করব।'

ততক্ষণে কৃষকটিও ষাঁড় নিয়ে এসে উপস্থিত। চানু বলল, 'যাও ত জবরদস্তি না করে কে ষাঁড়টা ফাঁকি দিয়ে আনতে পার?' কেউ যখন ভরসা পেল না তখন সে বলল, 'আচ্ছা, দেখি, আমি পারি কি না।' চানু বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

কৃষকটি খানিকদূর এগিয়ে গিয়েই বনের মধ্যে একটা ছাগলের ডাক শুনতে পেল। ঠিক তার পরেই একটা ভেড়াও ডেকে উঠল। আর তাকে রাখে কে! একটা গাছে ষাঁড়টাকে বেঁধে রেখে ছুটল বনের ভিতর। কৃষক যত যায় ততই শোনে এই একটু আগেই ডাকছে, দেখতে দেখতে প্রায় আধ মাইল দূরে চলে গেল। তখন হঠাৎ সব চুপচাপ, ভেড়া-ছাগলের ডাক আর শুনতে পাওয়া গেল না। এদিক-সেদিক খুঁজে খুঁজে কৃষক একেবারে হায়রান হয়ে গেল—কোথা বা ছাগল আর কোথায় বা ভেড়া। বেচারি কাহিল হয়ে আবার ফিরে এল। কিন্তু কি সর্বনাশ! এসে দেখে ষাঁড়টিও সেখানে নেই। বন উলট-পালট করে ফেলল, কিছুতেই আর ষাঁড়ের খোঁজ পেল না।

চানু যখন ষাঁড় নিয়ে এসে উপস্থিত তখন আর কথাটি নেই। চোরেরা চানুকে তাদের সর্দার করল। তাদের আনন্দ দেখে কে, সমস্তটা দিন আমোদ করেই কাটিয়ে দিল। লুটপাট করে চোরেরা যা-কিছু আনত একটা গহ্বরের মধ্যে সব লুকিয়ে রাখত, রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর তারা চানুকে নিয়ে সেই সমস্ত টাকাকড়ি সব দেখিয়ে দিল—চানুই যে এখন তাদের সর্দার, তাকে সব না দেখালে চলবে কেন।

দলের সর্দার হবার প্রায় এক সপ্তাহ পরে চোরেরা একদিন চানুকে বুড়ির জিম্মায় রেখে চুরি করতে গেল। খালি বাড়ি, চানু সেই শয়তান বুড়িকে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, তুমি যে এদের ঘর-সংসার দেখ, এরা তোমাকে তার দরুণ বকশিশ-টকশিশ দেয় না?'

বুড়ি। 'বকশিশ দেয়, না ওদের মাথা দেয়!'

চানু। 'বটে, কিছু দেয় না! আচ্ছা, এসো আমার সঙ্গে, আমি তোমাকে ঢের টাকা দেব।' বুড়িকে সঙ্গে করে চানু টাকার ঘরে গেল। জন্মেও বুড়ি এত ধন কোনদিন দেখে নি—মুখ হাঁ করে সেই রাশি রাশি টাকা আর মোহরের দিকে বুড়ি খানিকক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর বুড়ির আহ্লাদ আর ধরে না। হাঁটু গেড়ে মাটিতে পড়ে দুই হাতে টাকাগুলো ঘাটতে লাগল। সময় বুঝে চানুও তার পকেট বোঝাই ত করলেই, তারপর একটা থলে মোহর দিয়ে ভর্তি করে চুপিচুপি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে

বাইরের দিক থেকে দরজায় চাবি লাগিয়ে দিল—বুড়ি সেই টাকার ঘরেই আটকা পড়ে রইল।

বেরিয়ে এসেই চানু সুন্দর একটা পোশাক পরলে, তারপর সেই ছাগল, ভেড়া আর ষাঁড়টাকে নিয়ে একেবারে সেই কৃষকের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত। কৃষক তার স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ির দরজায় বসেছিল, তারপর সেই হারানো জন্তুগুলিকে দেখে আহ্লাদে লাফিয়ে উঠল।

চানু বলল, 'এ জন্তুগুলো কার বলতে পার কি?'

'এগুলো যে আমাদের, আপনি কোথায় পেলেন মশায়?'

'এই বনের ভিতর চরে বেড়াচ্ছিল! আচ্ছা, ছাগলটার গলায় একটা থলে ঝুলছে, তাতে দশটা মোহর রয়েছে—ওগুলিও কি তোমাদের?'

'না মশায়। আমরা গরিব দুঃখী লোক, মোহর কোথা পাব?'

'আচ্ছা, মোহরগুলোও তোমরা নাও, আমার কিছু দরকার নেই।'

মোহরগুলি নিয়ে দুই হাত তুলে কৃষক চানুকে আশীর্বাদ করল।

সমস্ত দিন পথ চলে চানু প্রায় সন্ধ্যার সময় তার বাড়িতে এসে উপস্থিত। বাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখল তার মা বাবা বসে আছেন। চানু বলল, 'ভগবান আপনাদের ভাল করুন, আজ রাতটা আপনাদের বাড়ি থাকতে পারি কি?'

'আপনার মত ভদ্রলোক কি এখানে থাকতে পারবেন? আমরা যে বড্ড

গরীব।'

চানু আর চুপ থাকতে পারল না, 'বাবা, তুমি কি তোমার ছেলেকেও চিনতে পারছ না ?'

চানুর মা-বাবা খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল, তারপর চানুকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'এমন সুন্দর পোশাক তুমি কোথা পেলে বাবা ?'

চানু বলল, 'পোশাক দেখেই অবাক হয়ে গেলে, তাহলে এই টাকাগুলো দেখে কি করবে ?' এই বলে চানু পকেট খালি করে সব মোহর টেবিলের উপর রাখল।

এতগুলো মোহর দেখে চানুর বাবার বড্ড ভয় হলো। চানু তখন সব কথা খুলে বলল—তারা আশ্চর্য বুদ্ধির কথা শুনে চানুর মা-বাপের আনন্দ আর ধরে না।

পরের দিন সকালে চানু বাবাকে বলল, 'বাবা, যাও জমিদার বাড়ি। বলো গিয়ে, আমি তাঁর মেয়েকে বিয়ে করতে চাই।'

চানুর কথা শুনে তার বাবার চোখ বড হয়ে গেল, 'বলিস কিরে বেটা ! তা হলে যে আমার পিছনে কুকুর লেলিয়ে দেবে।'

'না, তুমি বোলো যে আমি সর্দার চোর, আমার মত ঝানু চোর দুনিয়ায় নেই, জবরদস্ত ও ওস্তাদ চোরদের ফাঁকি দিয়ে লাখ টাকা রোজগার করে এনেছি। দেখো বাবা, যখন দেখবে জমিদারের মেয়েও সেখানে আছে তখনই এ-সব কথা বোলো।'

'আচ্ছা, এতো করে যখন বলছ যাচ্ছি, কিন্তু কিছু হবে বলে মনে হয় না।' প্রায় দুই ঘণ্টা পরে চানুর বাবা ফিরে এল। চানু বলল, 'কি করে এলে বাবা ?'

'নেহাত মন্দ নয়। মেয়েটি যে বড় অনিচ্ছুক তা ত মনে হলো না, বোধ করি বাবাজি তুমি এর আগেও তার কাছে এ প্রস্তাবটি করেছ—না ? যা হোক, জমিদারমশায় বললেন, আসছে রবিবারে তাঁরা নাকি একটি হাঁস ভেজে খাবেন, তুমি যদি কড়া থেকে হাঁসটা বে-মালুম চুরি করতে পার, তা হলে তিনি তোমার কথা ভেবে দেখবেন।'

'এ আর তেমন শক্ত কাজ কি ? দেখা যাবে এখন।'

রবিবার দিন জমিদার এবং বাড়ির সকলে রান্নাঘরে রয়েছেন—হাঁস ভাজা হচ্ছে, এমন সময় রান্নাঘরের দরজা খুলে গেল। একটা অতি কুৎসিত বুড়ো ভিখারি, পিঠে তার একটা মস্তবড় থলে ঝুলছে, সে এসে

রান্নাঘরের দরজায় উঁকি মেরে বলল, 'জয় হোক বাবা! আপনাদের খেয়েদেয়ে কিছু থাকলে আমি বুড়ো ভিখারি কিছু খেতে পাব কি?'

জমিদারমশায় বললেন, 'অবশ্যি পাবে। রান্নাঘরের দাওয়ায় একটু বোসো!'

জানালার পাশে একজন লোক বসেছিল। খানিক পরে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, মস্তবড একটা খরগোশ ছুটে বাগানের দিকে যাচ্ছে, এটাকে মারলে হয় না?'

জমিদার ধমক দিয়ে বললেন, 'খরগোশ মারবার ঢের সময় মিলবে, এখন চুপ করে বসে থাকো।'

খরগোশটা বাগানে গিয়ে ঢুকল। ভিখারি পোশাক-পরা চানু থলের ভিতর থেকে আর-একটা খরগোশ ছেড়ে দিল। একটু পরেই চাকর আবার চেঁচিয়ে উঠল, 'বাবু বাবু, খরগোশটা এখনো রয়েছে—এখনো চেষ্টা করলে মারা যায়।'

আবার জমিদার ধমক দিলেন, 'চুপ করে থাকো বলছি।'

খানিক বাদে চানু আরো একটা খরগোশ থলে থেকে বের করে ছেড়ে দিল। চাকরও চেঁচিয়ে উঠল—আর যায় কোথা। একজন একজন করে সবকটি চাকর রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে খরগোশের পেছনে তাড়া করল, জমিদারমশায়ও বাদ পড়লেন না।

খরগোশ তাড়িয়ে সকলে ফিরে এসে দেখে ভিখারিও নেই, কড়ার মধ্যে হাঁসও নেই।

জমিদারমশায় বললেন, 'আচ্ছা ফাঁকিটা দিয়েছে চানু, সত্যি সত্যি আমাকে জব্দ করেছে।'

একটু পরেই চানুদের বাড়ি থেকে একজন চাকর এসে জমিদারমশায়কে বলল, 'আজ্ঞে, আমার মনিব বলে পাঠিয়েছেন, আপনারা অনুগ্রহ করে আমাদের বাড়ি গিয়ে খাবেন।'

জমিদার বড় চমৎকার সাধাসিধে লোক ছিলেন, মনে একটুও অহঙ্কার ছিল না। স্ত্রীকে ও মেয়েকে নিয়ে চানুদের বাড়িতে গেলেন এবং সকলের সঙ্গে বসে নানারকমের ভাল ভাল খাবার জিনিসের সঙ্গে তাঁর সেই হাঁস-ভাজাটিও খেলেন। চানুর চালাকির কথা বলে জমিদারমশায় হাসতে হাসতে পাঁজরে ব্যথা ধরিয়ে ফেললেন। মেয়েটি ত আগে থেকেই চানুকে পছন্দ করত, এখন তার পোশাক দেখে এবং তার আদব-কায়দা দেখে মনে

মনে আরো খুশি হলো।

খাওয়া-দাওয়ার পর জমিদার বললেন, 'চানু, শুধু হাঁস চুরি করেই আমার মেয়ে পাবে না। কাল রাত্রে আমার আস্তাবল থেকে আমার ছয়টি ঘোড়া যদি চুরি করতে পার তা হলে দেখা যাবে এখন। ছ'জন সহিস কিন্তু ছয়টি ঘোড়ার পিঠে চড়ে পাহারা দেবে মনে রেখো।'

চানু বলল, 'আচ্ছা চেষ্টা করে দেখব এখন।'

সোমবার রাত্রে জমিদারের আস্তাবলে ছয়জন সহিস ছয়টি ঘোড়ার পিঠে বসে আছে। বেজায় ঠাণ্ডা, রক্ত যেন জমে যেতে চায়; তাই প্রত্যেকের জামার পকেটে একটি করে মদের বোতল, খানিক পরে পরে একটু করে মদ খেয়ে গা গরম করে নিচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না, তাই সকলে মিলে মহা গল্প জুড়ে দিল—চানুর জন্য আস্তাবলের দরজা খোলাই রেখেছিল। রাত যত বেশি হতে লাগল ঠাণ্ডাটাও যেন বাড়তে লাগল। মদে আর শানায় না, গায়ে কাঁপুনি ধরে গেল! এমন সময় ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপতে কাঁপতে একটা কদাকার বুড়ি এসে দরজায় উঁকি মেরে বলল, 'বাবাসকল, শীতে জমে গেলাম, এক মুঠো খড় দাও ত আস্তা বলের এককোণে রাতটা পড়ে থাকি, তা নাহলে বুড়ো মানুষ, শীতে মরেই যাব।' বুড়ির পিঠে ছয়টা থলে, মুখে প্রায় দু আঙ্গুল লম্বা দাড়ি—চেহারাটি কুৎসিতের একশেষ।

বুড়ি আস্তাবলের দরজায় উঁকি মেরে বলল, 'লক্ষ্মী বাপ আমার, বুড়ো মানুষ শীতে মরে গেলাম, ঐ কোনটাতে একটু জায়গা দাও, এক মুঠো খড় নিয়ে পড়ে থাকব এখন।'

সহিসরা ভাবল, 'এলোই বা বুড়ি, বেচারি শীতে জমাট বেঁধে গেল—ও ত আর কোন অনিষ্ট করবে না।' আস্তাবলের কোণে খড় পেতে বুড়ি বেশ আরামে বসল। সহিসেরা দেখল, বুড়ি খানিক পরেই একটা কালো বোতল বের করে একটু মদ খেল—তার মুখে আর হাসি ধরে না, যেন সে খুবই আরাম বোধ করছে। সহিসদের বুড়ি বলল, 'বাবা, তোমাদের সব মদ বোধ করি শেষ করে ফেলেছ, তা আমার কাছে ঢের আছে! তবে কিনা তোমরা পাছে কিছু মনে কর তাই তোমাদের দিতে ভরসা পাচ্ছি না।' একে বেজায় শীত, তার উপরে সত্যি সত্যি তাদের মদ শেষ হয়ে গেছে, বুড়ির কথা শুনে সহিসরা যেন হাতে চাঁদ পেল—'সে কি বুড়িমা, তুমি যদি দাও তা হলে ত বেঁচে যাই, ঠাণ্ডায় মরে গেলাম।'

বুড়ির বোতলটি দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল, তবুও সহিসদের শীত গেল না ! শয়তান বুড়ি তখন আর একটা বোতল বের করে তাদের দিল। বোতলটার মদের সঙ্গে কি মেশানো ছিল, খাওয়ামাত্র সব কটা সহিস ঘোড়ার পিঠে গদির উপরে বসেই নাক ডাকিয়ে ঘুম দিল।

তখন বুড়ি উঠে সব কটা সহিসকে খড়ের উপর শুইয়ে ঘোড়াগুলোর পায়ে মোজা পরিয়ে দিল। তারপর সবগুলিকে নিয়ে একেবারে চানুদের বাইরের একটা ঘরে গিয়ে হাজির !

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে জমিদারমশায় প্রথমেই কি দেখলেন ? তাঁর বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়েই চানু ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে আর তার ঘোড়ার পিছনে অপর পাঁচটা ঘোড়াও চলেছে।

জমিদারমশায় অবাক হয়ে রইলেন, মনে মনে বললেন, গোল্লায় যা তুই চানু, আর যাদের চোখে ধুলো দিয়েছিস সেবেটারাও গোল্লায় যাক। অস্তাবলে গিয়ে সহিস বেটাদের জাগাতে জমিদারমশায়ের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল।

সকালবেলা জমিদারমশায় খেতে বসেছেন, চানুকেও ডেকে এনেছেন, খেতে খেতে চানুকে বললেন, 'কতগুলো বোকা-পাঁঠার চোখে ধুলো দিযেছ। এতে বাহাদুরি নেই। আচ্ছা, আজ বেলা একটা থেকে তিনটে পর্যন্ত আমি ঘোড়ায় চড়ে বাড়ির সামনে ঘুরে বেড়াব, নিও দেখি বাপু আমার ঘোড়াটা চুরি করি। তাহলে বুঝব তুমি বাহাদুর এবং আমার জামাই হবার উপযুক্ত।

চানু মাথা নিচু করে উত্তর করল, 'যে আজ্ঞে, একবার চেষ্টা করে দেখব এখন।'

একটার পর থেকে জমিদার ঘোড়ায় চড়ে পায়চারী করেকরে একেবারে কাহিল হয়ে পড়লেন। তিনটে বেজে গেল, চানুর টিকিটিও দেখতে পেলেন না। মনে করলেন, এবার বাড়ি ফিরে যাবেন, এমন সময় তাঁর একটা চাকর পাগলের মত ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এসে হাজির—'কর্তা শিগ্‌গির বাড়ি যান, মা-ঠাকরুনকে বুঝি বা আর দেখতে পেলেন না ; সিঁড়ির উপর থেকে তিনি পড়ে গেছেন। বোধ করি হাত-পা সব ভেঙ্গে গেছে, তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। আমি চললাম ডাক্তারের বাড়ি।'

জমিদারের চোখ বড় হয়ে গেল, 'বলিস কিরে বেটা, কি সর্বনাশ ! ডাক্তারের বাড়ি যে ঢের দূর, তুই আমার ঘোড়াটা নিয়ে ছোট্ শিগ্‌গির।' ঘোড়ায় চড়ে চাকর তখন ডাক্তারের বাড়ি ছুটল।

জমিদারমশায় হোঁচট খেতে খেতে বাড়িতে এসে উপস্থিত। বাড়ি এসে

দেখলেন সাড়া-শব্দ কিছুই নেই, সব চুপচাপ। ব্যস্তসমস্ত হয়ে বাড়ির ভেতরে গেলেন, সেখানে বসবার ঘরে গিন্নি আর মেয়ে দিব্যি আরাম করে বসে আছে। এতক্ষণে জমিদারমশায়ের চৈতন্য হলো। তিনি বুঝতে পারলেন, এ সব চানু বেটারই চালাকি—বেটা তাঁকে আচ্ছা ঘোল খাইয়েছে।

খানিক পরেই দেখলেন, চানু তাঁর ঘোড়ায় চড়ে বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছে। সেই চাকর বেটার কিন্তু আর কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না। চাকর তার জন্য একটুও কেয়ার করে না, নাইবা করল তাঁর চাকরি—চানু যে তাকে দশটা মোহর দিয়েছিল, তা দিয়ে তার অনেক দিন চলবে।

পরের দিন চানু এসে জমিদার বাড়ি উপস্থিত, জমিদার বললেন, 'তুমি বাপু এবারে নেহাত ফাঁকি দিয়েছ, ওতে তোমার উপর আমার বড্ড রাগ হয়েছে। যা হোক আজ রাত্রিতে যদি আমাদের বিছানা থেকে চাদরখানা চুরি করতে পার তা হলে কালকেই বিয়ের আয়োজন করব।'

চানু বলল, 'আজ্ঞে আচ্ছা, একবার চেষ্টা করে দেখব, কিন্তু এবারে যদি ফাঁকি দেন, তা হলে কিন্তু আপনার মেয়েকেই চুরি করে নিয়ে যাব।'

রাত্রে জমিদার আর তাঁর গিন্নি শুয়েছেন, দিব্যি জ্যোৎস্না, কাঁচের জানালার ভিতর দিয়ে চাঁদের আলো এসে ঘরে পড়েছে। জমিদারমশায় দেখলেন হঠাৎ যেন একটা মাথা জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে যাচ্ছিল। তাঁদের দেখতে পেয়েই আবার সরে পড়ল।

জমিদার গিন্নিকে বললেন—'দেখলে ত? এ বেটা নিশ্চয় চানু।' তারপর বন্দুকটা হাতে করে নিয়ে বললেন, 'দেখো, আমি বেটাকে এখনি চমকে দিচ্ছি।'

বন্দুক দেখেই জমিদার-গিন্নি ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'কর কি, চানুকে গুলি করবে নাকি?'

জমিদার বললেন, 'আরে না, তুমি কি পাগল হলে নাকি? বন্দুকে কি আর গুলি পুরেছি—শুধু বারুদ।'

খানিক পরেই আবার জানালায় মাথা উঁকি মারল, দড়াম করে জমিদার বন্দুক ছেড়ে দিলেন—সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলেন, ধপ করে কি নীচে পড়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লেগেছে!

জমিদার-গিন্নি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হায় ভগবান, বেচারি বোধ করি মরে গেছে, আর না-হয় জন্মের মত খোঁড়া-কানা হয়ে থাকবে।'

জমিদারমশায় কেমন জানি থতমত খেয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলেন—দরজা

খোলাই পড়ে রইল।

জমিদারমশায় বোধ করি তখনো বাইরের জানালার কাছে পেঁছান নি, কিন্তু গিন্নিঠাকরুন শুনলেন, কর্তা ফিরে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলছেন, 'শিগ্‌গির বিছানার চাদরখানা দাও, বেটা মরেনি বোধহয়, কিন্তু বেজায় রক্ত পড়ছে, একটু পরিষ্কার করে বেঁধে-টেঁধে ওকে নিয়ে আসব।'

গিন্নিঠাকরুন একটানে চাদরখানা বিছানা থেকে তুলে দরজায় ছুঁড়ে দিলেন। চাদর নিয়ে জমিদারমশায় আবার ছুটলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য সেই মুহূর্তেই তিনি ফিরে এসে ঘরে উপস্থিত—সে সময়ের মধ্যে বাগানে জানালার কাছে গিয়ে ফিরে আসা একেবারে অসম্ভব।

ঘরে ঢুকেই জমিদার রেগেমেগে বলতে লাগলেন—'বেটা পাজি চানু, তোকে ফাঁসী দেওয়া দরকার।'

কর্তার কথা শুনে গিন্নি অবাক হয়ে বললেন—'বেচারির বেজায় লেগেছে আর তুমি কিনা তাকে গালাগালি দিচ্ছ!'

'ওর লাগাটাই বাস্তবিক উচিত ছিল। বেটার বদমাইশি দেখেছ? খড় দিয়ে একটা মানুষ বানিয়ে সেটাকে কাপড়-চোপড় পরিয়ে এনে জানালায় ধরেছিল।'

'কী ছাই মাথামুণ্ডু বলছ, আমি বুঝতেই পারছি না। খড়ের মানুষ হলে তার রক্ত মুছবার জন্য আবার বিছানার চাদর নিয়ে গেলে কেন?'

'বিছানার চাদর—বলছ কি! আমি তো বিছানার চাদর-টাদর চাইতে আসিনি।'

'চাদর চাইতে আসো আর না আসো সে-সব কিছু জানি না। তুমি এসে দরজায় দাঁড়িয়ে চাদর চাইলে আর আমিও তোমাকে দিয়েছি।'

গিন্নির কথা শুনে জমিদারমশায় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন, 'কী ভীষণ শয়তান রে বাবা চানু—ওর সঙ্গে আর পেরে উঠব না। কাল সকালেই বিয়ের বন্দোবস্ত করতে হবে দেখছি।'

এরপর চানুর সঙ্গে জমিদার কন্যার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর চানু খুব ভাল হয়ে গেল, তার মত জামাই সচরাচর মেলে না। জমিদারমশায় এবং গিন্নি শতমুখে চানুর সুখ্যাতি করেন, আর লোকের কাছে বলেন, 'আমার ঝানু চোর চানু।

মাটি নিবি গো

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

'মাটি নিবি গো'—চীরপরিধানা, শুষ্কা, শীর্ণা, কর্দমপরিলিপ্তা দুঃখিনী মাথায় এক ঝুড়ি মাটি লইয়া বেচিতেছে। অনাহারে তাহার কণ্ঠরব মৃদু, দারিদ্রের পীড়নে তাহার দেহযষ্টি কিঞ্চিৎ ন্যুব্জ, তাহার আশা নাই, ভরসা নাই, সুখ নাই, স্বস্তি নাই,—আছে কেবল পেটের জ্বালা, আছে কেবল জীবনের মায়া। সে বাঁচিতে চাহে—জীবন-সুখেই সে কেবল বাঁচিতে চাহে ; কিন্তু বাঁচিবার উপায় তাহার কিছুই নাই, আছেন কেবল মা গঙ্গা, যখন ভাঁটার টানে জল নামিয়া যায়, তখন সে গঙ্গার মাটি, নখাঙ্গুলের শীর্ণ নখের সাহায্যে চাঁচিয়া আনিয়া পাড়ায় পাড়ায় বেচিয়া বেড়ায়। অথবা যখন কোন ঐশ্বর্যশালী ধনবান পুরুষ নতুন ভবন নির্ম্মাণ করিবার আয়োজন করেন, তখন বুনিয়াদ খুঁড়িতে যে মাটি বাহির হয়, তাহাই কিছু সংগ্রহ করিয়া সে ক্ষুধার অন্ন সঞ্চয় করে। মাটিই তাহার অন্ন। মাটিই তাহার জীবন।

'মাটি নিবি গো'—কাতরকণ্ঠে দুঃখিনি আবার ডাকিল। কই, কেহ ত সাড়া দেন না, কেহ ত দরজা খুলিয়া মাটি কিনতে পথে আসিয়া দাঁড়ায় না! বুঝি, দুঃখিনী আর মাটির বোঝা বহিতে পারে না। বুঝি, তাহার আজ অনাহারে দিন যায়! বেলা দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে, কলিকাতার শান-বাঁধান 'ফুট পথে' আর পা পাতিয়া চলা যায় না, পিপাসায় তাহার তালু শুষ্ক হইয়াছে, অধরোষ্ঠে ধুলা উড়িতেছে ; দুঃখিনী আর সহিতে পারে না, তাহার দুই চক্ষুর কোণ হইতে অশ্রুর দুইটি মোটা ধারা গড়াইয়া পড়িল। হা বিধাতঃ! মাটিও কেহ কিনিতে চাহে না! এমন সময় বাবুদের বাড়ীর একটি চাকরাণী চাঁচা বাখারির মত কালো-কালো দেহখানিকে দোলাইয়া, এক পিঠ চুল নাচাইয়া, আহারান্তে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে সেই পথে আসিয়া দাঁড়াইল। বোরুদ্যমানা মৃত্তিকা-বিক্রয়িত্রীকে চোখের জল ফেলিতে দেখিয়া ঝি মহাশয়া চোখমুখ বাঁকাইয়া বলিল—"আঃ, মর মাগী, দরজায় ব'সে আবার কান্না হচ্ছে।"

ঝিয়ের মিষ্ট সম্ভাষণ শুনিয়া, একটু সামলাইয়া, মাটিওয়ালী উদাসভাবে বলিল—"হ্যাঁ মা, তোমাদের পাড়ায় কি কেহ উনান পাতে না, কাহারও বাড়িতে কি রসুই-ঘর নাই; কোন গৃহে কি তুলসীমঞ্চ নাই? তোমরা কি হাতে মাটি কর না?"

এক গাল হাসিয়া, যেন সোহাগে আটখানা হইয়া ঝি উত্তর করিল—"না রে না,—এ যে বাবু সাহেবদের পাড়া। এখানে কাহারও চালচুলা নাই, তুলসীমঞ্চ নাই, হাতে মাটির রেওয়াজও নাই। এ পাড়ায় কি মাটি বেচিতে আসিতে আছে?"

মাটিওয়ালী—তবে ইহারা খায় কি! খায় না! সেতখানাও যায় না।

ঝি—খাবে না কেন! দিনের মধ্যে পাঁচবার খায়। বাবুর্চি্খানায় রান্না হয়, রসুই-করা সামগ্রী ঘরে আনিয়া খায়। হাতে মাটি দেয় না, সাবান মাখে। বুঝিলি, এপাড়ায় কোন বাড়ীতেই মাটি বিকাইবে না।
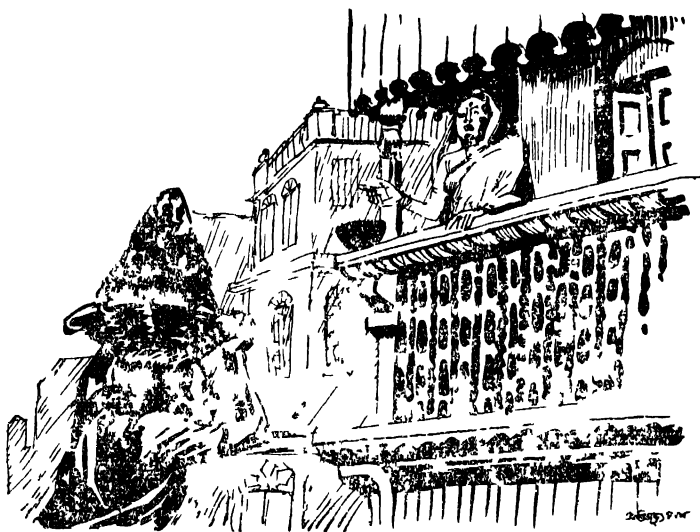
মাটিওয়ালী ঝিয়ের কথা শুনিয়া চোখের জল মুছিল, এবং নিরাশ-ভাবে মাটির ঝুড়িটা মাথায় তুলিতে চেষ্টা করিল। বুধা দুই দিন একটি চণকও দাঁতে কাটে নাই, ক্ষুধায় স্থির হইয়া বসিতে পারিতেছে না মাটির ঝুড়ি মাথায় তুলিবে কি! ঝুড়ি তুলিতে গিয়া সে উল্টাইয়া পড়িয়া গেল। ঝি নিতান্ত হৃদয়হীনা নহে, সেও এক দিন অনাহারে কষ্ট পাইয়াছে, ক্ষুধার্ত্তের জ্বালা সে বেশ বুঝে; সে-বেদনার স্মৃতি এখনও সে হৃদয়

হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। ঝি তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর হইতে এক ঘটি জল আনিয়া মাটিওয়ালীর চোখে মুখে দিল। দুঃখিনীর একটু জ্ঞান হইল, পাঁজর-ভাঙ্গা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে আবার বলিল, "হা ভগবান্, মাটি কেহ খরিদ করিতে চাহে না!" এই কথা শুনিয়া, এবং দরজায় একটা হাঙ্গামা হইতেছে বুঝিয়া বাড়ীর গৃহিণী বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "মাটিওয়ালী, তোর এক ঝুড়ি মাটির দাম কত?" অতি ধীরে দুঃখিনী বলিল, "চারি পয়সা।"

গৃহিণী—অত মাটির দাম চার পয়সা! আমি দুই আনা দেব, আমায় সব মাটি দিয়ে যা।

শীর্ণমুখে একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া মাটিওয়ালী উত্তর করিল, "আর দয়া করিতে হবে না মা। দেবতাই আমাকে যথেষ্ট দয়া করিয়াছেন। চারি পয়সা পাইলে আমার শ্রম সার্থক হইবে।"

গৃহিণী—সে কি! দয়া কেমন! দেবতার দয়া কি দেখিলে?

মাটিওয়ালী—যখন আমার দেহে বল ছিল, তখন আমি যত মাটি বহিতে পারিতাম, তাহার দাম পাড়ার লোকে চারি পয়সা দিত। এখন তাহার অর্দ্ধেক বহিতে পারি, তবু চারি পয়সাই পাই। বার্দ্ধক্যে ইহাই আমার পক্ষে দেবতার দয়া। আর তুমি মা যখন নেমে আসিয়াছ, তখন দেবতার দয়া বাকী কি আছে!

গৃহিণী—চাট্টি ভাত খাবি? ভাত যদি খেতে না চাস্ ত একটু গরম দুধ দিব—খাইবি?

মাটিওয়ালী—অত সুখ সহিবে না মা। আমায় চারটি পয়সা দেও, আমি ঝুড়িটা উপুড় করিয়া খালি ঝুড়ি লইয়া চলিয়া যাই।

এইটুকু বলিয়া মাটিওয়ালী জোর করিয়া উঠিয়া বসিল, জীর্ণ বস্ত্রাঞ্চলে কোটরগত দুইটি চক্ষু মুছিল, একটা ঢোক গিলিয়া সামলাইয়া গৃহিণীর মুখের পানে চাহিয়া আবার বলিতে লাগিল—"মাটি কেনা বন্ধ করিও না মা,—আমার কথা শুন—যখন তোমার দ্বারে আমার মত আর কেহ মাটি বেচিতে আসবে, অমনি তখনই দুই এক পয়াসার মাটি তাহার নিকট হইতে খরিদ করিও। মাটি লক্ষ্মী, মাটি শেষের সম্বল। যাহার সর্ব্বস্ব গিয়াছে, তাহার মাটি আছে। মাটি আছে বলিয়াই, মা আমি এমন দুঃখিনী হইয়াও ভিখারিণী হই নাই—কাঙ্গালিনী সাজিতে পারি নাই। চারিটার উপর আর চারিটা পয়সা তুমি আমায় ভিক্ষা দিতে

চাহিয়াছিলে। আমি তাহা লইব কেন? যতক্ষণ মাটি আছে, ততক্ষণ আমার অন্ন আছে। আমি ভিক্ষা করিব কেন মা? সৌখীন ঘরের গৃহিণী তুমি মা, তোমার নয়নটাও সৌখীন রকমের। আজ তুমি আমায় দুধ খাওয়াইতে চাও, কাল আমার কি দশা হইবে? আজ তুমি আমার চার পয়সার মাটি আট পয়সায় কিনিলে কাল অমন দাম কে দিবে? লাভের মধ্যে আমার লোভ বাড়িয়া যাইবে, আমার মাটি বেচার ব্যাঘাত ঘটিবে। না মা, তোমার পয়সা তোমার থাকুক, আমাকে ন্যায্য মূল্য দিলেই আমি সুখী হইব। তোমার মাটির প্রয়োজন নাই তবুও যে মাটি কিনিলে, দুঃখিনীর বোঝার লাঘব করিলে, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট দয়া।"

গৃহিণী নীরবে মাটিওয়ালীকে চারিটা পয়সা দিয়া, স্বয়ং নিজ হস্তে মাটির ঝুড়ি তুলিয়া ঘরে রাখিলেন। কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া, অঞ্চলের বস্ত্র জড়াইয়া গললগ্নীকৃতবাসে, সাষ্টাঙ্গে মৃত্তিকার স্তূপকে প্রণাম করিলেন, এবং করজোড়ে বলিলেন—"মাটি, তুমি সত্যই মা-টি। যাহার সর্ব্বস্ব গিয়াছে, তাহার মাটি আছে। তুমি শেষ, তুমি অনন্ত। মা-টি আমার, তুমি স্থির হইয়া আমার ঘরে থাক। মূঢ়া আমি জানিতাম না, তাই তোমায় তোমার যোগ্য মর্য্যাদা দিই নাই, তোমার উপাসনা করি নাই। আজ আমার সুপ্রভাত, এমন মহীয়সী দুঃখিনী আমার গৃহদ্বারে আসিয়াছিল, তাইতো তোমার মহিমা বুঝিলাম। থাক মা, যুগে যুগে যেমন আমার শ্বশুর-বংশে পূজিতা হইয়া আসিয়াছ, আবার তেমনি ভাবে থাক। তুমি অন্ন, তুমি প্রাণ, তুমি মান, তুমি ধর্ম্ম, তুমি বাঙ্গালার বাঙ্গালীর সর্ব্বস্ব, তুমি আমার ঘরে স্থির হইয়া থাক। তোমায় বার বার নমস্কার করিতেছি।"

এই ভাবে মৃত্তিকার স্তব করিয়া গৃহিণী চোখের জল মুছিয়া পবিত্রা হইলেন—ধন্য হইলেন! জ্ঞানময়ী ভাবময়ী লক্ষ্মীস্বরূপিণী তিনি, মাটিওয়ালীর কথায় তাঁহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল, তাঁহার জীবনের ভাবের ধারা নূতন প্রণালী অবলম্বন করিল। তিনি বাঙ্গালীত্বের মহিমা বুঝিলেন।

আইস বাঙ্গালী, একবার মাটিওয়ালীর মতন আমরাও মাটির—আমাদের মা-টির ফেরি করিয়া জীবন ধন্য করি। মাটি নিবি গো—যে মাটিতে তুমি মা শিব গড়িয়া পূজা কর এবং সংসারে কল্যাণের ধারা প্রবাহিত করিয়া দেও—সেই মাটি নিবি গো? এ মাটি চোরে চুরি করে না, বিদেশী

ব্যবসায়ী কাটিয়া দেশান্তরে লইয়া যায় না ; এ মাটির মূল্য নাই, যথার্থ মূল্য আজ পর্য্যন্ত কেহ করিতেও পারে নাই। তোরা কেউ মাটি নিবি গো! এ মাটির প্রতি কণা বিশাল ভারতবর্ষের বক্ষবিধৌত হইয়া সঞ্চিত হইয়াছে, পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার কোটি তরঙ্গে দুলিয়া দুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া এ মাটি সর্ব্বতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া গঙ্গার স্রোতোমুখে বাঙ্গালার বক্ষে আসিয়া সঞ্চিত হইয়াছে। এ মাটির স্তরে স্তরে ভারতেতিহাস গাঁথা রহিয়াছে ; যুগ-যুগান্তরের কত গাথা ইহাতে খচিত রহিয়াছে। আমাদের বড় সাধের মা-টি নিবি গো! এ মাটি আমার সত্যই কল্পলতিকা ; যাহা চাও তাহাই দিবেন ; দিতেছেন, দিয়াছেন! এই মা-টির প্রভাবে আমাদের সকল অভাব দূর হইয়াছে ; সকল কষ্টের মোচন হইয়াছে। এই মাটি হইতেই বাঙ্গালার কার্পাস ; এবং সেই কার্পাস হইতেই ঢাকার মল্‌মল! এই মাটি হইতেই বাঙ্গালার তুঁতের চাষ আর সেই তুঁত হইতেই রেশমের গুটি এবং বাঙ্গালার পট্টবস্ত্র। এই মাটি হইতেই অন্ন ; আর সেই অন্নের জোরেই বঙ্গভূমি ভারতবর্ষের অন্নপূর্ণা। আমাদের বাঞ্ছাকল্পলতিকা মৃত্তিকা তোরা কেউ নিবি গো! ছাব রজতকাঞ্চন ; ছার দ্বিরদরদনির্ম্মিত আসন ; ছার মণিমুক্তা ; প্রবাল হীরা—ছার বিভব বাণিজ্য! আমার মাটি বজায় থাকিলে ; তাহা হইতে পাট উৎপন্ন হইয়া কোটি কোটি টাকা ঘরে আনিয়া দেয়। আমার মাটি বজায় থাকিলে তাহা হইতে ঘাস উৎপন্ন হইলেও, অন্নজলের সংস্থান করিয়া দেয়। আমার মাটির বাঁশবনেও টাকার তোড়া সাজান আছে ; কলাবনে মণিমুক্তা ছড়ান আছে। হায় বাঙ্গালী ; এমন মাটিকেও অবহেলা করিতেছে।

মাটি নিবি গো—যাহার সর্ব্বস্ব গিয়াছে ; তাহার মাটি আছে। ঐ শুন, ইয়োরোপে মহারণের দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে। আর ব্যবসায়ী জাহাজ আসিবে না ; আর বিলাসদ্রব্য পাইবে না ; আর নগদ টাকার মুখ দেখিতে পাইবে না। সর্ব্বস্ব যাইবে ; থাকিবে কেবল মাটি। যে মাটিকে মাথায় করিয়া রাখিতে পার যদি, তবেই ক্ষুধার অন্ন পাইবে ; তৃষ্ণার জল পাইবে ; লজ্জা নিবারণের বস্ত্র জুটিবে। এমন শ্যামা মাটিকে—তোমাদের বাঙ্গালী জাতির মা-টিকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিও না। তোমার আধুনিক শহর ; নগর ; রাজধানী—সকলই ব্যাসকাশী, ঐখানে মরিলে গাধা হয়, বাঁচিয়া থাকিলে মর্কট হইতে হয়। এ সব থাকে না, থাকে নাই। গৌড়, রাজমহল, একদলা, পাণ্ডুয়া, রমাবতী, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা—একে একে কত

হইয়াছে, কত গিয়াছে। কোথায় নবদ্বীপ—কোথায় বা জগদ্দল! সব গিয়াছে, সব যাইবে—থাকিবে কেবল মাটি, স্তরবিন্যস্তভাবে, সদাস্নিগ্ধ কোমল পেলবরূপে থাকিবে কেবল মাটি! ঐ মাটিই অহঙ্কারের এবং স্পর্দ্ধার চিহ্নগুলিকে স্বীয় কুক্ষিগত করিয়া ঢাকিয়া রাখিবে—এখনও তেমন অনেক দর্পের ভস্মস্তূপ বাঙ্গালার সর্ব্বাঙ্গে এবং সর্ব্বত্র ঢাকা আছে। ঐ মাটির গুণে আজ বাঙ্গালা মরুভূমে পরিণত হয় নাই। ঐ মাটির স্তন্যপীযূষধারা শত ধারায় বিদূরিত হইয়া তোমাকে এখনও ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল দিতেছেন। এমন অক্ষর ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার মাটিকে ঘরে তুলিয়া রাখ নাই? এই মাটি অমূল্য নিধি। এই মাটিতেই খোল হয়, যে খোলের চাঁটি শুনিলে এখনও বাঙ্গালী নাচিয়া উঠে। এই মাটিতে নিমাই ও নিতাইয়ের দিব্যমূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়, যাহাদের পুণ্য প্রভাবে আজও বাঙ্গালায় ভাবের তরঙ্গ উছলিয়া উথলিয়া উঠিতেছে। এই মাটিতেই দশভুজার প্রতিমা গড়িয়া বাঙ্গালী জীবন সার্থক কর! একবার এই মা-টিকে মা-মা বলিয়া বাঙ্গালী এক বার গড়াগড়ি দেও! তোমার দেহ পবিত্র হউক, তোলার মনুষ্যজন্ম সার্থক হউক।

মা-টি নিবি গো—বাঙ্গালার মাটি-হারা, মায়ের ছেলে, তোমরা যদি দেহ পবিত্র রাখিতে চাও, তৈজসপত্র পবিত্র রাখিতে চাও, পবিত্র অঙ্গনে যদি গোপালদের লইয়া দেবতার খেলা খেলিতে চাও,—তবে মাটি লও। মেয়েদের প্রবচন আছে—কোলের ছেলে কোলন্যাঙড়া, মাটির ছেলে সোনার চাঙ্গড়া। এ মাটিতে গড়াগড়ি দিলে সত্যই সোনার চাঙড়া হওয়া যায়। এই মাটি মাখিয়া আমরা নীরোগ, এই মাটি হইতেই আমাদের সর্ব্বস্ব। যে দিন হইতে মাটি ছাড়িয়াছি, সেই দিন হইতে চিররোগা, দুঃখী হইয়াছি। যে দিন হইতে মাটি ভুলিয়াছি, সেই দিন হইতে মা-টির স্নেহ হারাইয়াছি। বাঙ্গালার মাটি অতি পবিত্র, তাই বাঙ্গালার মাটিতেই দেবপ্রতিমা নির্ম্মিত হয়। বঙ্গভূমি মৃন্ময়ী, তাই বাঙ্গালার সর্ব্বস্ব মৃন্ময়। এ মাটিতে কাঁকর নাই, পাথর নাই, কোনখানে কাঠিন্য নাই। এমন মাটি লইবে না? লও—লও, আমার সোনার মাটি, ক্ষীরের মাটি—লও, লও! দুধটুকু মারিয়া যেমন ক্ষীরটুকু হয়, ভারতের পীযূষধারাকে শুকাইয়া, গঙ্গার কটাহে নাড়িয়া বাঙ্গালার ক্ষীর মাটি হইয়াছে। এমন ক্ষীরের মাটিকে অবহেলা করিও না। বলিয়াছি ত, এ মাটি কেহ কাড়িয়া লইয়া যাইতে পারিবে না। তুমি বাঁচিয়া থাকিতে পারিলে, এ মাটি

তোমারই থাকিবে, তোমারই আছে। যে মাটি ভগবানের চরণতাড়নায় দশ বার পবিত্রীকৃত, যে মাটি গঙ্গাজলে সদা সিক্ত, যে মাটির স্তরে স্তরে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত—লও, লও, সাধের মাটি, সোহাগের মাটি, আদরের মাটি, স্নেহের মাটি—লও, লও। মা-টির কোলে যাইলে, মাটিকে কোলে রাখিলে সকল পাপ-তাপ—শীতল হইয়া যায়, সকল জ্বালা যন্ত্রণা দূর হইয়া যায়, সকল অভাবের বিমোচন হয়। এমন কোমল মাটিকে ভুলিও না।

মাটি নিবি গো—সাবান পমেটম ভুলিয়া—মাটি নিবি গো! বিদেশের প্রসাধন-উপাদান সকলকে মাটিতে ফেলিয়া মাটি নিবি গো! ইয়োরোপের পাউডার-ভস্ম ফুৎকারে উড়াইয়া—মাটি নিবি গো! একবার দাঁড়াও; কোঠাবালাখানা ত্যাগ করিয়া, মর্ম্মরকুটীরকে বর্জ্জন করিয়া, নগরের সৌধশুষ্কতাকে পরিহার করিয়া নিত্য স্নিগ্ধ, নিত্য শ্যামল বাঙ্গালার মাটির উপর দাঁড়াও। মাটির উপর দাঁড়াইলেই মাটির আদর করিতে শিখিবে, তখন আমার মাটি বেচা সার্থক হইবে। সর্ব্বস্বান্ত বাঙ্গালী, তোমার কেবল মাটিই ত আছে। মাটি আছে বলিয়াই তুমি এখনও বাঁচিয়া আছ; মাটি আছে বলিয়াই তোমার সোহাগের স্মৃতি আছে; মাটি আছে বলিয়াই মা-টির ক্রোড়ের প্রচ্ছন্ন নিধি খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এমন দিনে মাটি গ্রহণ কর, সে মাটিতে আবার শিব গড়িয়া পূজা কর, তোমার অশেষ কল্যাণ হইবে।"

ছেলেধরা

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সেবার দেশময় রটে গেল যে, তিনটি শিশু বলি না দিলে রূপনারায়ণের উপর রেলের পুল কিছুতেই বাঁধা যাচ্ছে না। দুটি ছেলেকে জ্যান্ত থামের নীচে পোঁতা হয়ে গেছে, বাকি শুধু একটি। একটি সংগ্রহ হলেই পুল তৈরী হয়ে যায়। শোনা গেল, রেল-কোম্পানির নিযুক্ত ছেলেধরারা শহরে ও গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্চে। তারা কখন এবং কোথায় এসে হাজির হবে, কেউ বলতে পারে না। তাদের কারও পোশাক ভিখিরীর, কারও বা সাধু-সন্ন্যাসীর, কেউ বা বেড়ায় লাঠিহাতে ডাকাতের মত—এ জনশ্রুতি পুরানো, সুতরাং কাছাকাছি পল্লীবাসীর ভয়ের ও সন্দেহের সীমা রহিল না যে এবার হয়ত তাদের পালা, তাদের ছেলেপুলেই হয়ত পুলের তলায় পোঁতা যাবে!

কারও মনে শান্তি নেই, সব বাড়িতেই কেমন একটা ছমছম ভাব। আবার তার উপরে আছে খবরের কাগজের খবর। কলকাতায় যারা চাকরি করে তারা এসে জানায়, সেদিন বউবাজারে একটা ছেলেধরা ধরা পড়েচে, কাল কড়েয়ায় আর একটা লোককে হাতে-নাতে ধরা গেছে, সে ছেলে ধরে ঝুলিতে পুরছিল। এমনি কত খবর। কলকাতার অলিতে গলিতে সন্দেহ-ক্রমে কত নিরীহের প্রতি কত অত্যাচারের খবর লোকের মুখে মুখে আমাদের দেশে এসে পৌঁছুল। এমনি যখন অবস্থা তখন আমাদের দেশেও হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটে গেল। সেইটে বলি।

পথের অদূরে একটা বাগানের মধ্যে বাস করেন বৃদ্ধ মুখুজ্যে-দম্পতি। ছেলেপুলে নেই, কিন্তু সংসারিক সকল ব্যাপারে আসক্তি আঠারো আনা। ভাইপোকে আলাদা করে দিয়েছেন, কিন্তু আর কিছুই দেননি। দেবেন এ-কল্পনাও তাঁদের নেই। সে এসে মাঝে মাঝে দাবী করে ঘটি-বাটি-তৈজস-পত্র; খুড়ী চেঁচিয়ে হাট বাঁধিয়ে দিয়ে লোকজন জড়ো করেন, বলেন হীরু

আমাদের মারতে এসেছিল। হীরু বলে, সেই ভাল—মেরেই একদিন সমস্ত আদায় করবো।

এমনি করে দিন যায়।

সেদিন সকালে ঝগড়ার চূড়ান্ত হয়ে গেল। হীরু উঠানে দাঁড়িয়ে বললে, শেষ বেলা বলচি খুড়ো, আমার ন্যায্য পাওনা দেবে কিনা বল ?

খুড়ো বললেন, তোর কিছুই নেই।

নেই ?

না।

আদায় করে আমি ছাড়ব।

খুড়ী রান্নাঘরে কাজে ছিলেন, বেরিয়ে এসে বললেন, তা হলে যা তোর বাবাকে ডেকে আন্ গে।

হীরু বললে, আমার বাবা স্বর্গে গেছেন, তিনি আসতে পারবেন না,—আমি গিয়ে তোমাদের বাবাদের ডেকে আনব। তাদের কেউ হয়তো বেঁচে আছে—তারা এসে চুলচিরে আমার বখ্‌রা ভাগ করে দেবে !

তারপর মিনিট-দুয়েক ধরে উভয় পক্ষে যে-ভাষা চলল তা লেখা চলে না।

যাবার আগে হীরু বলে গেল, আজই এর একটা হেস্তনেস্ত করে তবে ছাড়ব। এই তোমাদের বলে গেলুম। সাবধান !

রান্নাঘর থেকে খুড়ী বললেন, তোর ভারী ক্ষমতা। যা পারিস কর গে।

হীরু এসে হাজির হলো রাইপুরে। ঘর-কয়েক গরীব মুসলমানদের পল্লী। মহরমের দিনে বড় বড় লাঠি ঘুরিয়ে তারা তাজিয়া বার করে। লাঠি তেলে পাকানো, গাঁটে গাঁটে পেতল বাঁধানো। এই থেকে অনেকের ধারণা তাদের মত লাঠি-খেলোয়াড় এ অঞ্চলে মেলে না। তারা পারে না এমন কাজ নেই। শুধু পুলিশের ভয়েই শান্ত হয়ে থাকে।

হীরু বললে, বড় মিঞা, এই নাও দুটি টাকা আগাম। তোমার আর তোমার ভায়ের। কাজ উদ্ধার করে দাও আরো বক্‌শিশ পাবে।

টাকা দুটি হাতে নিয়ে লতিফ মিঞা হেসে বললে, কি কাজ বাবু ?

হীরু বললে, এদেশে কে না জানে তোমাদের দু-ভায়ের কথা ! লাঠির জোরে বিশ্বাসদের কত জমিদারি হাসিল করে দিয়েছ—তোমরা মনে করলে পার না কি !

বড় মিঞা চোখ টিপে বললে, চুপ্‌ চুপ্‌ বাবু, থানার দারোগা শুনতে পেলে আর রক্ষে থাকবে না। বীরনগর গ্রামখানাই যে দু-ভায়ে দখল করে দিয়েছি, এ যে তারা জানে। কেউ চিনতে পারেনি বলেই ত সে-যাত্রা বেঁচে গেছি।

হীরু আশ্চর্য হয়ে বললে, কেউ চিনতে পারেনি ?

লতিফ বললে, পারবে কি করে। মাথায় ইয়া পাগ্‌ বাঁধা, গালে গাল-পাট্টা, কপালে কপাল-জোড়া সিঁদুরের ফোঁটা, হাতে ছ-হাতি লাঠি,—লোকে ভাবলে হিঁদুর যমপুরী থেকে যমদূত এসে হাজির হ'লো। চিনবে কি—কোথায় পালাল তার ঠিকানা রইল না।

হীরু তার হাতখানা ধরে ফেলে বললে, বড় মিঞা, এই কাজটি আর একবার তোমাকে করতে হবে, দাদা। আমার খুড়ো তবু যা হোক দুটো ভাগের ভাগ দিতে চায়, কিন্তু খুড়ী-বেটী এমনি শয়তান যে একটা চুমকি ঘটিতে পর্যন্ত হাত দিতে দেয় না। ওই পাগড়ি, গাল-পাট্টা আর সিঁদুর মেখে লাঠি হাতে একবার গিয়ে উঠানে দাঁড়াবে, তোমাদের ডাকাতেহুমকি একবার ঝাড়বে, তারপর দেখে নেবো কিসে কি হয়। আমার যা-কিছু পাওনা ফেঁড়ে বার করে আনব। ঠিক সন্ধ্যার আগে—ব্যাস্‌!

লতিফ মিঞা রাজী হ'লো। লতিফ মামুদ দু-ভাই সাজ-পোশাক পরে আজই গিয়ে খুড়োর বাড়িতে হানা দেবে ঠিক হয়ে গেল। পিছনে থাকবে হীরু।

একাদশী, সারা দিনের পর দাওয়ায় ঠাঁই করে দিয়েছেন জগদম্বা। মুখুজ্যেমশাই বসেছেন জলযোগে। সামান্য ফলমূল ও দুধ। বেতো ধাত—একাদশীতে অন্নাহার সহ্য হয় না। পাথরের বাটিতে ডাবের জলটুকু মুখে তুলেছেন এমন সময় দরজা ঠেলে ঢুকল দু-ভাই লতিফ আর মামুদ। ইয়া পাগড়ি, ইয়া গাল-পাট্টা, হাতে ছ-হাতি লাঠি, কপাল-জোড়া সিঁদুর মাখানো। মুখুজ্যের হাত থেকে পাথরের বাটি দুম করে পড়ে গেল,—জগদম্বা চীৎকার করে উঠলেন—ওগো পাড়ার লোক, কে কোথায় আছো, এসো গো, ছেলেধরা ঢুকেছে।

সমুখের ছোট মাঠটায় ঘর কেটে ছোট ছোট ছেলের দল রোজ ফিঞে খেলে, আজও খেলছিল,—তারাও চেঁচাতে চেঁচাতে যে যেখানে পারলে, ছুট দিলে—ওগো ছেলেধরা এসেচে, অনেক ছেলে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

হীরু সঙ্গে এসেছিল বাড়ি চিনিয়ে দিতে। দোরের আড়ালে লুকিয়ে-ছিল—সে চাপা গলায় বললে,—আর দেখ কি মিঞা, পালাও। পাড়ার লোক ধরে ফেললে আর রক্ষে নেই। বলে নিজে মারলে ছুট।

লতিফ মিঞা শহরের আর কিছু না শুনে থাক ছেলেধরার জনশ্রুতি তাদের কানে এসেও পেঁচেছে। চক্ষের পলকে বুঝলে এ অজানা জায়গায় এরূপ বেশে এই সিঁদুর মাথা মুখে ধরা পড়ে গেলে দেহের একখানা হাড়ও আস্ত থাকবে না। সুতরাং তারাও মারল ছুট। কিন্তু ছুটলে হবে কি? পথ অচেনা, আলো এসেছে কমে—চতুর্দিক থেকে কেবল বহুকণ্ঠের সমবেত চীৎকার—ধরে ফ্যাল্, ধরে ফ্যাল্! মেরে ফ্যাল্! ব্যাটাদের! ছোট ভাই মামুদ কোথায় পালাল ঠিকানা নেই, কিন্তু বড় ভাই লতিফকে সবাই ঘিরে ফেললে—সে প্রাণের দায়ে কাঁটা বন ভেঙ্গে লাফিয়ে পড়ল একটা ডোবায়। তারপর সবাই পাড়ে দাঁড়িয়ে ছুঁড়তে লাগল ঢিল। যেই মাথা তোলে অমনি মাথায় পড়ে ঢিল। আবাব সে মারে ডুব। আবার উঠে, আবার মাথায় পড়ে ঢিল।

লতিফ মিঞা জল খেয়ে আর ইঁট খেয়ে আধমরা হয়ে পড়ল। সে যতই হাতজোড় করে বলতে চায় সে ছেলেধবা নয়, ছেলে ধরতে আসেনি,—ততই লোকের রাগ আর সন্দেহ বেড়ে যায়। তারা বলে নইলে ওর গাল-পাট্টা কেন? ওর পাগড়ি কিসের জন্য? ওর মুখময় এত সিঁদুর এলো কোথা থেকে? পাগড়ি তার খুলে গেছে, গাল-পাট্টা একধারে ঝুলচে—কপালের সিঁদুর জলে ধুয়ে মুখময় লেগেচে। এ-সব কথা সে পাড়ের লোকদের বলেই বা কখন আর শোনেই বা কে।

ততক্ষণে কতকগুলি উৎসাহী লোক জলে নেমে লতিফকে হিঁচড়ে টেনে তুলেছে—সে কাঁদতে কাঁদতে কেবলই জানাচ্ছে, সে লতিফ মিঞা, তার ভাই মামুদ মিঞা— তারা ছেলেধরা নয়।

এমন সময় আমি যাচ্ছিলুম সেই পথে—হাঙ্গামা শুনে নেমে এলুম পুকুর-ধারে। আমাকে দেখে উত্তেজিত জনতা আর একবার উত্তেজিত হয়ে উঠল। সবাই সমস্বরে বলতে লাগল, তারা একটা ছেলেধরা ধরেছে। লোকটার অবস্থা দেখে চোখে জল এলো, তার মুখ দিয়ে কথা বেরোবার শক্তি নেই—গাল-পাট্টায়, পাগড়িতে সিঁদুরে-রক্তে মাথামাখি—শুধু হাত-জোড় করছে আর কাঁদচে।

জিজ্ঞেসা করলুম, ও কার ছেলে চুরি করেছে? কে নালিশ করচে?

তারা বললে, তা কে জানে ?

ছেলে কৈ ?

তাই বা কে জানে ?

তবে এমন করে মারচো কেন ?

কে একজন বুদ্ধিমান বললে, ছেলে বোধ হয় ও পাঁকে পুঁতে রেখেচে। রাত্তিরে তুলে নিয়ে যাবে। বলি দিয়ে পুলের তলায় পুঁতবে।

বললুম, মরা ছেলে কখনো বলি দেওয়া যায় ?

তারা বলল, মরা হবে কেন, জ্যান্ত ছেলে।

পাঁকে পুঁতে রাখলে ছেলে জ্যান্ত থাকে কখনো ?

যুক্তিটা তখন অনেকের কাছেই সমীচীন বোধ হলো। এতক্ষণ উত্তেজনার মুখে সে কথা কেউ ভাববারই সময় পায়নি।

বললুম, ছাড় ওকে। লোকটাকে জিজ্ঞেসা করলুম—মিঞা, ব্যাপারটা সত্যি কি বল ত ?

এখন অভয় পেয়ে লোকটা কাঁদতে কাঁদতে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলে, মুখুজ্যে দম্পতির উপর কারও সহানুভূতি ছিল না, শুনে অনেকের করুণাও হলো।

বললুম, লতিফ বাড়ি যাও, আর কখনও এ-সব কাজে এসো না।

সে নাক মললে, কান মললে—খোদার কিরে নিয়ে বললে, বাবুমশায়, আর এ-সব কাজে কখনো না। কিন্তু আমার ভাই গেল কোথায় ?

বললুম, ভায়ের ভাবনা বাড়ি গিয়ে ভেবো লতিফ, এখন নিজের প্রাণটা যে বাঁচল এই ঢের।

লতিফ খোঁড়াতে খোঁড়াতে কোনমতে বাড়ি চলে গেল।

অনেক রাত্রে আর একটা প্রচণ্ড কোলাহল উঠল ঘোষালদের পাড়ায়। তাদের ঝি গোয়ালে ঢুকেছিল গরুকে জাব দিতে। খড়ের ঝুড়ি টানতে গিয়ে দেখে টানা যায় না—হঠাৎ তার মধ্যে থেকে একটা ভীষণ মূর্তি লোক বেরিয়ে ঝির পা-দুটো জড়িয়ে ধরলে।

ঝি যতই চেঁচায়, বেরোও গো, কে কোথা আছ,—ভূত আমাকে খেয়ে ফেললে। ভূত ততই তার মুখ চেপে ধরে বলে, মা গো আমাকে বাঁচাও—আমি ভূত-পেরেত নই, আমি মানুষ।

চীৎকারে বাড়ির কর্তা আলো নিয়ে লোকজন নিয়ে এসে উপস্থিত—

আগের ঘটনা গাঁয়ের সবাই শুনেছে। সুতরাং ছোট ভায়ের ভাগ্যে বড় ভাইয়ের দুর্গতি আর ঘটল না, সবাই সহজে বিশ্বাস করলে এই সেই মামুদ মিঞা। ভূত নয়।

ঘোষাল তাকে ছেড়ে দিলে—শুধু তার সেই পাকা লাঠিটি কেড়ে নিয়ে বললে, ছোট মিঞা, সমস্ত জীবন মনে থাকবে বলে এটা রেখে দিলুম। মুখের ঐ সব রং-টং ধুয়ে ফেলে এখন আস্তে আস্তে ঘরে যাও।

কৃতজ্ঞ মামুদ এক শ' সেলাম জানিয়ে ধীরে ধীরে সরে পড়ল। ঘটনাটি ছেলেভুলানো গল্প নয়, সত্যই আমাদের ওখানে ঘটেছিল।

দানের হিসাব

সুকুমার রায়

এক ছিল রাজা। রাজা জাঁকজমকে পোশাক পরিচ্ছদে লাখ লাখ টাকা ব্যয় করেন, কিন্তু দানের বেলায় তাঁর হাত খোলে না।

রাজার সভায় হোমরা-চোমরা পাত্র-মিত্র সবাই আসে, কিন্তু গরিব-দুঃখী পণ্ডিত-সজ্জন এরা কেউ আসে না। কারণ সেখানে গুণীর আদর নাই, একটি পয়সা ভিক্ষা পাবার আশা নাই!

রাজার রাজ্যে দুর্ভিক্ষ লাগল, পূর্ব সীমানার লোকেরা অনাহারে মরতে বসল। রাজার কাছে খবর এল, রাজা বললেন, "এ সমস্ত দৈবে ঘটায়, এর উপর আমার কোন হাত নেই।"

লোকেরা বলল, "রাজভাণ্ডার থেকে সাহায্য করতে হুকুম হোক, আমরা দূর থেকে চাল কিনে এনে এ-যাত্রা রক্ষা পেয়ে যাই।"

রাজা বললেন, "আজ তোমাদের দুর্ভিক্ষ, কাল শুনব আর এক জায়গায় ভূমিকম্প, পরশু শুনব অমুক লোকেরা ভারি গরিব, দুবেলা খেতে পায় না। সবাইকে সাহায্য করতে হলে রাজভাণ্ডার উজাড় করে রাজাকে ফতুর হতে হয়!"

শুনে সবাই নিরাশ হয়ে ফিরে গেল।

ওদিকে দুর্ভিক্ষ বেড়েই চলেছে। দলে দলে লোক অনাহারে মরতে লেগেছে। আবার দূত এসে রাজার কাছে হাজির। সে রাজ-সভায় হত্যা দিয়ে পড়ে বলল, "দোহাই মহারাজ, আর বেশি কিছু চাই না, দশটি হাজার টাকা দিলে লোকগুলো আধপেটা খেয়ে বাঁচে।"

রাজা বললেন, "অত কষ্ট করে বেঁচেই বা লাভ কি? আর দশটি হাজার টাকা বুঝি বড় সহজ মনে করেছ?"

দূত বলল, "দেবতার কৃপায় কত কোটি টাকা রাজভাণ্ডারে মজুত রয়েছে, যেন টাকার সমুদ্র! তার থেকে এক-আধ ঘটি তুললেই বা মহারাজের ক্ষতি কি?"

রাজা বললেন, "দেদার থাকলেই কি দেদার খরচ করতে হবে?"

দূত বলল, "প্রতিদিন আতরে, সুগন্ধে, পোশাকে, আমোদে, আর প্রাসাদের সাজসজ্জায় যে টাকা বেরিয়ে যায়, তারই খানিকটা পেলে লোক-গুলো প্রাণে বাঁচে।"

শুনে রাজা রেগে বললেন, "ভিখারি হয়ে আবার উপদেশ শোনাতে এসেছ? আমার টাকা আমি সিদ্ধ করেই খাই আর ভাজা করেই খাই, সে আমাব খুশি! তুমি বাপু আর বেশি জ্যাঠামি করলে শেষে বিপদ ঘটতে পারে। সুতরাং এই বেলা মানে মানে সরে পড়।"

দূত বেগতিক দেখে সরে পড়ল।

রাজা হেসে বললেন, "যত বড মুখ নয় তত বড় কথা! দুশ' পাঁচশ' হত, তবু না হয় বুঝতাম; দারোয়ানগুলোর খোরাক থেকে দু চারদিন কিছু কেটে রাখলেই টাকাটা উঠে যেত। কিন্তু তাতে ত' ওদের পেট ভরবে না, একেবারে দশ হাজার টাকা হেঁকে বসল! ছোটলোকের একশেষ!"

শুনে পাত্রমিত্র সবাই মুখে 'হুঁ-হুঁ' করল, কিন্তু মনে মনে সবাই বলল —"ছি ছি, কাজটা অতি খারাপ হল!"

দিন দুই বাদে কোথা থেকে বুড়ো সন্ন্যাসী এসে রাজসভায় হাজির; সন্ন্যাসী এসেই রাজাকে আশীর্বাদ করে বললেন, "দাতাকর্ণ মহারাজ! ফকিরের ভিক্ষা পূর্ণ করতে হবে!"

রাজা বললেন, "ভিক্ষার বহরটা আগে শুনি। কিছু কমসম করে বললে হয়ত বা পেতেও পারেন।"

সন্ন্যাসী বললেন, "আমি ফকির মানুষ, আমার বেশি দিয়ে দরকার কি? আমি অতি যৎকিঞ্চিৎ সামান্য ভিক্ষা রাজভাণ্ডারে একটি মাস ধরে প্রতিদিন পেতে চাই। আমার ভিক্ষা নেবার নিয়ম এই—প্রথম দিন যা নিই, দ্বিতীয় দিন তার দ্বিগুণ, তৃতীয় দিনে তার দ্বিগুণ, আবার চতুর্থ দিনে তৃতীয় দিনের দ্বিগুণ। এমনি করে প্রতিদিন দ্বিগুণ করে নিই, এই আমার ভিক্ষার রীতি।"

রাজা বললেন, "তা ত' বুঝলাম। কিন্তু প্রথম দিন কত চান সেটাই হল আসল কথা। দু' চার টাকায় পেট ভরে ত' ভাল কথা, নইলে একবারে বিশ পঞ্চাশ হেঁকে বসলে সে যে অনেক টাকায় গিয়ে পড়তে হবে!"

সন্ন্যাসী একগাল হেসে বললেন, "মহারাজ, ফকিরের কি লোভ থাকে? আমি বিশ পঞ্চাশও চাইনে, দু'চার টাকাও চাইনে। আজ আমার একটি পয়সা দিন, তারপর উনত্রিশ দিন দ্বিগুণ করে দেবার হুকুম দিন।"

শুনে রাজা মন্ত্রী পাত্রমিত্র সবাই প্রকাণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। অমনি চটপট হুকুম হয়ে গেল, সন্ন্যাসী ঠাকুরের হিসাব মত রাজভাণ্ডার থেকে এক মাস তাঁকে ভিক্ষা দেওয়া হোক। সন্ন্যাসী ঠাকুর মহারাজের জয়-জয়কার করে বাড়ি ফিরলেন।

রাজার হুকুমমত রাজ-ভাণ্ডারী প্রতিদিন হিসাব করে সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দেয়। এমনি করে দুদিন যায়, দশদিন যায়। দু'সপ্তাহ ভিক্ষা দেবার পর ভাণ্ডারী হিসাব করে দেখল ভিক্ষাতে অনেক টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে। দেখে তার মন খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল। রাজামশাই ত' কখনো এত টাকা দান করেন না! সে গিয়ে মন্ত্রীকে খবর দিল।

মন্ত্রী বললেন, "তাইতো হে, এটা তো আগে খেয়াল হয় নি। তা এখন তো আর উপায় নাই, মহারাজের হুকুম নড়চড় হতে পারে না!"

তারপর আবার কয়েকদিন গেল! ভাণ্ডারী আবার মহাব্যস্ত হয়ে মন্ত্রীর কাছে হিসাব শোনাতে চলল। হিসাব শুনে মন্ত্রীমশায়ের মুখের তালু শুকিয়ে গেল।

তিনি ঘাম মুছে, মাথা চুলকিয়ে, দাড়ি হাতড়িয়ে বললেন, "বল কি হে। এখন এত? তাহলে মাসের শেষে কত দাঁড়াবে?"

ভাণ্ডারী বলল, "আজ্ঞে তা তো হিসাব করা হয় নি।"

মন্ত্রী বললেন, "দৌড়ে যাও এখনি খাজাঞ্চিকে দিয়ে একটা পুরো হিসাব করিয়ে আন।"

ভাণ্ডারী হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে চলল; মন্ত্রীমশাই মাথায় বরফ জলের পট্টি দিয়ে ঘন ঘন হাওয়া খেতে লাগলেন।

আধঘণ্টা যেতে না যেতেই ভাণ্ডারী কাঁপতে কাঁপতে হিসাব নিয়ে এসে হাজির।

মন্ত্রী বললেন, "সবশুদ্ধ কত হয়?"

ভাণ্ডারী হাত জোর করে বলল, "আজ্ঞে, এক কোটি সাতষট্টি লক্ষ সাতাত্তর হাজার দুশো পনের টাকা পনের আনা তিন পয়সা।" মন্ত্রী চটে গিয়ে বললেন, "তামাসা করছ নাকি?" ভাণ্ডারী বলল, "আজ্ঞে তামাসা করব কেন? আপনিই হিসাব দেখে নিন।"

১ম দিন — ১ এক পয়সা
২য় দিন — ২ পয়সা
৩য় দিন — ১ আনা
৪র্থ দিন — ২ আনা
৫ম দিন — ৪ আনা
৬ষ্ঠ দিন — ৮ আনা
৭ম দিন — ১ টাকা
৮ম দিন ২ ,,
৯ম দিন — ৪ ,,
১০ম দিন — ৮ ,,
১১শ দিন — ১৬ ,,
১২শ দিন — ৩২ ,,
১৩শ দিন — ৬৪ ,,
১৪শ দিন — ১২৮ ,,
১৫শ দিন — ২৫৬ ,,
১৬শ দিন — ৫১২ ,,
১৭শ দিন ১০২৪ ,,
১৮শ দিন — ২০৪৮ ,,
১৯শ দিন — ৪৯৮৬ ,,
২০শ দিন — ৮১৯২ ,,
২১শ দিন — ৩৬,৩৮৪ ,,
২২শ দিন — ৩২,৭৬৮ ,,
২৩শ দিন — ৬৫,৫৩৬ ,,
২৪শ দিন — ১৩১০৭২ ,,
২৫শ দিন — ২৬২১৪৪ ,,
২৬শ দিন ৫২৪২৮৮ ,,
২৭শ দিন — ১০৪৮৫৭৬ ,,
২৮শ দিন — ২০৯৭১৫২ ,,
২৯শ দিন — ৪১৯৪৩০৪ ,,
৩০শ দিন — ৮৩৮৮৬০৮ ,,

মোট — ১,৬৭,৭৭,২১৫ টাকা ১৫ আনা ৩ পয়সা

এই বলে সে হিসাবের কাগজখানা মন্ত্রীর হাতে দিল। মন্ত্রীমশাই হিসাব পড়ে চোখ উলটিয়ে মূর্ছা যান আর কি! সবাই ধরাধরি করে অনেক কষ্টে তাঁকে রাজার কাছে নিয়ে হাজির করল।

রাজা বললেন, "ব্যাপার কি?" মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ, রাজকোষের প্রায় দু' কোটি টাকা লোকসান হতে যাচ্ছে!" রাজা বললেন, "সে কি রকম?" মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ, সন্ন্যাসী ঠাকুর রাজভাণ্ডারের প্রায় দু কোটি টাকা বের করে নেবার ফিকির করেছে।"

রাজা বললেন, "এত টাকা দেবার তো হুকুম হয় নি! তবে এ রকম বে-হুকুম কাজ করছে কেন? বোলাও ভাণ্ডারীকে।"

মন্ত্রী বললেন, "আজ্ঞে, সমস্তই হুকুমমত হয়েছে। এই দেখুন না দানের হিসাব।"

রাজামশাই একবার দেখলেন, দুবার দেখলেন, তারপর ধড়্‌ফড়্‌ করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন! তারপর অনেক কষ্টে তাঁর জ্ঞান হলে পরে লোকজন ছুটে গিয়ে সন্ন্যাসী ঠাকুরকে ডেকে আনল।

ঠাকুর আসতেই রাজামশাই কেঁদে তাঁর পায়ে পড়লেন। বললেন, "দোহাই ঠাকুর, আমায় ধনে-প্রাণে মারবেন না। যা হয় একটা রফা করে আমার কথা আমায় ফিরিয়ে নিতে দিন।"

সন্ন্যাসী ঠাকুর গম্ভীর হয়ে বললেন, "রাজ্যের লোক দুর্ভিক্ষে মরে, তাদের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা চাই। সেই টাকা নগদ হাতে হাতে পেলে আমার ভিক্ষা পূর্ণ হয়েছে মনে করব।"

রাজা বললেন, "সেদিন একজন এসেছিল, সে বলেছিল দশ হাজার টাকা হলেই চলবে।"

সন্ন্যাসী বললেন, "আজ আমি বলছি পঞ্চাশ হাজারের এক পয়সা কম হলেও চলবে না।"

রাজা কাঁদলেন, মন্ত্রী কাঁদলেন, উজির-নাজির সবাই কাঁদল। চোখের জলে ঘর ভেসে গেল, কিন্তু ঠাকুরের কথা যেমন ছিল তেমনি রইল। শেষে অগত্যা রাজভান্ডার থেকে পঞ্চাশটি হাজার টাকা গুণে ঠাকুরের সঙ্গে দিয়ে রাজা মহাশয় নিষ্কৃতি পেলেন।

দেশময় রটে গেল, দুর্ভিক্ষে রাজকোষ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করা হয়েছে। সবাই বলল, "দাতাকর্ণ মহারাজ।"

গ্রামের পাঠশালা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রামের প্রসন্ন গুরুমহাশয় বাড়িতে একখানি মুদির দোকান করিতেন, ঐ দোকানের পাশে তাঁহার পাঠশালা ছিল। বেত ছাড়া পাঠশালায় শিক্ষাদানের বিশেষ উপকরণ-বাহুল্য ছিল না। পৌষ মাসের দিন। অপু সকালে লেপ-মুড়ি দিয়া রৌদ্র উঠিবার অপেক্ষায় বিছানায় শুইয়া ছিল। মা আসিয়া ডাকিল—"অপু, ওঠ শিগ্গির ক'রে, আজ তুমি যে পাঠশালায় যাবে।"

পাঠশালার নাম শুনিয়া অপু সদ্যনিদ্রোত্থিত চোখ দুটি তুলিয়া অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিলা রহিল। তাহার ধারণা ছিল যে যাহারা দুষ্ট ছেলে, মায়ের কথা শোনে না, ভাইবোনেদের সঙ্গে মারামারি করে, তাহাদেরই শুধু পাঠশালায় পাঠানো হইয়া থাকে। কিন্তু সে তো কোনদিন ওরূপ করে না তবে কেন সে পাঠশালায় যাইবে? মায়ের কথার উত্তরে সে অবিশ্বাসের সুরে বলিল—"ইঃ!" উঠিবার কোন লক্ষণ দেখাইল না। কিন্তু শেষে বাবা আসিয়া পড়াতে অপুর বেশী জারিজুরি খাটিল না, যাইতে হইল। মায়ের প্রতি অভিমানে তাহার চোখে জল আসিতেছিল।

অপুকে পাঠশালায় পৌঁছাইয়া দিয়া হরিহর বলিল—"ছুটি হবার সময় আমি আবার এসে তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাবো। অপু, ব'সে ব'সে লেখো, গুরুমহাশয়ের কথা শুনো, দুষ্টুমি ক'রো না যেন।" খানিকটা পরে পিছন ফিরে অপু চাহিয়া দেখিল, বাবা ক্রমে পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল। অকুল সমুদ্র! সে অনেকক্ষণ মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। পরে ভয়ে ভয়ে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল গুরুমহাশয় দোকানের মাচায় বসিয়া দাঁড়িপাল্লায় সৈন্ধব লবণ ওজন করিয়া কাহাকে দিতেছেন।

কয়েকটি বড়বড় ছেলে আপন আপন চাটাইয়ে বসিয়া নানারূপ কুস্বর করিয়া পড়িতেছে ও ভয়ানক দুলিতেছে। তাহার অপেক্ষা আর একটু

ছোট একটি ছেলে খুঁটিতে ঠেস দিয়া আপন মনে পাততাড়ির তালপাতা মুখে পুরিয়া চিবাইতেছে।
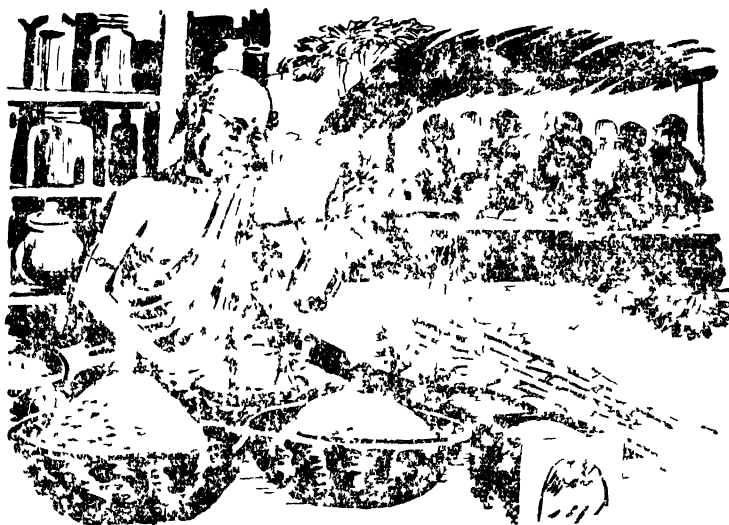
পাঠশালা বসিত বিকালে। সবসুদ্ধ আট-দশটি ছেলেমেয়ে পড়িতে আসে। সকলেই বাড়ি হইতে ছোট ছোট মাদুর আনিয়া পাতিয়া বসে। অপুর মাদুর নাই, সে বাড়ি হইতে একখানি জীর্ণ কার্পেটের আসন আনিয়াছে। যে ঘরটায় পাঠশালা হয়, তাহার কোন দিকে বেড়া বা দেওয়াল কিছু নাই; চারিধারে খোলা, ঘরের মধ্যে সারি দিয়া ছাত্রগণ বসে। পাঠশালা-ঘরের চারিদিকে বন, পিছন দিকে গুরুমহাশয়ের বাগান। অপরাহ্নের তাজা গরম রৌদ্র, বাতাবিলেবু, গাব ও পেয়ারাফুলি আম-গাছটার ফাঁক দিয়া পাঠশালা ঘরের বাঁশের খুঁটির গায়ে আসিয়া পড়িয়াছে। নিকটে অন্য বাড়ী নাই, শুধু বন ও বাগান, এ ধারে একটা সরু পথ।

আট দশটি ছেলেমেয়ের মধ্যে সকলেই বেজায় দুলিয়া ও নানারূপ সুর করিয়া পড়া মুখস্থ করে, মাঝে মাঝে গুরুমহাশয়ের গলা শোনা যায়। গুরুমহাশয় একটি খুঁটি হেলান দিয়া একখানা তালপাতার চাটাইয়ের উপর বসিয়া থাকেন। মাথার ও গায়ের তেলে বাঁশের খুঁটির হেলান দেওয়া অংশটা পাকিয়া গিয়াছে। বিকালবেলা প্রায়ই গ্রামের দীনু পালিত কি রাজু রায় তাঁহার সহিত গল্প করিতে আসেন। পড়াশুনার চেয়ে এই গল্প-শোনা অপুর অনেক বেশী ভাল লাগিত। রাজু রায় মহাশয়

"বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস" স্মরণ করিয়া কি করিয়া আষাঢ়ুর হাটে তামাকের দোকান করিয়াছিলেন, সেই গল্প করিতেন। অপু অবাক হইয়া শুনিত— বেশ কেমন নিজের ছোট দোকানের ঝাঁপটা তুলিয়া দিয়া দা দিয়া তামাক কাটা, তারপর রাত্রে নদীতে যাওয়া, ছোট হাঁড়িতে মাছের ঝোল-ভাত রাঁধিয়া খাওয়া, মাঝে মাঝে মাটির প্রদীপের সামনে মহাভারত খুলিয়া বসিয়া বসিয়া পড়া। বাহিরের অন্ধকারে বর্ষারাতে টিপ্‌টিপ্‌ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, কেহ কোথাও নাই, পিছনের ডোবায় ব্যাঙ ডাকিতেছে— কি সুন্দর! বড় হইলে সে তামাকের দোকান করিবে। গল্প বলিতে বলিতে বেলা যাইত, পাঠশালার চারিপার্শ্বের বন জঙ্গলে অপরাহ্নের রাঙা রৌদ্র বাঁকাভাবে আসিয়া পড়িত।

সেই গ্রামের ছায়া-ভরা মাটির পথে এক একটি মুগ্ধ গ্রাম্য বালকের ছবি আছে। বইদপ্তর বগলে লইয়া সে তাহার দিদির পিছনে সাজিমাটি দিয়া কাচা, সেলাই করা কাপড পরিয়া পাঠশালা হইতে ফিরিতেছে, তাহার ছোট মাথাটির অমন রেশমের মত নরম, চিক্কণ, সুখস্পর্শ চুলগুলি তাহার মা যত্ন করিয়া আঁচড়াইয়া দিয়াছে—তাহার ডাগর ডাগর সুন্দর চোখ দুটিতে কেমন যেন অবাক ধরনের চাহনি—যেন তাহারা এ কোন অদ্ভুত জগতে নতুন চোখ মেলিয়া দিশাহারা হইয়া উঠিয়াছে।

একদিন বিকালে পাঠশালায় অন্য কেহ উপস্থিত না থাকায় কোন গল্প-গুজব হইল না, পড়াশুনা হইতেছিল—এমন সময় গুরুমহাশয় বলিলেন —'দেখি, সেলেট নাও, শ্রুতিলিখন লেখো।'

মুখে মুখে বলিয়া গেলেও অপু বুঝিয়াছিল, গুরুমহাশয় নিজের কথা বলিতেছেন না, মুখস্থ বলিতেছেন, সে যেমন দাশুরায়ের পাঁচালীর ছড়া মুখস্থ বলে তেমনি। শুনিতে শুনিতে তাহার মনে হইল, অনেক-গুলো অমন সুন্দর কথা একসঙ্গে পর পর সে কখনো শোনে নাই, ও সকল কথার অর্থ সে জানে না, কিন্তু এই অপরিচিত শব্দ-সঙ্গীত তাহার শিশুকর্ণে অপূর্ব ঠেকিল।

বড় হইয়া ইস্কুলে পড়িবায় সময় সে বাহির করিয়াছিল, ছেলেবেলায় এই মুখস্থ শ্রুতিলিখন কোথায় আছে।—

"এই সেই জনস্থান-মধ্যবর্তী প্রস্রবণ-গিরি; ইহার শিখরদেশ আকাশ পথে সতত-সঞ্চরামান জলধর-পটল-সংযোগে, নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকা-প্রদেশে ঘন-সন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে সমাচ্ছন্ন

থাকাতে, স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়....।"

সে ঠিক বলিতে পারে না, বুঝাতেই পারে না, কিন্তু সে জানে—তাহার মনে হয় অনেক সময়ই মনে হয়। সেই যে বছর দুই আগে কুঠির মাঠে সরস্বতী পূজার দিন নীলকণ্ঠ পাখী দেখিতে গিয়াছিল, সেদিন সে মাঠের ধার বাহিয়া একটি পথকে দূরে কোথায় যাইতে দেখিয়াছিল। পথটার দুইধারে কত যে অচেনা পাখি, অচেনা গাছপালা—অনেকক্ষণ সেদিন সে পথটার দিকে চাহিয়াছিল। মাঠের ওদিকে পথটা কোথায় যে চলিয়া গিয়াছে, তাহা ভাবিয়া কুল পায় নাই।

তাহার বাবা বলিয়াছিল—"ও সোনাডাঙ্গা মাঠের রাস্তা, মাধবপুর, দশঘরা হ'য়ে সেই ধলচিতের খেয়াঘাটে গিয়ে মিশেছে।"

অপু জানিত ও পথটা আরও অনেক দূরে গিয়াছে। রামায়ণ, মহাভারতের দেশে।

শ্রুতিলিখন শুনিতে শুনিতে সেই দুই বছর আগে পথটার কথা অপুর মনে হইয়া গেল।

ঐ পথের ওধারে অনেকদূরে কোথায় সেই জনস্থান-মধ্যবর্তী প্রস্রবণ-পর্বত! কত দূরে সে প্রস্রবণ-গিরির উন্নত শিখর, আকাশপথের সতত-সঞ্চরমান মেঘলায় যাহার প্রশান্ত নীল সৌন্দর্য অবৃত থাকে?

সে বড় হইলে যাইয়া দেখিবে।

দ্বিতীয় পর্ব

শাস্তি

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

বড়মামা সবে ঘুম থেকে উঠেছেন। রোজ ভোর চারটের সময় ওঠেন। আজ পনেরো মিনিট দেরি হয়ে গেছে। আমি আমার জায়গায় শুয়ে লক্ষ রাখছি। মশারির ভেতর গ্যাঁট হয়ে বসে বালিশের তলা থেকে সোনার হাতঘড়িটা বের করে পেনসিল টর্চের আলোয় সময় দেখলেন। মুখে একটা চুকচুক শব্দ হল। ঘড়িটা বালিশের তলায় রাখতে রাখতে নিজের

মনেই বললেন, 'কেন এমন হল! নিজের ঘড়ি লেট হল কেন? কেন স্লো যাচ্ছে! অয়েলিং করতে হবে।'

বড়মামা বলেন, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই একটা ঘড়ি আছে। নিয়মে বেঁধে ফেলতে পারলে সময়ের এতটুকু নড়চড় হবার উপায় নেই। চারটে তো ঠিক চারটের সময়েই ঘুম ভাঙবে। দশটা তো ঠিক দশটার সময়েই ঘনঘন হাই উঠে জানিয়ে দেবে রাত দশটা বাজল। ঘুমোতে যাবার সময় হল। এই রকম আর কি। ঘড়ি না থাকলেও নিজের ঘড়ি জানিয়ে দেবে সময়।

বড়মামা নিজের মনেই বলে উঠলেন, 'সুধাংশু, সাজা পেতে হবে। সময়ের খেলাপ হয়েছে ; কোনও ক্ষমা নেই।' নিজের দু'গালে চটাস চটাস করে চার-ছ বার চড় মারলেন। মেরে বললেন, 'তেমন জুতসই হল না। নিজের গাল তো। পক্ষপাতিত্ব হয়ে গেল। কাউকে দিয়ে মারাতে হবে।"

মশারি তুলে নেমে এলেন বিছানা থেকে। আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, "এটারও খুব ঘুম বেড়েছে।" মশারির মাথার দিকে এসে কপালে হাত রাখলেন। "বুড়ো, বুড়ো, গেট আপ।"

আমি তো জেগেই ছিলুম। তড়াক করে উঠে বসলুম।

বড়মামা এক ধমক লাগালেন, "কতদিন বলেছি, ওইভাবে আচমকা উঠবি না। ঘাড়ে খ্যাঁচকা লেগে যাবে। যাক, যা হবার তা হয়েছে, ভবিষ্যতে সাবধান।" তারপর গলার সুরটা অন্যরকম করে বললেন, "তুই আমার একটা উপকার করবি ?"

"বলো।"

"তুই আমার দু'গালে সপাটে গোটাকতক চড় হাঁকড়াবি।"

"সে আবার কি ? এখনও ভাল করে ভোরের আলো ফোটেনি। তোমার মুখে এ কী কথা। গুরুজনের গালে চড় মারতে আছে ?"

"শোন্ শোন্, এ-চড় সে-চড় নয়। তুই আমার হয়েই আমাকে মারবি। এমন মারবি যেন পাঁচ আঙুলের দাগ বসে যায়।"

"একসকিউজ মি।"

"এই সামান্য উপকারটা করতে পারবি না ?"

"আ্যা'ম সরি।"

"তুই একটা স্বার্থপর, আত্মপর, পরশ্রীকাতর, সেলফিশ জায়েণ্ট।"

"হ্যাঁ তাই। বড়মামার গালে সাতসকালে চড়। পৃথিবীতে কেউ কোনওদিন শুনেছে।"

"বেশ, আমি এই দেওয়াল থেকে ওই দেওয়াল, ষোলো ফুট তো হবেই। এই ষোলো ফুট আমি নাকখত্তর দোব। তুই মলমটা রেডি রাখ।"

"কী হয়েছে বলো তো ?"

"সিনস নাইনটিন থার্টিফোর, আমি ভোর চারটের সময় উঠি। আজ পনেরো মিনিট লেট। হোয়াই লেট। হোয়াট ফর লেট। কেন এই আলস্য। আমার তমোগুণ বাড়ছে। চড়িয়ে ব্যাটাকে তাড়াতে হবে। তিন জোড়া চড় কষিয়েছি। তেমন সুবিধে হল না। নিজের গাল তো।

দুই-দুই হয়ে গেল। তা তোকে বললুম। তুই তো জীবনে কারও উপকার করতে শিখলি না।"

"তুমি অন্য উপকার বলো, আমি করে দোব। আচ্ছা, আমার কথা থাক, তুমি মাসিমা, মেজোমামাকে জিজ্ঞেস করে দেখো মামার গালে ভাগনে কখনও চড় মারতে পারে?"

"আহা, এটা তো ভাগনের চড় নয়, মামারই চড়।"

"সাতসকালে আমার বাবা এই ক্যাচোরম্যাচোর আর ভাল্লাগে না। একদিন পনেরো মিনিট দেরিতে উঠেছি তো কী হয়েছে শুনি।"

"কেন উঠব। সিক্স নাইনটিন থার্টিফোর, আমি চারটের সময়… আমার ঘড়ি স্লো হয়ে গেছে।"

"ফাস্ট করে দাও।"

"সে ঘড়ি আমার ভেতরের ঘড়ি।"

"দম দেওয়া, না কোয়ার্জ-ব্যাটারি?"

"আগে ভাবতুম দম, এখন মনে হচ্ছে ব্যাটারি।"

"তা হলে ব্যাটারি পাল্টাও।"

মেজোমামা পাশ দিয়ে যেতে যেতে থেমে পড়লেন, তারপর সুর করে গেয়ে উঠলেন, "পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল…।"

বড়মামা বললেন, "অ্যায়, শুরু হল। সব ব্যাপারে নাক গলানো চাই। ওর বকে বকে নাকটা তো নাকুমামার মতো হয়েছে। মেজোমামা না বলে নাকুমামা বলবি।"

"বড়দা। নিজের নাক ভোঁতা বলে খাড়া নাকের সমালোচনা কোরো না। আমার এই নাক হল সেন্ট পারসেন্ট আর্য নাক। এইরকম নাক তুমি ইউরোপ-টিউরোপে পাবে।"

"হাঁ, হ্যাঁ, তোমার বিলিতি নাক নিয়ে তোমার নিজের কাজে যাও। আমরা এখন একটু ব্যস্ত আছি।"

"কী একটা ব্যাটারি-ব্যাটারি কানে এল। তোমার সেই লঝ্ঝড়ে গাড়ির ব্যাটারি! ও তোমার জীবনে ঠিক হবে না। মোটর গাড়ি বলে তোমাকে গছিয়েছে আসলে ওটা ঠেলাগাড়ি। আগের জন্মে বিশ-বাইশ হাজার টাকা ধার ছিল, এ-জন্মে সেটা শোধ হল আর কি।"

বড়মামা আমাকে বললেন, "শিগগির তুলো নিয়ে আয়, ভুলো।"

মেজোমামা বললেন, "কেন, কেটেকুটে গেল নাকি?"

আমিও ঠিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলুম, "তুলো কী হবে বড়মামা ?"

"কানে গুঁজব। বুঝতে পারছিস না, সাতসকালেই ও ঝগড়ার তাল খুঁজছে। কাল রাতে বিরিয়ানি খেয়েছে তো, হজম হয়নি।"

মেজোমামা, অমনি গান ধরলেন, "বকো আর ঝকো আমি কানে দিয়েছি তুলো / মারো আর ধরো আমি পিঠে বেঁধেছি কুলো।"

হঠাৎ মাসিমা একতলার উঠোন থেকে চিৎকার করলেন, "বড়দা, তোমার সাইকেল ? সাইকেলটা কোথায় গেল ?

বড়মামা বললেন, "সাইকেল সাইকেলের জায়গায়।"

"আজ্ঞে না, সেখানে নেই বলেই তো চ্যাঁচাচ্ছি।"

"অ্যাঁ, সে কী! তাহলে রাত্তিরে কেউ নিয়ে গেল না তো! দ্যাখ দ্যাখ, আর কী কী চুরি হল। আর কিছু চুরি হয়নি, সাইকেলটাই শুধু গেছে ?"

মেজোমামা বললেন, "আমার নতুন জুতোজোড়া ! জুতোটা আছে তো রে কুসি, না জুতো পরে সাইকেল চেপে চলে গেল ?"

বড়মামা কপালে দু'বার টুসকি মেরে তীব্রবেগে নীচের দিকে ছুটলেন। আমি আর মেজোমামাও দৌড়লুম পেছন-পেছন। মেজোমামা সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললেন, "আস্তে বড়দা আস্তে। যা যাবার তা গেছে। তুমি আর পড়ে-ঝড়ে হাত-পা ভেঙো না।"

বড়মামা তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে সোজা সদরের দিকে ছুটলেন। আমি আর মেজোমামা পেছন-পেছন। মাসীমা বললেন, "কী হল ? সাইকেলের শোকে সন্ন্যাস নেবে নাকি।"

আমরাও ব্যাপারটা বুঝছি না। বড়মামা সোজা বাগানে। বাগান পেরিয়ে পথে। পিচের রাস্তার এক মাথা চলে গেছে গঙ্গার দিকে। বড়মামা সেই দিকেই প্রায় দৌড়ে দৌড়েই চললেন। একটু তফাতে থেকে আমি চিৎকার ছাড়লুম, "বড়মামা, আপনার পায়ে কিন্তু ঘরে পরার চটি। মাসিমা দেখলে খুব রেগে যাবেন কিন্তু। কাজটা কিন্তু ভাল হচ্ছে না।"

মেজোমামা বললেন, "কী কিন্তু-কিন্তু করছিস ? ভাষায় কিন্তুর ব্যবহার কমা।"

"এ তো কথ্যভাষা।"

"যখন লিখবি, কিন্তু আর এবং একদম কমিয়ে দিবি। কেমন ? মনে থাকবে তো ?"

মেজোমামা অধ্যাপক তো, তাই সব সময় শেখাবার চেষ্টা। এই অবস্থায় কি কিছু শেখা যায় ! বড়মামা আমাদের আগে-আগে প্রায় ছুটছেন। বোঝাই যাচ্ছে না ব্যাপারটা কী। কিছু বলছেনও না। চলেছেন আবার গঙ্গার দিকে।

গঙ্গার ধারে ভুতো মল্লিকের বিখ্যাত সন্দেশের দোকান। এত বিখ্যাত যে দেশ বিদেশ থেকে ভক্তরা ছুটে আসেন। কাঁচাগোল্লা, বাতাবি, গোলাপী সেসব যেমন নাম, তেমনই তার টেস্ট। বড়মামা সেই মিষ্টির দোকানের দিকে এগিয়ে চললেন।

মেজোমামা বললেন, "দেখেছিস। বোধহয় স্বপ্নের মা-কালী এসে বলেছেন, সুধাংশু মুকুজ্যে, তুমি কাল সকলেই নিদ্রাভঙ্গের পর তোমার প্রাণের ভাই আর ভাগনেকে একতাল করে টাটকা নরমপাক কাঁচাগোল্লা খাওয়াবে। তাই একেবারে পড়ি কি মরি ছুটে এসেছে। নাও। গেট রেডি। হাত পরিষ্কার আছে তো।"

আমরা বড়মামার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। শুনলুম, বড়মামা ভুতো-বাবুকে তড়বড় করে জিজ্ঞেস করছেন, "ভুতো, আমার সাইকেল ?"

ভুতোবাবু নিজে হাতে সন্দেশ মাখেন। কালো কাঠের বারকোশে অল্প-অল্প ডাবের জল মিশিয়ে ভুতোবাবু সন্দেশ ডলছিলেন। এই পাকের সন্দেশ সুবিখ্যাত—নাম 'পলাশির যুদ্ধ'। ভুতোবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন, "আপনার সাইকেল ?"

"হ্যাঁ, আমার সাইকেল। কাল রাতে তোমার এই দোকানের পাশটায় হেলান দিয়ে রেখেছিলুম।"

"সে কী ? ওখানে কেন রাখলেন ?"

"বাঃ, কোথায় তা হলে রাখব ? তোমার দোকান থেকে সন্দেশ কিনলুম। তোমার মনে পড়ছে না ?"

"কেন পড়বে না। আধ কেজি 'আবার খাব' কিনলেন। আপনি আমার কত বড় খদ্দের।"

"অ, তা তুমি আমাকে দেখলে, আবার খাব দেখলে, আর আমার সাইকেলটা দেখলে না। এখন বলছ বড় খদ্দের।"

"সন্দেশ কেনার পর আপনি কী করলেন ?"

“কী আবার করব, খেতে-খেতে, আপনমনে খেতে-খেতে পায়ে পায়ে হেঁটে হেঁটে বাড়ি চলে গেলুম।”

“আর সাইকেল ?”

“সাইকেল তোমার এই দেওয়ালে ঠেসান দেওয়া ছিল।”

“আপনি আমাকে একবারও বলেছিলেন ?”

“বলব কী করে ? আমার কি খেয়াল ছিল ! [illegible]।”

“আপনি সাইকেলটা খোলা বাইরে রেখে হেঁটে হেঁটে সন্দেশ খেতে-খেতে বাড়ি চলে গেলেন। আশ্চর্য আপনি ? সাইকেল কি ছাতা ?”

হইহই পড়ে গেল। ভুতোবাবু নেমে এলেন। কর্মচারীরা সব বেরিয়ে এল। সকলেই যে দেওয়ালে সাইকেলটা হেলান দেওয়া ছিল, সেই দেওয়ালটা গভীর মনোযোগে দেখতে লাগলেন।

মেজোমামা বললেন, “কী বুঝছ ভাগনে ? সবাই দেওয়ালে সাইকেলের ছাপ খুঁজছে।”

দোকানের সকলেই বললেন, “নাঃ, সাইকেলটা গেছে।”

বড়মামা বললেন, “সেটা আপনারা এখন বুঝলেন, আমি বুঝেছি এক-ঘণ্টা আগে।”

বড়মামা আবার হনহন করে হাঁটতে লাগলেন। আমাদের সঙ্গে একটাও কথা নেই। এবার চলেছেন উলটো দিকে, বাজারের দিকে। বড়মামা সোজা থানায় গিয়ে ঢুকলেন। ও সি. বড়মামার বন্ধু। সব শুনে বললেন, “ডাক্তার, একে তো চুরি বলা যাবে না, এ তো তুমি সাইকেলটা জনসাধারণকে দানই করে দিয়েছ ! আমি কাকে ধরব ! ধরতে হলে ভুতো মল্লিককে ধরে এনে বেধড়ক পেটাতে হয় ! সেটা কি ঠিক হবে ! লোকটার অত নাম ! বিখ্যাত সাপ্তাহিকে ওর নামে লেখা বেরিয়েছে।”

ফিরে এসে বড়মামা আর বাড়ি ঢুকলেন না। বাগানের জামরুল গাছের তলায় বসলেন। মাসিমাও এসেছেন। জিজ্ঞেস করলেন, “কেসটা কী ?”

মেজোমামা বললেন, “বড়দা, আধসের সন্দেশ তুমি কিনলে ?”

বড়মামা গম্ভীর মুখে বললেন, “হ্যাঁ, কিনলুম।”

মাসিমা বললেন, “আমি জানতে চাই সাইকেলটা কোথায় ?”

মেজোমামা বললেন, “আধসের ‘আবার খাব’ তুমি একা-একা খেলে ? তাও রাস্তায় ! আমাদের কথা তোমার একবারও মনে পড়ল না ?”

মাসিমা বললেন, “সন্দেশ পরে হবে, আমি জানতে চাই নতুন সাইকেলটা

গেল কোথায় ?"

বড়মামা বললেন, "নীচের দিকে তো কারও নজর নেই. দরজা খোলা হাওদা পড়ে থাকে, কে কখন নিয়ে সটকেছে।"

বড়মামা মিথ্যে বলছেন। আমি 'ই" করে শব্দ করে ফেললুম। মেজো-মামা বললেন, "ছি ছি, এত বড় ডাক্তার, ছোট বোনের ভয়ে ডাহা মিথ্যে কথা বলছে ! আসল ঘটনা····।"

মেজোমামা সব একটু-একটু করে বললেন। সন্দেশ কেনা, একা-একা রাস্তায় খেতে-খেতে, সাইকেল ভুলে চলে আসা।

মাসিমা বললেন, "তোমরা শুনে রাখো, এই মাননীয় ভদ্রলোক অপরাধী ! প্রথম অপরাধ. লোভী। লোভে পাপ. পাপে মৃত্যু। দ্বিতীয় অপরাধ, অসভ্যতা। অসভ্যের মতো, রাস্তায় হালুম-হালুম করে সন্দেশ খেয়েছে।"

বড়মামা বললেন, "আলুর দম, কি ঘুগনি, কি ফুচকা খাইনি।"

মাসিমা একধমক লাগালেন, "চুপ ! তুমি কথা বলার অধিকার হারিয়েছ।"

মেজোমামা বললেন, "হ্যাঁ, চুপ ! একটাও কথা···· !"

মাসিমা বললেন, "আমি বিচার করছি, তোমাকে আর পাকামো করতে হবে না। বড়দা, তোমার তৃতীয় অপরাধ, তুমি মিথ্যাবাদী। তোমার চতুর্থ অপরাধ. দিন দিন তুমি বেহেড হয়ে যাচ্ছ। তোমাকে আমরা বয়কট করলাম।"

মাসিমা আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "চলে এসো তোমরা। এর সঙ্গে মিশলে খারাপ হয়ে যাবে।"

দোতলার বারান্দা থেকে দেখছি, বড়মামা সারা বাগানে গোল হয়ে ছুটছেন। ছুটছেন আর ছুটছেন। ঘেমে গেছেন। হাঁপাচ্ছেন। তবু ছুটছেন। আমার পাশে বারান্দায় দু'পা তুলে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে বড়-মামার পেয়ারের কুকুর লাকি। বড়মামার কাছে যেতে পারছে না বলে কুঁকুঁ করছে।

চিৎকার করে বললুম, "তুমি অত ছুটছ কেন ?"

হাঁপাতে-হাঁপাতে বললেন, "নিজেকেই নিজে শাস্তি দিচ্ছি।"

"কখন থামবে ?"

"যতক্ষণ না সব পাপ ঘাম হয়ে ঝরে যাচ্ছে।"

বটুক দাদার পাখি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আমাদের বটুকদাদা পাখিদের দিয়ে কথা বলাতে পারতেন।

পাখিরা যে সত্যি মানুষের মতন কথা বলতে পারে তা আমি নিজের কানে না শুনলে কিছুতেই বিশ্বাস করতুম না। রূপকথায় শুক-সারী আর ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্প পড়েছি। কিন্তু রূপকথা তো রূপ কথাই। পক্ষিরাজ ঘোড়া, মাছের পেটে মানুষ, আর মানুষখেকো দৈত্য যে সত্যি সত্যি কোথাও নেই, তা আমরা ছোটবেলাতেই বুঝে গিয়েছিলুম। সেই রকমই জানতুম যে

কথা-বলা পাখির কথা এমনিই কথার কথা।

কিন্তু বটুকদাদা আমাদের অবাক করে দিয়েছিলেন।

বটুকদাদা অনেক দেশ ঘুরে ঘুরে হঠাৎ হঠাৎ এক একদিন উপস্থিত হতেন আমাদের বাড়িতে। সঙ্গে নিয়ে আসতেন মাথা ভর্তি গল্প আর ঝোলা ভর্তি খুচরো পয়সা। একবার তিনি নিয়ে এলেন একটা পাখি। খাঁচায় বন্দী করে নয়, পায়ে শিকল বেঁধেও নয়। পাখিটা বসে ছিল বটুক-

দাদার কাঁধে।

সেটা যে ঠিক কী পাখি তা চেনা গেল না। দেখতে অনেকটা বেশ বড় সড় ঘুঘু পাখির মতন, কিন্তু গায়ের রং সবুজ। সেটাকে টিয়া পাখিও বলা যাবে না। কারণ টিয়া পাখির মতন লাল ঠোঁট নেই। অথচ সবুজ রঙের ঘুঘু পাখিও তো আমরা কেউ কখনো দেখিনি।

বটুকদাদা বললেন, ওটা একটা পাহাড়ী পাখি। কি করে যে একা একা এদিকে চলে এসেছে। আমি নৌকো করে আসছিলুম, পাখিটা প্রথমে উড়ে এসে ছই-এর ওপর বসলো। আমি আদর করে ডাকলুম, আয় আয়, কাছে আয়। কয়েকবার ডাকতেই আমার কাঁধের ওপর এসে বসল। আমার চোখ দেখে ঠিক বুঝেছিল। আমি তো পাখীদের ভালবাসি, তাই ওরা আমাকে ভয় পায় না।

বটুকদার সব কথাই তো অদ্ভুত, তাই এটাকে তো আমরা আর একটা অদ্ভুত কথা বলে ধরে নিলুম। অবশ্য পাখিটা যে শান্তভাবে বটুকদাদার কাঁধে বসে আছে, সেটাওতো ঠিক।

বটুকদাদা বললেন, দু'দিন ধরে নৌকোয় আসতে আসতে আমি পাখিটাকে কথা বলতে শিখিয়েছি। আমি তো পাখিদের ভাষা জানি তাই ওরাও আমাব কাছ থেকে চট করে মানুষের ভাষা শিখে নেয়।

তাই শুনে আমরা সবাই একসঙ্গে বলে উঠলুম, কই, কই, আমরা পাখিটার কথা শুনব! কথা শুনব!

বটুকদাদা হাত তুলে বললেন, শুনবি, শুনবি। এক্ষুনি না। এত নতুন লোক দেখে লজ্জা পেয়েছে। আমি চান খাওয়া করে নিই, তারপর তোদের শোনাব।

আমাদের সেই গ্রামের বাড়িতে ছিল একটা বেশ মস্ত উঠোন। তার তিন দিকেই ছোট ছোট একতলা ঘর। বটুকদাদা এলে তাঁকে দেওয়া হতো উত্তর দিকের কোণের একটি ঘর। সেই ঘরের খুব কাছেই পুকুর ঘাট।

নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে বটুকদাদা বললেন, আমার পাখিটা ইচ্ছে মতন এখানে উড়ে বেড়াবে। তোরা ওকে আদর করে ডেকে কথা বলতে পারিস, কিন্তু ওর গায়ে হাত দিস না। পাখিদের গায়ে হাত দিতে নেই। এর নাম আমি দিয়েছি কেষ্ট।

তারপর বটুকদাদা পাখিটাকে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢোকবার একটু পরেই

স্পষ্ট শোনা গেল, কে যেন বলছে, বটুকদাদা, ওঠো, ওঠো, ওঠো !

আমার ছোটভাই খুব উত্তেজিত ভাবে বলল, ঐ যে, ঐ যে, পাখিটা কথা বলছে !

আমার ছোড়দি মুন্নির খুব বুদ্ধি আর সব কিছুতেই সন্দেহবাতিক। ছোড়দি ঠোঁট উল্টে বলল, ধ্যাৎ ! ওটা আবার পাখির ডাক নাকি ? আমাদের সঙ্গে মজা করার জন্য বটুকদাদা নিজেই ওরকম ডাকছে !

তক্ষুনি পাখিটা ফুড়ুৎ করে উড়ে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। রান্না ঘরের পাশে, পুকুর ঘাটের কাছে তেঁতুল গাছটার একটা নিচু ডালে গিয়ে বসল। আমরা দৌড়ে ওর কাছে গিয়ে বলতে লাগলুম, কেষ্ট, কেষ্ট আমরা তোমায় খুব ভালবাসি, আমাদের একটু কথা শোনাও তো !

পাখিটা যেন অবাক হয়ে আমাদের একটুক্ষণ দেখল। তারপ ফুড়ুৎ করে উড়ে চলে গেল অনেক দূরে।

আমরা বটুকদাদার ঘরের কাছে গিয়ে সবাই মিলে একসঙ্গে বললুম, ও বটুকদাদা, তোমার পাখি উড়ে গেল ! কোথায় যেন চলে গেল !

বটুকদাদা তখন ধুতি-পাঞ্জাবী খুলে পাজামা আর আলখাল্লা পরছেন, জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন, চিন্তা করিস না, ও আবার ঠিক আসবে। এখন ওর জল-খাবারের সময় তো !

অনেকখানি রাস্তা নৌকা করে এসেছেন বলে বটুকদাদা ক্লান্ত হয়ে ছিলেন, তাই দুপুরবেলা ঘুমিয়ে নিলেন। এদিকে দুপুর গড়িয়ে বিকেল বয়ে গেল, তখনও পাখিটার দেখা নেই। বটুকদাদার কাছে আমোদের গল্প শোনা হচ্ছে না বলে আমরা ছটফট করতে লাগলুম। বাড়ির বড়রা বটুক-দাদাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলতে বারণ করেছেন।

আমরা একটা ঘরে বসে ক্যারাম খেলছি, হঠাৎ বকু ছুটতে ছুটতে এসে বলল, কেষ্ট ফিরে এসেছে। কেষ্ট তেঁতুল গাছটার ডালে বসেছে।

আমরা খেলা বন্ধ করে বাইরে আসতেই স্পষ্ট শুনতে পেলুম সেই পাখির মুখে মানুষের ভাষা। তেঁতুল গাছের ডালে বসে সে ডাকছে, বটুকদাদা, ওঠো, ওঠো, ওঠো !

আমাদের চ্যাঁচামেচি শুনে বাড়ির অনেকেই বাইরে বেরিয়ে এলো। আমরা বললুম, ঐ শোন, পাখি কথা বলছে !

ঠাকুমা এক গাল হেসে বললেন, ওটা নিশ্চয়ই একটা সবুজ রং করা ঘুঘু পাখি। ঘুঘু পাখির ডাক এক এক সময় ঐরকম শোনায়। মন দিয়ে

শুনে দেখবি, ঘুঘু যেন বলছে, ঠাকুর গোপাল, ওঠো, ওঠো, ওঠো··· ।

বটুকদাদা ঘুম ভেঙে চোখ মুছতে মুছতে বাইরে এসে ডাকলেন, কেষ্ট, কেষ্ট ।

অমনি পাখিটা তেঁতুল গাছ থেকে উড়ে এসে বসল বটুকদাদার কাঁধের ওপর ।

আমরা কাছে গিয়ে বললুম, ও বটুকদাদা, তোমার কেষ্ট ঐ একটা কথা ছাড়া আর কোন কথা বলে না ?

বটুকদাদা গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ওরে কেষ্ট, কেষ্ট রে, তুই কেমন আছিস ?

পাখিটা অমনি বলে উঠল, ভালো, ভালো, ভালো ।

বটুকদাদা আবার জিজ্ঞেস করলেন, দুপুরে ঠিক মতন খাওয়া-দাওয়া হয়েছে তো ? এই জায়গাটা কেমন লাগছে ?

পাখিটাও আবার বলল, ভালো, ভালো, ভালো ।

বটুকদাদা আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখলি ? এর আগেও আমি কত পাখিকে কথা বলা শিখিয়েছি । তোদের ঠাকুদাকে জিজ্ঞেস করে দেখিস ।

সেবারে যে দু'তিন দিন বটুকদাদা রইলেন, পাখিটাকে নিয়ে আমাদের খুব আনন্দে কাটল । এত পোষমানা পাখি আমরা আগে দেখিনি । তার একটুও ভয় ডর নেই । সে আমাদের পড়াশুনোর সময় ঘরের মধ্যেও চলে আসে, এক পাশে চুপ করে বসে যেন আমাদের পড়া শোনে ।

ঠাকুমা বললেন, আহা রে, পাখিটা নিশ্চয়ই আগের জন্মে মানুষ ছিল । তাই মানুষের পাশে পাশে থাকতে এত ভালবাসে ।

আমরা কেষ্টর গায়ে হাত দিই না, কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলি । সে বেশি কথা বলতে পারে না বটে, কিন্তু আমাদের সব কথাই যেন সে বুঝতে পারে । অধিকাংশ প্রশ্নেরই উত্তরে সে বলে, ভালো, ভালো, ভালো । কিংবা না, না, না । প্রশ্নগুলো সেইভাবেই সাজাতে হয় । যেমন আমরা যদি তাকে জিজ্ঞাসা করি কেষ্ট, তোমায় কেউ কষ্ট দিয়েছে ? অমনি সে বলে, না, না, না । কিংবা, কেষ্ট, আজ কি বৃষ্টি হবে ? সে বলবে, না, না, না ।

তিন দিন বাদে বটুকদাদা যখন কেষ্টকে নিয়ে চলে গেলেন, তখন আমাদের খুব মন খারাপ হয়ে গেল । আমরা নৌকোর ঘাট পর্যন্ত গিয়ে

বটুকদাদাকে বললুম, বটুকদাদা, পরের বার যখন আসবে, তখন কেষ্টকে ঠিক সঙ্গে করে এনো কিন্তু!

বটুকদাদা ঘাড় হেলিয়ে বললেন, হ্যাঁ আনবো। কি রে কেষ্ট, তুই আসবি না?

কেষ্ট এই কথার উত্তর দিল না, কারণ সে হ্যাঁ বলতে পারে না।

তখন আমি জিজ্ঞেস করলুম, কেষ্ট তুমি অন্য জায়গায় থেকে যাবে না তো?

কেষ্ট তখন বলল, না, না, না।

বটুকদাদা ফিরে এলেন দেড় মাস বাদে। এবারে তাঁর সঙ্গে রতন বলে একটা ছেলে এসেছে কিন্তু তাঁর কাঁধের ওপর পাখিটা নেই।

তা দেখে আমাদের বুকটা ধড়াস করে উঠলো। কেষ্ট আসেনি! সে কি অন্য জায়গায় উড়ে চলে গেছে? বটুকদাদা একসময় বলেছিলেন যে আগেও তিনি অনেক পাখিকে কথা বলা শিখিয়েছেন বটে, কিন্তু এক সময় তাদের আবার আকাশে উড়িয়ে দিয়েছেন।

আমরা জিজ্ঞেস করলুম, বটুকদাদা, কেষ্ট কোথায়? কেষ্টকে আনোনি?

বটুকদাদা বললেন, হ্যাঁ, এসেছে। কেষ্ট আছে। পরে দেখতে পাবি।

কিন্তু বটুকদাদার সঙ্গে কোন জিনিসপত্র নেই, কাঁধে শুধু একটা টাকা-পয়সা রাখার ঝুলি, তার মধ্যে তো একটা পাখিকে রাখা যায় না। তা হলে কেষ্ট কোথায়? সে কি আকাশপথে আসছে?

বটুকদাদা বললেন, এবারে বড় বাঁচা বেঁচে গেছি, ওরে, দারুণ বিপদের মুখে পড়েছিলুম। দাঁড়া, একটু বিশ্রাম করে নিই, তারপর সব কথা শোনাবো।

দুপুরবেলা বটুকদাদা ঘুমিয়ে পড়লেন। তখনও কেষ্টর পাত্তা নেই। আমরা রতন নামে ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলুম, এই, তুমি কেষ্টকে চেনো? তাকে দেখেছ? সে এখন কোথায় আছে বলতে পারো?

রতন বলল, হ্যাঁ আমি কেষ্টকে চিনি। অনেকবার দেখেছি। কিন্তু সে এখন কোথায় আছে তা তো বলতে পারব না।

বকু জিজ্ঞেস করলো, তুমি যে এবারে বটুকদাদার সঙ্গে এলে, আসবার পথে তাকে একবারও দেখতে পাওনি?

রতন হঠাৎ মুখ চুন করে বলল, না গো, কি করে দেখব বলো, গত

হপ্তায় যে তাকে একটা বেড়ালে খেয়ে ফেলেছে।

আমরা সব কটি ভাই বোন একসঙ্গে আঁতকে উঠে বললুম, অ্যাঁ? বেড়ালে খেয়ে ফেলেছে? কেষ্টকে? যাঃ, তা হতেই পারে না।

রতন বলল, আমি নিজের চোখে দেখেছি গো। গত হপ্তায় আমাদের নৌকো বাঁধা হয়েছিল চাঁদপুরের ঘাটে। আমরা মুড়ি খেতে বসেছি, কেষ্ট পাশেই বসে আছে। হঠাৎ ঘাট থেকে একটা হুলো বেড়াল লাফিয়ে পড়ে কামড়ে ধরলো কেষ্টকে। তারপর তো তাকে মুখে নিয়ে দিল একটা উল্টো দিকে লাফ। আমি লাঠি নিয়ে তেড়ে গেলুম বটে কিন্তু ততক্ষণে কেষ্ট মারা গেছে। পাখির প্রাণ কি বেড়ালের কামড়ে বাঁচে? বেড়ালটার মুখ থেকে কেষ্টর আধখাওয়া দেহটা উদ্ধার করা হলো, তারপর ভাসিয়ে দেওয়া হলো নদীর জলে। বটুকদাদা সেদিন খুব কেঁদেছিলেন।

ভীষণ দুঃখে আমরা সবাই চুপ করে গেলুম। শুধু বকু মিন মিন করে রতনকে জিজ্ঞেস করল, তবে যে তুমি প্রথমে বললে, কেষ্ট কোথায় আছে তা তুমি জানো না?

রতন এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না।

বিকেলবেলা ঠাকুর্দা-ঠাকুমা আর বাবা-কাকার আসরে চা-মুড়ি খেতে খেতে বটুকদাদা শোনালেন এবারের বিপদের গল্প। প্রত্যেকবারই তাঁর একটা না একটা গল্প থাকে। তবে এবারে নাকি তিনি নির্ঘাৎ প্রাণেই মারা যেতেন।

ঠাকুমা জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সেই পাখিটা কোথায় গেল? ছেলেরা বলছে, তাকে নাকি... ....

ঠাকুমার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বটুকদদা বললেন, আগে এই ঘটনাটা শুনে নাও। তারপর কেষ্টর কথা বলব।

বটুকদাদা অন্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এবারে একটু সুন্দরবনের দিকে গিয়েছিলুম বুঝলে? ওদিকে একটা খেয়াঘাট ইজারা নেবার কথা হচ্ছিল। ওদিকে বড্ড বাঘের ভয়, তাই সন্ধের পর কেউ নৌকো চালায় না। আমিও বিকেল হতে না হতেই মোল্লাখালির ঘাটে নৌকো বেঁধে ফেলেছি। রাত্তিরে আর রান্না বান্নার ঝামেলা করিনি, কাছেই একটা হোটেল ছিল সেখান থেকে খেয়ে নিলুম রতন আর আমি। রতনটা খুব ঘুম-কাতুরে, সন্ধে হতে না হতেই ওর ঘুম পায়। আমিও আটটার মধ্যেই শুয়ে পড়লুম, শুধু কেরোসিন পুড়িয়ে লাভ কি। পাশাপাশি তিন চার

খানা নৌকো, ভয়ের কিছু নেই।

হঠাৎ এক সময় আমার কানের কাছে কেষ্ট ডেকে উঠল, বটুকদাদা, ওঠো, ওঠো, ওঠো!

সেই ডাক শুনে আমি ধড়মড় করে জেগে উঠলুম। অমনি কানে এলো হৈ হৈ শব্দ; ছই এর বাইরে উঁকি দিয়ে দেখি পাশের নৌকোতেই ডাকাত পড়েছে। মশালের আলোয় চোখে পড়ল, একজন ডাকাত একজন মাঝিকে মারবার জন্য খাঁড়া তুলেছে।

বুঝলে দাদা, এক মিনিট দেরি হলে সেই ডাকাতরা আমার নৌকোতেও লাফিয়ে চলে আসত। কেষ্ট ঠিক সময় আমার ঘুম ভাঙিয়ে না দিলে প্রাণে মারা যেতুম। আমি সঙ্গে সঙ্গে নৌকোর দড়ি খুলে নিয়ে একটা ধাক্কা মারতেই আমাদের নৌকো ভেসে পড়লো স্রোতে। ডাকাতেরা আর ধরতে পারলো না।

ঠাকুমা জিজ্ঞেস করলেন, এটা কবেকার ঘটনা?

বটুকদাদা বললেন, এই তো পরশু রাতেই··· ·তারপর সোজা চলে এসেছি তোমাদের এখানে।

ঠাকুমা বললেন, পরশু রাতে? তাহলে যে ছেলেরা বলল, এক সপ্তাহ আগেই নাকি তোমার কেষ্টপাখিকে বেড়ালে খেয়ে ফেলেছে! সে পাখিটা তো মরে গেছে?

ঠাকুমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বটুকদাদা বললেন, মরে গেলেই কি সব কিছু শেষ হয়ে যায়? কেউ কেউ থাকে। কেষ্ট হারিয়ে যায়নি, সে এখনও আছে। সেই আমায় বাঁচিয়েছে!

ঠাকুমা কপালে দু'হাত ঠেকিয়ে বললেন, রাম, রাম!

গল্পটা শুনে আমাদের গায়ে কাঁটা দিল। কিন্তু ছোড়দি বলল, হয় ঐ রতনটা মিথ্যে কথা বলেছে, না হলে বটুকদাদা এই গল্পটা বানিয়ে বানিয়ে বলেছে।

পরদিন ভোর বেলা আমার ঘুম ভাঙতেই আমি শুনতে পেলুম একটা পাখির গলার ডাক, বটুকদাদা, ওঠো, ওঠো, ওঠো!

কেষ্টকে আমি খুব ভাল বাসতুম, কিন্তু ঐ ডাক শুনে আমার দারুণ ভয় হলো। আমি পাশের ঘুমন্ত ছোড়দিকে ধাক্কা মেরে জাগিয়ে বললুম, ছোড়দি, ছোড়দি, শোনো··· ···

ছোড়দি কান খাড়া করে শুনল। তার ভুরু কুঁচকে গেল। বিড়বিড়

করে বলল, মানুষ মরে গেলে কখনো কখনো ভূত হয় শুনেছি, পাখি মরে গেলেও ভূত হয় ? ধ্যাৎ ! যত সব বাজে কথা। চল তো গিয়ে দেখি !

ছোড়দির খুব সাহস. সে আমার হাত ধরে নিয়ে এলো ঘরের বাইরে। ডাকটা আসছে পুকুর ধারের তেঁতুল গাছটা থেকে। আমরা দুজনে গিয়ে সেখানে দাঁড়ালুম। কোন পাখি চোখে দেখা গেল না। পাতার আড়ালে লুকিয়ে আছে কিনা কে জানে। কিন্তু স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে একটা ডাক, বটুকদাদা, ওঠো, ওঠো, ওঠো !

দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন বটুকদাদা। চোখ মুছতে মুছতে আমাদের দেখতে পেয়ে বললেন, ঐ যে কেষ্ট আমাকে ডাকছে, শুনতে পাচ্ছিস ? আজ আমাকে তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে তো, তাই কেষ্ট ডেকে তুলছে।

এবারে ছোড়দিও কোন কথা বলতে পারল না।

চোর পুলিশ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

এ যেন সুকুমার রায়ের 'ছিল রুমাল, হয়ে গেল বেড়াল' সেই রকম। ছিল তাল গাছ, হয়ে গেল বেড়াল। দুঁদে দারোগা বঙ্কুবাবু তো তাজ্জব। শুধু তাজ্জব নন, রীতিমতো হতবাক। থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন কেষ্ট-নগরের পুতুলটি হয়ে।

আসছিলেন কেকরাডিহি থেকে একটা তদন্ত সেরে। দুদিন আগে সেখানে দুদলে খুব মারপিট রক্তারক্তি হয়ে গেছে। তদন্ত সারতে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গের দুজন বন্দুকধারী সেপাইকে সেখানকার শান্তি-রক্ষার ভার দিয়ে বঙ্কুবাবু সাইকেলে চেপে একা থানায় ফিরছিলেন। কেকরাডিহির বিশাল মাঠের মাঝামাঝি পৌঁছে চাঁদ উঠেছিল। কাঁচা রাস্তায় বড্ড ধুলো। তাই আস্তে সাইকেল চালিয়ে আসছিলেন আর অভ্যাসবশত গুনগুন করে গানও গাইছিলেন। তারপর সামনে দেখলেন একটা বাজপড়া মুণ্ডুহীন ন্যাড়া তাল গাছ। সেই সময় হঠাৎ মনে পড়েছিল, আসার সময় তো এমন কোনো তালগাছ দেখেননি! সেজন্যই একটু অবাক হয়ে সাইকেলে ব্রেক কষেছিলেন। তারপর এই অদ্ভুত ঘটনা।

তাঁর চোখের সামনে জ্যোৎস্নারাতে ওই উটকো তালগাছটা হঠাৎ খাটো হতে হতে বেঁটে হতে হতে মাটির ভেতর যেন সেঁধিয়ে যাচ্ছে। টর্চ আছে সঙ্গে। ঝটপট জ্বেলে দেখলেন তালগাছটার জায়গায় একটা কালো বেড়াল নীল জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে তাঁকে দেখছে।

পুলিশকে ভূতের ভয় করতে নাই। তাছাড়া ওটা ভূত কি না সেটা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। বঙ্কুবাবু সেজন্যই খুব রেগে গিয়ে হুঙ্কার ছাড়লেন, তবে রে!

কালো বেড়ালটা তবু গ্রাহ্য করল না। তার চেয়ে বিচ্ছিরি ব্যাপার, টর্চটাও গেল বিগড়ে। সুইচ টেপাটেপি করে আলো জ্বলল না। তখন সাইকেল থেকে নেমে বঙ্কুবাবু সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে রেখে পিস্তল বের করলেন। পিস্তল তাক করে ট্রিগারও টানলেন। গুলি বেরুল। বিকট

ফটাস আওয়াজ হল। কিন্তু বেড়ালটার গায়ে গুলি বিঁধল না। তখন আরও খাপ্পা হয়ে ফের গুলি ছুঁড়তে থাকলেন। পিস্তলটাতে আঠারোটা গুলি। সাতটি গুলি খরচ হয়েছে, এমন সময় যেটা ছিল বেড়াল, সেটা হয়ে গেল একটা মানুষ। তারপর সেই মানুষটা খি খি করে খুব হেসে বলে উঠল, খামোকা গুলি খরচ করে কী লাভ দারোগাবাবু ?

বঙ্কুদারোগা মানুষের কথা শুনে ভড়কে গেলেন বটে, কিন্তু মুখে সাহস করে গর্জে উঠলেন, তুই কোন ব্যাটা রে ?

আজ্ঞে, আমি সেই পাঁচু।

বঙ্কুবাবু এতক্ষণে সঠিকভাবে বুঝতে পারলেন, তিনি ভূতের পাল্লায় পড়েছেন। তালগাছের বেড়াল হয়ে যাওয়া চোখের ভুল হতেও পারে, কিন্তু মানুষ হয়ে পাঁচুতে রূপ নেওয়াটা তো আর চোখের ভুল বলা যাবে না। তার ওপর কথাও বলছে। তার চেয়ে বড় কথা, এই পাঁচু ছিল ধড়িবাজ এক সিঁদেল চোর। সম্প্রতি রোগে ভুগে সে মারা পড়েছিল। তার সঙ্গে কেকরাডিহির মাঠে রাতবিরেতে দেখা হওয়াটা সহজ ব্যাপার নয়। বঙ্কু দারোগা মনে মনে ঠিক করলেন, এসব ক্ষেত্রে আপস করাই ভাল। তাই তিনিও খিক খিক করে হেসে বললেন, তুই তাহলে পাঁচু ? তা এখানে দাঁড়িয়ে কী করছিস তুই ?

পাঁচু চোরের ভূত অবাক হয়ে বলল, আমাকে আপনার ভয় করছে না দারোগাবাবু ?

একটুও না। চোরকে পুলিশ কখনও ভয় করে ? ভয় করলে পুলিশের চাকরি থাকে রে ?

কিন্তু ভূতকে ? আমি যে মরে ভূত হয়েছি, দারোগাবাবু।

মরলে লোকে ভূত হয়, এ আবার নতুন কথা কী ? আমি মরলে আমিও ভূত হব। বঙ্কুদারোগা খুব হেসে বললেন, তুই তো তালগাছ হয়েছিলি, তারপর বেড়াল হলি, শেষে ফের পাঁচু হয়ে গেলি। আর আমি হলে কী করব জানিস ?

পাঁচুর ভূত আগ্রহ দেখিয়ে বলল, কী করবেন শুনি ?

বঙ্কুবাবু ভরাট গলায় বললেন, কথায় আছে : স্বভাব যায় না মলে। বুঝলি কিছু ?

আজ্ঞে না।

তুই একটা হাঁদারাম ! আমি সারাজীবন দারোগাগিরি করছি। চোর-

ডাকাত ধরা আমার স্বভাবে দাঁড়িয়েছে। আমি যখন মরব, সে স্বভাব যাবে কোথায়? তোর মত চোরদের ধরব। বেদম পিটুনি দেব। ঠ্যাংদুটো বেঁধে ওপরে ঝুলিয়ে—

কথা শেষ হবার আগেই পাঁচুর ভূত চেঁচিয়ে উঠল, আরে তাই তো! তাই তো! তারপর একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বঙ্কুদারোগা কিছু বুঝতে পারলেন না। বারকতক ওকে ডাকাডাকি করে সাড়া না পেয়ে হ্যাত্তেরি বলে সাইকেলে চাপলেন। রেগেমেগে এবার জোরে প্যাডেলে চাপ দিলেন। প্রচণ্ড বেগে থানায় ফিরে চললেন।··

পাঁচুর ভূত কেন এমন করে হঠাৎ উধাও হয়েছিল, বুঝতে কয়েকটা দিন দেরি হল বঙ্কুবাবুর। সিঁদেল চোর পাঁচুর মরার পর থেকে এলাকায় চুরিচামারি, বিশেষ করে সিঁদকাটা একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই রাতের পর আবার থানায় লোকেরা একের পর এক এসে চুরির নালিশ করতে শুরু করল। চুরিগুলোও ভারি অদ্ভুত রকমের। সিঙ্গিমশাইয়ের জামাই এসেছে বলে থলে ভর্তি বাজার করে ফিরছেন। হঠাৎ থলেতে হ্যাঁচকা টান এবং ঘুরে দেখেন থলেটি শূন্যে ভেসে উধাও হয়ে গেল। বিন্দু ঝি পুকুরঘাটে বসে থালাবাসন মাজছে আর পেছনে রাখছে। ধোয়া শেষ করে ঘুরে দেখে বাসনকোসন নেই। এমনকী, বঙ্কুবাবুর কোয়ার্টারেই এক রাত্তিরে সিঁদ। বঙ্কুবাবুর বাবা অনিদ্রার রুগী। সিঁদ কেটে

চোর যেই পা দুখানা ঘরে ঢুকিয়েছে, সুইচ টিপে আলো জ্বেলে খপ করে পা দুটো ধরে ফেলেছিলেন। লিকলিকে কালো দুটো পা। কিন্তু ধরা মাত্র হাত ঠাণ্ডায় জমে গেল। বাপস্ বলে ছেড়ে দিলেন। পা দুটোও সিঁদের গর্ত দিয়ে সুড়ুৎ করে বেরিয়ে গেল।

এবার বঙ্কুবাবু বুঝলেন কী হচ্ছে। খুব আফশোস হতে লাগল তাঁর। কেন যে বলেছিলেন পাঁচুর ভূতকে, 'স্বভাব যায় না মলে,' ভুলটা সেখানেই হয়েছিল। পাঁচু ছিল চোর। কিন্তু মলেও চোরের চুরির স্বভাব যায় না, পাঁচুর ভূতকে প্রকারান্তরে মনে পড়িয়ে দিয়েছিলেন বঙ্কুদারোগা।

বড় ভাবনায় পড়ে গেলেন। চোর যতক্ষণ মানুষ থাকে, তাকে শায়েস্তা করা যায়। কিন্তু চোর ভূত হলে তাকে শায়েস্তা করতে—পুলিশ ভূতেই দরকার। বঙ্কুবাবু তো পাঁচু চোরের ভূতকে পাকড়াও করার জন্য মরে যেতে পারেন না! বালাই ষাট! এ বয়সে তিনি মরবেন কেন? বরং মহৎ কোন একটা কাজের জন্য প্রাণ দিয়ে মরা যায়, নেহাত একটা সিঁচকে চোরের জন্য প্রাণ ত্যাগ করার মানে হয়?

রোজ এদিকে নালিশে নালিশে জেরবার। জেলার ওপরওয়ালারাও ফুটিয়ে ফলাও করে এই তল্লাটের চুরির খবর ছাপতে শুরু করেছে। সদর থেকে পুলিশ সুপার কড়া চিঠি লিখেছেন। স্থানীয় এম. এল. এ.-মশাইও বারবার এসে শাসিয়ে যাচ্ছেন। গণতন্ত্রের যুগ। গণ দরখাস্ত ঠুকে দিলে বঙ্কুবাবুর চাকরি নিয়েও টানাটানি হতে পারে। বড় ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলেন বঙ্কুবাবু। আসল সমস্যাটা হল, এসব চুরিচামারি যে ভূতের কীর্তি, সেটা তো বিশ্বাস করবেন না ওপরওয়ালারা। সংবিধানে 'ভূত' বলে কোন কথা নেই। কোন আইনকানুনেও নেই। স্থানীয় লোকের মতে, পাঁচুর কোন সাগরেদেরই কাজ। কিন্তু সে যে কে, তাও কারুর মাথায় আসছে না।

একদিন দুপুরবেলা মনমরা হয়ে থানার পেছন দিকে নিরিবিলি একটা আমতলায় বঙ্কুবাবু দাঁড়িয়ে আছেন, সেইসময় শনশনিয়ে বাতাস উঠল। একটা ঘুর্ণিহাওয়া ধুলোবালি শুকনো পাতা উড়িয়ে গাছটাকে নাড়া দিল। চোখে ধুলো ঢোকার ভয়ে চোখ বুজে ফেলেছিলেন বঙ্কুদারোগা। চোখ খুলে হকচকিয়ে গেলেন। সামনে একটু তফাতে আছেন তাঁর বন্ধু করালী-মোহন। তিনিও এক দারোগাবাবু। অন্য একটা থানায় ছিলেন বলে জানতেন। বহুদিন দেখাসাক্ষাত নেই দুজনে। বঙ্কুবাবু খুশি হয়ে বললেন,

আরে ? করালী যে ! তুমি হঠাৎ কোত্থেকে ?

করালীমোহন মিটিমিটি হেসে বললেন, শুনলুম খুব ঝামেলায় পড়েছ চুরি-চামারি নিয়ে। তাই ভাবলুম, গিয়ে জেনে আসি ব্যাপারটা কী।

বঙ্কুবাবু বললেন, বলছি। কিন্তু তুমি এখন কোন থানায় আছ ? খোঁজ-খবর পাইনে। সদরে কনফারেন্সে গিয়েও তোমাকে দেখতে পাইনে। নিশ্চয়ই অন্য জেলায় বদলি হয়ে গেছ ?

করালীমোহন বললেন, বদলি হয়েছি, সেটা ঠিক। তবে তোমার প্রব্লেমটা আগে শুনি।

বঙ্কুবাবু সংক্ষেপে পাঁচুর ভূতের সঙ্গে দেখা হওয়া থেকে শুরু করে সবটাই বললেন। শোনার পর করালীমোহন হেসে অস্থির। এই কথা ? ঠিক আছে। আমি দেখছি ব্যাটাকে।

কী করে দেখবে ? ব্যাটা তো মানুষ নয়, ভূত।

করালীমোহন হাতের বেটন নাড়া দিয়ে বললেন, ভূতকে শায়েস্তা করতে ভূত চাই। বুঝলে তো ?

কিন্তু সেটাই তো সমস্যা। পাচ্ছিটা কোথায় ?

আছে, আছে।

করালীমোহন কথাটা বলার সঙ্গে আবার একটা ঘূর্ণীবাতাস এল মাঠের দিক থেকে। ধুলো ঢোকার ভয়ে চোখ বুজলেন বঙ্কুবাবু। বাতাসটা চলে গেলে চোখ খুললেন। তারপর অবাক হয়ে গেলেন। করালীমোহন নেই !........

দিন দুই পরে বঙ্কুদারোগা লক্ষ্য করলেন, থানায় আর একটাও চুরির নালিশ আসছে না। তারপর একদিন স্বয়ং এম. এল. এ. মশাইও মিছিল করে এসে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন। সদর থেকে পুলিশকর্তার প্রশংসার চিঠি এসে গেল। ব্যাপারটা কী ?

করালীমোহন কি তাহলে ভূতের রোজা দিয়ে পাঁচুকে শায়েস্তা করে ফেলেছেন ? করালীমোহন পাকা লোক বটে। তাঁর চেয়ে আরও দুঁদে দারোগা। তাঁর বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়। নিশ্চয়ই রোজা লাগিয়ে ব্যাটা-চ্ছেলেকে ঢিট করে ফেলেছেন। দুচ্ছাই, কেন যে ভূতের রোজার কথাটা তাঁর মাথায় আসেনি !

তবে করালীমোহনের দৌলতে প্রমোশনের চিঠি পেয়ে গেলেন বঙ্কুবাবু।

মফস্বল শহরে একেবারে এস ডি পি ও-র পোস্টে প্রমোশন। অবিলম্বে জয়েন করতে হবে। রাত্তিরে জিনিসপত্তর বাঁধাছাড়া হয়ে গেছে। ভোরবেলা রওনা দেবেন। আনন্দ ও উত্তেজনায় ঘুম আসছে না চোখে। আনন্দ প্রকাশ করতে নিরিবিলি গুনগুন করে গান গাওয়া অভ্যেস বঙ্কুবাবুর। তাই থানার প্রাঙ্গণ পেরিয়ে খেলার মাঠটাতে গিয়ে দাঁড়ালেন। তেমনি জ্যোৎস্নারাত। বাতাস বইছে। সবে গুনগুনিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত ধরেছেন, 'আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে,' এমন সময় হঠাৎ দেখতে পেলেন কালো মত কী একটা সামনে আসছে। গানভঙ্গ হাওয়ায় খাপ্পা বঙ্কুবাবু বললেন, কে রে ?

কালো মূর্তিটা দাঁড়িয়ে গেল। বলল, আমি স্যার !

আমি কে ? কী নাম ? বাড়ি কোথায় ?

স্যার, আমি সেই পাঁচু।

বঙ্কুবাবু খিখি করে হেসে বললেন, পাঁচু ! আয়, আয় ! কেমন জব্দ হয়েছিস বল।

পাঁচুর ভূতও পাল্টা হেসে বলল, জব্দ হয়েছিলুম বটে দিনকতক।

তার মানে ?

বুঝলেন না ? করালীদারোগার নাতি গয়ায় পিণ্ডি দিয়ে ফিরে এসেছে। এখন করালীবাবু উদ্ধার হয়ে স্বর্গে চলে গেছেন। আর আমায় ঠেকায় কে ? যাচ্ছিলুম হরিবাবুর বাড়ি সিঁদ কাটতে, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ভাবলুম খবরটা দিয়েই যাই।

বঙ্কুবাবু চমকে উঠে বললেন, করালীমোহনের পিণ্ডি ! কী বলছিস রে ? করালী মারা গিয়েছিল বলোনি তো সেদিন ?

কবে মরে ভূত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। পাঁচু চোর বেজায় হাসতে লাগল। আপনার অবস্থা দেখে আমার পেছনে লেগেছিলেন কিছুদিন। উঃ, খুব ঠেঙিয়েছেন। এখনও গা ব্যথা করছে স্যার !

ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বঙ্কুবাবু বললেন, আমার প্রমোশন হয়েছে তো বড্ড ভুল হল দেখছি। তুই তো আবার লোকেদের জ্বালাতে শুরু করবি। নতুন দারোগাবাবুটির বয়স কম। ওরে পাঁচু, দোহাই তোকে, এ বেচারাকে ঝামেলায় ফেলিসনে বাবা !

পাঁচু বলল, তা কি হয় স্যার ? আপনিই তো মনে করিয়ে দিয়েছেন, স্বভাব যায় না মলে।

বলেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল। বঙ্কুদারোগা তার উদ্দেশ্যে হুংকার ছেড়ে বললেন, ঠিক আছে। আমায় মরতে দে! তারপর মজা দেখাচ্ছি। উইল করে যাব, যেন কেউ আমার জন্য গয়ায় পিণ্ডি না দেয়।

রাগে দুঃখে বঙ্কুবাবুর আগের মুড নষ্ট হয়ে গেছে। নতুন জায়গায় গিয়েই উকিল ডেকে উইল লিখিয়ে তবে শান্তি।

একটু উপসংহার আছে। মফস্বল শহরের বুদ্ধিমান উকিলরা বঙ্কু-বাবুকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, নিজের পিণ্ডিদত্তের ব্যবস্থা বন্ধ করার বদলে পাঁচু চোরের পিণ্ডির ব্যবস্থা করলেই তো ল্যাটা চুকে যায় কিন্তু দুঃখের কথা, বঙ্কুবাবুর সে চেষ্টা সফল হয়নি। পাঁচুর ঝাড়ে বংশে কেউ ছিল না। তাছাড়া একজন চোরের নামে পিণ্ডি দেবার লোকও খুঁজে পাওয়া যায়নি। যে শোনে সেই বলে, পাঁচুর নামে পিণ্ডি দিতে গয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেনে উঠে বসি, এদিকে আমার সর্বনাশ হয়ে যাক। আমি ওতে নেই বাবা! পিণ্ডি দেওয়ার আগেই পাঁচু ফতুর করে দেবে। ভুতের কান খুব সজাগ। নজরও কড়া।

সুতরাং বঙ্কুবাবুর পক্ষে ভূত হওয়ার দিন পর্যন্ত অপেক্ষা না করে উপায় নেই।

ডবল পশুপতি

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

পশুপতিবাবু নিতান্তই ভালমানুষ। তবে দোষের মধ্যে তাঁর মুখটা বড় ভুলো। তিনি সর্বদা এতই আনমনা যে, আচমকা কেউ তাঁকে তাঁর নামটা জিজ্ঞেস করে, তা হলেও তিনি চট করে সেটা মনে করতে পারবেন না। একটু ভেবে বলতে হয়।

পশুপতিবাবুদের অবস্থা একসময়ে বেশ ভালই ছিল। তাঁর ঠাকুর্দা পুরনো জিনিস কেনাবেচার কারবার করে খুব পয়সা করেছিলেন। বিশাল দো-মহলা বাড়ি, গাড়ি, জমিজমা, দাসদাসীর অভাব ছিল না। তবে এখন আর তার বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই। বাড়িটা আছে, তবে সংস্কার আর মেরামতির অভাবে সেটার অবস্থা বেশ করুণ। বিশাল বাগানটা এখন আগাছায় ভরা। বহু লোক বাড়িটা ভাড়া নিতে চায়, কিনতে চায়।

এই বিশাল বাড়িতে পশুপতিবাবু একা থাকেন। সকালে উঠে তিনি ডনবৈঠক দেন, কল-ওঠা ভেজা ছোলা আর আদা খান, নিজেই রান্না করেন। একা মানুষ বলে তাঁর বিশেষ টাকা-পয়সার দরকার হয় না। তাঁর একটা ছোট লোহালক্কড়ের দোকান আছে। সামান্য আয় হয়, তবে পশুপতিবাবুর চলে যায়।

দেখতে গেলে পশুপতিবাবু ভালই আছেন। তবে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, "এই যে পশুপতিবাবু, নমস্কার। কেমন আছেন?" তখন পশুপতিবাবুর ভারী সমস্যা হয়। আসলে কেমন আছেন তা পশুপতিবাবু আকাশ-পাতাল ভেবেও ঠাহর করতে পারেন না। তাই অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে বলেন, "বোধহয় ভালই।" কিংবা, "মন্দ নয়। খারাপও হতে পারে।" অবশ্য এই জবাব দিতে পশুপতিবাবুর এত দেরি হয় যে, প্রশ্নকর্তা হয় ততক্ষণে স্থানত্যাগ করেছেন, নয়তো জবাব শোনার ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছেন।

একদিন সকালবেলা পশুপতিবাবু যখন ডনবৈঠক করছেন, ঠিক সেই সময় একটা লোক বাইরে থেকে হেঁড়ে গলায় বোধহয় ডাকতে লাগল, "পশুবাবু আছেন নাকি? পশুবাবু?"

ব্যায়ামের সময় কেউ বাধা দিলে পশুপতিবাবু ভয়ানক চটে যান। আজও গেলেন। মাঝপথে ব্যায়াম বন্ধ করা যায় না, আবার জবাব না দিলেও অস্বস্তি। তাই প্রাণপণে বুকডন দিতে দিতে, পশুপতিবাবু শুধু "হুম্, হুম্, হুম্," শব্দ করতে লাগলেন।

লোকটা বুদ্ধিমান। দরজার বাইরে থেকে শব্দটা অনুধাবন করে সন্তর্পণে ভিতরে ঢুকল। তারপর ব্যায়ামরত পশুপতিবাবুকে দেখে একগাল হেসে বলল, "ব্যায়াম করছেন? খুব ভাল। ব্যায়ামের মত জিনিস হয় না। হজম হয়, খিদে পায়, জোর বাড়ে, গুণ্ডা-বদমাশদের ভয় খেতে হয় না। ব্যায়ামের যে কত উপকার।"
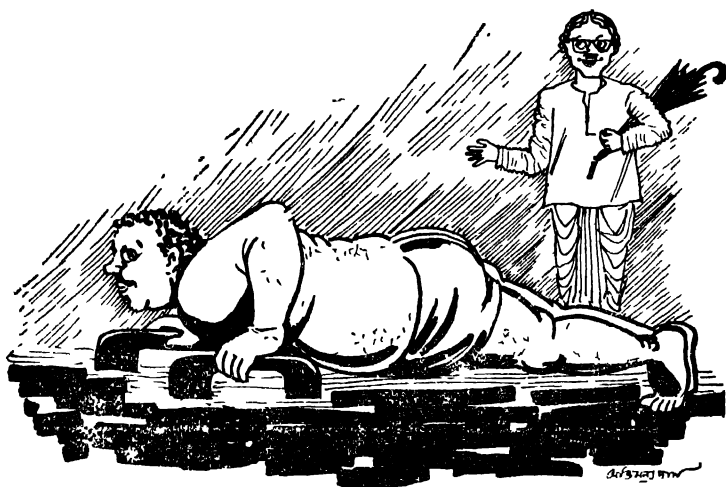
পশুপতিবাবু ব্যায়াম করতে করতে লোকটাকে একটু দেখে নিলেন। বেশ সেয়ানা চেহারার মাঝবয়সী রোগা একটা লোক। চেনা নয়।

পশুপতিবাবু বুকডন শেষ করে মুগুর ভাঁজতে লাগলেন।

লোকটা সভয়ে একটু কোণের দিকে সরে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর আপনমনেই বলতে লাগল, "লোকে বলে বটে, পশুপতিবাবু লোকটা সুবিধের নয়, মহাকেপ্পন, হাড়বজ্জাত, অহঙ্কারী, দাম্ভিক। আমি বলি, তা সবাই যে সমান হবে এমন কোনও কথা নেই। আর পশুপতিবাবুর খারাপটাই তো শুধু দেখলে হবে না। তার ভাল দিকটাও দেখতে হবে। লোকটা স্বাস্থ্য-বান; সাহসী, উদার।"

পশুপতিবাবু রাগবেন কি খুশি হবেন তা বুঝতে পারলেন না।

তবে হাতের মুগুরদুটো খুব বাঁই-বাঁই করে ঘুরতে লাগল। ব্যায়ামের সময় কথা বলতে নেই।

লোকটা ঘুরন্ত মুগুরদুটোর দিকে সভয়ে চেয়ে থেকে বলল, "তা মহেন্দ্র তখন বলে বসল, 'ওহে নিতাই, তোমার পুরনো স্বভাবটা আর বদলাল না। তুমি কেবল লোকের ভালটাই দেখে গেলে। কিন্তু দুনিয়াটা যে খারাপ লোকে ভরে গেছে, সেটা আর তোমার চোখে পড়ল না। পশুপতির আবার গুণটা কিসের? বাপ পিতেমোর অত বড় বাড়িটা ভূতের বাড়ি করে ফেলে রেখেছে। অথচ কত লোক বাড়ি না পেয়ে কত কষ্টে এখানে-সেখানে মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজে বেড়াচ্ছে।"

পশুপতিবাবু মুগুর নামিয়ে রাখলেন। হাপরের মতো হাঁফাচ্ছিলেন তিনি। লোকটার দিকে একবার গম্ভীর চোখে তাকানোর চেষ্টা করলেন। কী বলবেন ভেবে পেলেন না। আরও ভাবতে হবে। অনেক ভেবে তবেই তিনি কথা বলতে পারেন।

পশুপতিবাবু মাথাটাকে চাঙ্গা করার জন্য বিছানার ওপর শীর্ষাসন করতে লাগলেন।

লোকটা বলল, "আমিও ছেড়ে কথা কইনি। মহেন্দ্রকে আমিও দু'কথা বেশ করে শুনিয়ে দিয়েছি। 'ওরে মহেন্দ্র, পশুপতিবাবুর বাইরেটাই দেখলি, ভিতরটা দেখলি না। পশুপতিবাবুর কাছে গিয়ে ধানাই-পানাই করলে তো চলবে না। তিনি অল্প কথার মানুষ। দিনরাত লোক গিয়ে তাঁর কাছে ঘ্যানর-ঘ্যানর করে মাথা ধরিয়ে দেয়। কাকে ছেড়ে কাকে দেবেন ঠিক করতে পারেন না। তবে এই আমি যদি যাই, তাহলে আমার মুখের দিকে চেয়েই পশুপতিবাবু বুঝতে পেরে যাবেন, এই হচ্ছে খাঁটি লোক। বাড়িতে যদি ভাড়াটে বসাতে হয় তো একে। কী জানিস মহেন্দ্র, পশুপতি-বাবু কথা কম বলেন বটে, কিন্তু মানুষ চেনেন।"

পশুপতি ধনুরাসন শেষ করলেন। ময়ূরাসন করতে লাগলেন। এবং লোকটাকে কী বলবেন ভাবতে লাগলেন। ভাবতে ভাবতে ভুজঙ্গাসনে এসে তিনি ফের উৎকর্ণ হলেন।

লোকটা আপনমনেই হেসে বলছিল, "আমি বলি কি, পশুপতিবাবু কি আর আমার প্রস্তাব ফেলতে পারবেন! তিনি তেমনই লোক নন। লোক তাঁর বাড়িটা কিনতে চায়, ভাড়া নিতে চায়। পশুপতিবাবু তাদের সবাইকে বলেন, ভেবে দেখি। তা ভাবতে পশুপতিবাবুর একটু সময় লাগে বইকী।

ভগবান তো আর সবাইকে একরকম মগজ দেননি। তাই মহেন্দ্র বলে বসল, 'তুমি পারবে না হে নিতাই,' তখন আমিও বললুম, 'ওরে মহেন্দ্র, পশুপতিবাবুর ভাবনাগুলো যদি তোরা ভেবে দিতিস তবে কাজটা কত সহজ হত। পশুপতি ছেলেমানুষ, বুদ্ধিটাও ঘোলাটে, মগজেও কিছু খাটো, ও আর কত ভাববে। আসল কথা হল, পশুপতিকে ভাববার সময় দিতে নেই।' তাই আমি আর দেরি করিনি। একেবারে ঠেলাগাড়ি বোঝাই করে মালপত্র আর তিনটে টানা-রিকশায় পুরো ফ্যামিলিকে চাপিয়ে এনে হাজির করেছি। জানি, পশুপতি ফেলতে পারবেন না। আমিও ফিরে যাবার নই, আর ভাড়া? পশুপতিবাবু টাকার কাঙাল নন জানি, তবু আমিই বা অধর্ম করতে যাব কোন দুঃখে? গুনে গুনে পঞ্চাশটা করে টাকা ফেলে দেব মাসে। আর পুরো বাড়িটাও তো নিচ্ছি না। শুধু দোতলার পুব-দক্ষিণ কোণের চারখানা ঘর আর দরদালানটুকু।"

পশুপতির ব্যায়াম যখন শেষ হল, তখনও ভাবা শেষ হয়নি। তিনি লোকটার দিকে করুণ নয়নে চেয়ে রইলেন।

লোকটা তাড়াতাড়ি বলল, "না, না, আপনাকে ভাবতে হবে না। মালপত্র ঠেলাওলারাই নামিয়ে ঘরে তুলে দিয়ে যাবে। শুধু চাবিটা কোথায় সেটা কষ্ট করে বললেই হবে। আমার বাচ্চারা বড্ড ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে। গিন্নিও আবার রগচটা মানুষ।"

পশুপতি বুঝতে পারলেন, দুনিয়াতে ভালমানুষ হওয়াটা কোনও কাজের কথা নয়। এ-লোকটা তাঁকে কোনও প্রশ্ন করেনি, মতামতও চায়নি। বরং তাঁর হয়ে নিজের সব সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। পশুপতিবাবু এখন করেন কী?

বাইরে এসে তিনি দেখলেন, বাস্তবিকই তিন-চারটে ঠেলার ওপর থেকে পাহাড় প্রমাণ মালপত্র কুলিরা ধীরেসুস্থে নামাচ্ছে। গোটাপাঁচেক নানা বয়সের বাচ্চা বাগানে নিরুদ্বেগ হুটোপুটি করছে। একজন মোটাসোটা বদরাগী চেহারার ভদ্রমহিলা কুলিদের ধমকাচ্ছেন, তিনি পশুপতিকে দেখে চোখ পাকিয়ে বললেন, "ঘরদোর সব পরিষ্কার আছে তো! আর জল-টল তুলে রেখেছেন তো কলঘরে?"

এর কী জবাব দেওয়া যায় পশুপতিবাবু তা ভাবতে শুরু করলেন।

ভাবতে ভাবতেই দেখলেন, তাঁর চোখের সামনে দিয়ে মালপত্র ওপরে উঠতে লাগল। দুমদাম শব্দ, চেঁচামেচি, হইহট্টগোল।

পশুপতি সভয়ে নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিলেন। রান্নাবান্না মাথায় উঠল। তিনি তাড়াতাড়ি পোশাক পরে দোকানে রওনা হয়ে গেলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় এত হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন যে, মাথাটা আর ভাবতেও পারছে না কিছু।

সন্ধেবেলা যখন পশুপতি বাড়ি ফিরে এলেন, তখন গোটা বাড়িটাই প্রায় নিতাইয়ের দখলে। একতলার বারান্দায় শতরঞ্চি পেতে বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে সে তাসের আসর বসিয়েছে। দোতলায় কে যেন গলা সাধছে। গোটাপাঁচেক বাচ্চা চেঁচিয়ে পড়া করছে।

পশুপতিবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, দিন-সাতেক আগেও একজন বাড়িটা দশ লাখ টাকায় কিনতে চেয়েছিল। আর দুজন লোক ভাড়া নিতে চেয়েছিল মাসে দু'হাজার টাকায়। পশুপতিবাবু ভাবার জন্য সময় চেয়েছিলেন।

তাঁকে দেখে নিতাই তাসের আসর থেকেই একেবারে আপনজনের মতো চেঁচিয়ে উঠল, "পশুপতি, এসে গেছ। বাঃ, আমি তো তোমার জন্য ভেবে মরছিলুম। পশুপতি তো ফিরতে এত রাত করে না। তা হয়েছিল কী জানো, চায়ের চিনি আর দুধ ছিল না। তা আমি গিন্নিকে বললুম, সে কী কথা দুধ চিনি নেই তো কী হয়েছে? আমার পশুপতিভায়ার ঘরেই তো রয়েছে। সে তো আর আমার পর নয়। তাই দরজাটা খুলতে হয়েছিল ভায়া, কিন্তু কিছু মনে কোরো না।"

পশুপতি ঘরে তালা দিয়ে গিয়েছিলেন। দেখলেন, তালা ভাঙা। ঘর হাঁহাঁ করছে, খোলা। এর জন্য কী বলা যায় তা পশুপতি শত ভেবেও ঠিক করতে পারলেন না। অন্ধকার ঘরে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন। ওপরে ধুপধাপ শব্দ, কান্না, চিৎকার, ঝগড়া, বাসন ফেলার আওয়াজ, সবই তাঁর কানে গরম সিসে ঢেলে দিচ্ছিল। ভারী শান্তিতে ছিলেন এতদিন। এবার না নিজের ভিটে থেকে বাস তুলতে হয়।

একটু বাদেই নিতাইয়ের বড় মেয়ে হলুদ আর নুন চাইতে এল। তার-পর মেজো ছেলে এসে দেশলাই ধার নিয়ে গেল। দশটা নাগাদ নিতাই এসে দশটা টাকা ধার চাইল, মাসের শেষেই দেবে।

পশুপতিবাবু কষে ভাবতে লাগলেন। ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হয়ে না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়লেন।

মাঝরাতে দরজায় ঘা পড়ল। পশুপতি উঠে দরজা খুলে দেখল, ভারী

অভিমানী মুখ করে নিতাই দাঁড়িয়ে।

"কাজটা কি ঠিক করলে পশুপতি-ভায়া ?"

পশুপতি অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, কোন কাজের কথা হচ্ছে।

নিতাই মাথা নেড়ে বলল, "ভাড়া না হয় আর দশ টাকা বাড়িয়েই দিচ্ছি। তা কথাটা তো মুখে বললেই পারতে। বাথরুমের দরজার আড়ালে ঘাপটি মেরে থেকে লাথি মারার কোনও দরকার ছিল কি ? কাজটা কি ঠিক হল হে পশুপতি ?"

পশুপতি খুব ভাবছিলেন, কিন্তু কিছু বুঝে উঠতে পারছিলেন না!

নিতাই দুঃখের সঙ্গে বলল, "আর খুব আস্তেও মারোনি। আমার কাঁকালে বেশ লেগেছে। যা'হোক, ওই ষাটই দেব, মনে রাগ পুষে রেখো না ভাই।"

পশুপতিবাবু কী বলা উচিত ভাবতে লাগলেন। নিতাই চলে গেল।

পশুপতিবাবু যখন ডনবৈঠক করছিলেন, এই সময়ে হঠাৎ নিতাইয়ের বউ একটা খুন্তি হাতে দরজায় এসে দাঁড়াল।

"বলি পশুপতিবাবু, আপনার আক্কেলখানা কি বলুন তো! ঢের-ঢের বাড়িওয়ালা দেখেছি বাপু, আপনার মতো তো দেখিনি? কোন্ আক্কেলে আপনি আমগাছে উঠে রান্নাঘরে ঢিল ছুঁড়ছিলেন ? তাও ছোট-খাটো ঢিল নয়, অ্যাত বড় বড় পাথর। তার দু'খানা আমার ভাতের হাঁড়িতে পড়ে গরম ফ্যান চলকে আমার হাতে ফোসকা ধরিয়েছে। চারখানা কাচের গেলাস ভেঙেছে। একটা ঢেলা পড়েছে ডালের বাটিতে। বলি এসব কী হচ্ছে ? আপনি কি পাগল না পাজি ?"

পশুপতি একবারও সদুত্তর দিতে পারলেন না, তবে ভাবতে লাগলেন।

নিতাইয়ের বউ চোখ পাকিয়ে বলল, "আমিও দুর্গা-দারোগার মেয়ে। এই বলে দিলুম, ফের ঢিল মারলে আমিও দেখে নেব"

পশুপতি শুকনো মুখে কাজে বেরোলেন। রান্নাবান্না আর করলেন না। হোটেলেই খেয়ে নেবেন দুপুর বেলাটায়।

সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরতেই দেখেন, নিতাইয়ের তাসের আড্ডা নেই। নিতাই একা শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

পশুপতি কাছে যেতেই নিতাই কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল, "গায়ের জোর থাকলেই কি গুণ্ডামি করতে হবে ভাই ?"

পশুপতি ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন।

নিতাই বলল, "না হয় তাসের আড্ডায় একটু গোলমাল হয়েই ছিল। তাস নিয়ে বসলে ওরকম হয়, তা বলে লাঠিসোঁটা নিয়ে ভদ্দরলোকের ছেলেদের ওপর চড়াও হওয়াটা কি ঠিক? তাস খেলা তুমি যে পছন্দ করো না, এটা আমাকে বলে দিলেই তো হতো।"

পশুপতি মাথা চুলকোতে লাগলেন।

নিতাই ধরা গলায় বলল, "আমি অফিস থেকে এসে শুনি, তাসুড়েরা সব বসে ছিল আসর জমিয়ে আর হঠাৎ নাকি তুমি একেবারে প্রলয় নাচন লাগিয়ে দেওয়ায় তারা সব পিঠ বাঁচাতে সরে পড়ে। আর তাছাড়া শিবুর কান ওভাবে মলাও তোমার ঠিক হয়নি। আমার সেজো ছেলে দুষ্টু ঠিকই, কিন্তু সেও তোমার ছেলের মতই, ভাই কানটা শুধু ছিঁড়ে দিতে বাকি রেখেছ, ক্যানেস্তারা বাজানো তুমি যে পছন্দ করো না তা তো আর বেচারা জানত না।"

পশুপতি খুবই অবাক হলেন এবং ভাবতে লাগলেন।

একটু রাতের দিকে পশুপতি রান্না করতে বসে হঠাৎ শুনতে পেলেন, ওপরে একটা তুমুল চেঁচামেচি আর দৌড়ঝাঁপ হচ্ছে। কে একজন চেঁচাল, "বাবারে, মেরে ফেললে।" আর একজন বলে উঠল, "এসব কি ঠিক কাজ হচ্ছে?" আর একজন, "ও কী, পড়ে যাবে যে খাট থেকে!" আর একজন, "আমার বিনুনিটা যে কেটে দিল, ও মা!" সিঁড়ি দিয়ে কে যেন দৌড়ে নামতে নামতে বলল, "ছেড়ে দাও ভাই, মাপ করে দাও ভাই, ঘাট হয়েছে। কালই সকালবেলায় তোমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাব আর জীবনে এমুখো হব না!"

পশুপতি ভাবতে ভাবতে খেলেন, ঘুমোলেন।

সকালবেলা উঠে দেখলেন, বাড়ি ফাঁকা, নিতাই কাকভোরেই বাড়ি ছেড়ে সপরিবারে চলে গেছে।

পশুপতি অনেকক্ষণ ভাবলেন। ভেবে যদিও তিনি কোন কূলকিনারা করতে পারছিলেন না, তবু ব্যায়াম করতে করতে তিনি মাঝে-মাঝে ফিক ফিক করে হেসে ফেলছিলেন।

বদনের অমৃতফল

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটদাদু বদনকে এবার সঙ্গে করেই নিয়ে এলেন। সারা রাস্তায় বদন শুনেছে, ছোটদাদু কেবল বিড়বিড় করে বকছেন। তার বাবাকে গালমন্দ করছেন। সকালে বের হয়েছিল তারা। মা চিঁড়া-গুড় পুঁটলিতে বেঁধে দিয়েছিল। নদীর পাড়ে বসে দাদু আর সে চিঁড়াগুড় খেয়েছে। দাদু নদীর জলে ডুব দিয়ে আহ্নিক সেরেছেন। ভিজা কাপড়েই বসে ছিল দু'জনে মুখোমুখি। চিঁড়া-গুড় জলে ভিজিয়ে নদীর পাড়ে বসে খাওয়ার মজা, সে প্রথম টের পেয়েছিল।

ছোটদাদুর কী মর্জি হল কে জানে! এবারে কর্মস্থল থেকে ফিরে বদনদের বাড়ি হয়ে আসার মুখেই মেজাজ খাপ্পা। বদন তখন পুকুর পাড়ে আমগাছে বন্ধুদের সঙ্গে ওয়া-ওয়া খেলছিল। ছোটদাদুকে দেখেই গাছের ডাল থেকে লাফ, সে ছুটে এসে বলেছিল, "মা, মা, ছোটদাদু আসছে।"

বদনের জ্যাঠা শিবেশ্বর ভাইয়ের মতিগতি বুঝতে পারতেন না। কোথাও কাজে লাগিয়ে দিলে টিকতে পারেন না। কাজকর্মে উৎসাহ কম। দু'হপ্তা বাড়ি ছাড়া থাকলেই মাথা খারাপ। রোজগার না করলে সংসারে কে দ্যাখে। শিবেশ্বর ডেকে বলেছিলেন, "আমি আর টানতে পারছি না। তুই তোর ব্যবস্থা কর।"

বদনরা তিন ভাই, এক বোন। বাবা তাঁর দাদার কথা শুনেই জলে পড়ে গিয়েছিলেন। একান্ন ছিল। পৃথগন্ন হয়ে গেলে বাবা তাঁর প্রাথমিক দায়িত্ব হিসাবে স্কুল থেকে নাম কাটিয়ে বদনকে ঘরে বসিয়ে রাখলেন। ঈশ্বর ভরসা, কপালে যা আছে হবে। বাবা কপাল ভরসা করে বসে পড়লেন ঠিক, বাদ সাধলেন ছোটদাদু। বাবার খুড়োমশাই খবর পেয়ে চলে এসেছিলেন। জমিদারি সেরেস্তায় তাঁর কাজ। ভাইপোটিকে ডেকে বললেন, "তোমার কি মাথা খারাপ! এতগুলি পেট চলবে কি করে।

জমিজমা তোমার ভাগে কত! বছরকার খোরাকি চলবে না, কী সাহসে চাকরি ছেড়ে বসে গেলে!"

বাবা মাথা গোঁজ করে খুড়ামশাইয়ের পায়ের কাছে বৈঠকখানায় বসে ছিলেন। তিনি যত তড়পাচ্ছেন, বাবা ততো কেঁচো হয়ে যাচ্ছেন। বাবার হেনস্থা দেখে বদনের খুব খারাপ লাগছিল। ছোটদাদু শেষে বলেছিলেন, "তুমি কি অমানুষ! সংসারের দিকে তাকাবে না। বদনের পড়াশোনা বন্ধ করে দিয়েছ। ওসব চলবে না। বদনকে নিয়ে যাচ্ছি! তুমি বাবুদের বাড়ি চলে যাবে।" বলে একটা চিরকুটে কি লিখে দিয়েছিলেন। আরও বলেছিলেন, "আমি যদ্দিন আছি তোমার বাঁদরামি সহ্য করব না। বাবুদের বাড়ি থাকবে। আমি তো আছি। আদায়পত্র করে বেড়ালেও দুটো পয়সা হবে! খেতে পাবে। চল্লিশ টাকা মাইনে পাবে। চল্লিশটা টাকা তোমাকে কে দেয়! শিবেশ্বর বাইরে যাবে না। ঘরমুখো মন। বুঝবে না, ছেলেমেয়েগুলি মানুষ হবে কী করে। পালাগান শিখলে পেট ভরবে!"

বাবা বলেছিলেন, "বদন কি থাকতে পারবে?"

"পারবে।"

মাকে ডেকে বলেছিলেন, "বউমা বদনকে আমি নিয়ে যাব। পানাম ইস্কুলে ভর্তি করে দেব। তারিণী পানাম ইস্কুলের মেম্বর। ওকে বলেকয়ে যদি ফ্রি করিয়ে নিতে পারি।"

বদন সব শুনছিল বাইরে দাঁড়িয়ে। মাকে ছেড়ে, ভাই-বোনদের ছেড়ে পাঁচ ক্রোশ দূরে ছোটদাদুর বাড়ি সে চলে যাবে ভাবতেই চোখে জল এসে গিয়েছিল। বাড়ির গাছপালা, পাখি, তার প্রিয় কয়েতবেল গাছ, আম জাম জামরুল গাছ, এবং নদীর চরে গোল্লাছুট কিংবা শীতে মটরশুটির গাছ চুরি করে আগুন জ্বালিয়ে খাওয়ার মধ্যে সে যে এক আশ্চর্য পৃথিবীর বাসিন্দা ছিল, দাদুর এক কথায় উড়ন্তঘুড়ির মতো ভো-কাট্টা।

ছোটদাদু বাড়ি এসে বললেন, "বউঠান, বদনকে নিয়ে এলাম। সে এখানেই থাকবে। দিব্য মানুষ না। অপদেবতা। ছেলেটার পড়া বন্ধ করে দিয়েছে।"

বদন তার পাসিংশোর বাক্সে বই খাতাপত্র নিয়ে এসেছে। বগলে পুঁটলি। এ বাড়িতে সে আগেও এসেছে! সেজোঠাকুমার মেয়ে অলপিসির বিয়েতে এসেছিল। মা-বাবা, ভাই-বোনেরা সব। তখন একরকম ছিল—

বাড়ি-ভর্তি লোকজন, বড় পুকুরে জাল ফেলে মাছ তোলা, রাতে পেট্রোম্যাকসের আলো—বাড়িটাকে কেমন রূপকথার জগৎ বানিয়ে ফেলেছিল। চার ভিটেতে বড়-বড় চারটা টিন কাঠের ঘর, ভিতরের দিকে রান্নাবাড়ি, ইঁদারা, আর সব তালগাছ, পেয়ারা গাছ। গ্রামটাও সে ঘুরে দেখেছে দাদাদের সঙ্গে। তখন খারাপ লাগেনি, এখন মনে হয় ঘর-বাড়ি সব যেন তার দিকে তাকিয়ে আছে। বলছে, বেচারা !

ছোটদাদুর সঙ্গে বারান্দায় উঠে এলে বললেন, "প্রণাম করো। তোমার ন'কাকিমা। প্রণাম করো, তোমার সেজোঠাকুমা।" সবাইকে সে প্রণাম করেছিল। সে চেনে। ন'কাকিমা শহরের মেয়ে। সে তার ঘরে সেবার ঢুকে তাজ্জব বনে গিয়েছিল। সুন্দর চকচকে টেবিল, চেয়ার। রং বেরঙের কাগজের ফুল দিয়ে, ডিমের খোসা দিয়ে ফুলঝুরি। হাওয়া খেলে, দোলে। তার ঘর কোনটা সে জানে না। কোথায় থাকবে, কার সঙ্গে শোবে, জানে না।

সে আসায় ন'কাকিমা খুশি না। ছোটদাদুর মাথা খারাপ এমনও ভাবতে পারে। মুখে বলার সাহস নেই। ছোটদাদুর মর্জিই শেষ কথা। এ-বাড়িতে, কি তাদের বাড়িতে তিনিই সব। ভিন্ন করে দেওয়ার ব্যাপারেও বড়জ্যাঠামশাই ঠিক পরামর্শ নিয়েছেন, ছোটদাদুই হয়তো বলেছেন, "দে ভিন্ন করে বুঝুক। কবে দায়িত্ব নিতে শিখবে।" বাবাকে সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্যও হয়তো ছোটদাদু তলে-তলে এই ব্যবস্থা করেছিলেন, কিংবা মনে হয় তাকে এখানে নিয়ে আসার বিষয়টাও মাথায় আগে থেকেই তাঁর ঠিক করা ছিল।

সে চঞ্চল স্বভাবের, এখন দেখলে কে বলবে ! অথচ বালক। কেবল বড়-বড় চোখে দ্যাখে। বাড়ির কথা মনে হলে সে গোপনে চোখের জল ফেলে, কেউ টের পায় না, বদন গোয়ালবাড়ির পিছনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। নিরঞ্জনকাকা দেখে বলেছিল, "কী রে বদন, এখানে কী করছিস চান খাওয়া হয়েছে ?"

সে দাদুর সঙ্গে চান করেছে, দাদুর সঙ্গে খেয়েছে। শহরের বলে ভাই বোনগুলি এখনও তার সঙ্গে ঠিক মিশে উঠতে পারছে না। কেবল ঝিনুক তাকে এক ফাঁকে ডেকে নিয়ে চুরি করে নাড়ু খেতে দিয়েছিল। কী সুন্দর হাসি তখন বদনের মুখে। ঝিনুক আড়ালে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল —কেউ যদি দেখে ফেলে। বদনকে নাড়ু দিল কে ?

ঝিনুক তার দু'ক্লাস নীচে পড়ে। কাছারি-বাড়িতে ঝিনুকের ইস্কুল। ঝিনুক তার আঁকা ছবি দেখিয়েছে। একটা গাছ, প্রজাপতি উড়ে যাচ্ছে, ফুলের বাগান, তারপর মনে হয় কোনও শস্যক্ষেত্র আঁকতে চেয়েছে ঝিনুক। ঝিনুক এত সুন্দর আঁকে। বিশ্বাসই হয় না।

বদন বলেছিল, "ঝিনুক ছবি আঁকলে কী হয়। আমাকে দিবি?" বদন জীবনেও রং-বেরঙের পেনসিল দ্যাখেনি। সে পেনসিলগুলি ছুঁয়ে দেখতে চায়। ছবি আঁকলে কী হয় সে জানে না।

লাল-নীল রঙের পেনসিল দিয়ে সুন্দর ছবি আঁকা যায় বদন জানত না। ঝিনুক বলত, "এই দ্যাখো একটা পাখি!"

ঝিনুক দুটো টান দিত। ঠোঁট বাঁকিকে আছে পাখিটা, আসলে পাখি কি অন্য কিছু, না কিছুই না, দুটো আঁকাবাঁকা রেখা, সে কিছু টের পেত না। কিন্তু ঝিনুক বললে পাখি, ঝিনুক বললে ফুল। গাছ-পাতা, কখনও গোলাপ। একটা বেজি এঁকে বলেছিল, "এই বদনদা, বেজি মনে হচ্ছে না!"

আসলে বদন খুব মুগ্ধ এই লাল-নীল রঙে। কখনও হলুদ, সবুজ, কমলা, সব রং মিশে গেলে বেজি না হোক কিছু একটা হয়েছে মনে হত তার। বেজি বললে বেজি, মরা ডাল বললে ডাল, জঙ্গল বললে জঙ্গল। সেও চায় এই রঙের বাহারের মধ্যে ডুবে যেতে, ঝিনুকের মতো ছবি আঁকতে। ছোটদাদুকে সে বলেছিল, "এক বাক্স রঙের পেনসিল আমার চাই।"

ছোটদাদু পছন্দ করেন না এসব। ঝিনুকের মামা জন্মদিনে উপহার দিয়ে গেছে। তাই ঝিনুক ছবি আঁকে। দাদু বলতেন, ছবি আঁকলে পড়া হয় না। ঝিনুকের জন্মদিন আবার কবে বদন জানে না। তার আশা ঝিনুকের আবার জন্মদিন হবে, তখন একটা রঙের বাক্স দিয়ে যাবেন তার মামা। ঝিনুকের কাছে পুরনো রঙের পেনসিল বাতিল হয়ে যাবে। সে যদি চায় তবে পেনসিলের বাক্সটা ঝিনুক না দিয়ে পারবে না।

ঝিনুক সকালবেলায় উঠেই বাগান থেকে ফুল তোলে, বাড়িতে বিগ্রহ আছে। ঠাকুরঘরটার চারপাশে শ্বেত জবা, রাঙা জবার গাছ। পরে পুকুর। তার পাড় ধরে গেলে সরকারদের লাল ইটের দালান, নীল রঙের ডাক বাক্স। সাদা রঙের ঘোড়া। তারিণী-ডাক্তার ঘোড়ায় চড়ে রুগি-বাড়ি যান।

এখানে আসার পর বদন যে একা না, স্কুলে যেতে-আসতে বুঝে

ফলেছে। দু'ক্রোশ দূরে স্কুল। এক সকালে ছোটদাদু তাকে নিয়ে সরকারবাড়ি হাজির, "তারিণী, নিয়ে এলাম। স্কুলে ভর্তি করে দিলাম। ক্লাস সেভেনে ভর্তি করে দিলাম। আমার ভাইপোটি তো অপদেবতা। কাজে লাগিয়ে দিয়েছি। কদ্দিন থাকবে কে জানে। ফ্রি করে দিলে পড়াটা বদনের হয়।"

বদনের কাছে তারিণী-ডাক্তারের বাড়িটা কেমন ছিমছাম মনে হয়। ইটের লম্বা লাল দালান, সামনে লম্বা বারান্দা—তারপর সামনে সবুজ ঘাসের মাঠ। গ্রীষ্মের ছুটি হলে বদনের বাড়ি যাওয়ার কথা। তার আগে-ভাগে দরখাস্ত দিতে হবে। সে দরখাস্ত নিয়ে গেছে। গিয়ে দেখে ডিসপেনসারির বারান্দায় তারই বয়সী ছোট্ট একটা মেয়ে। ইজিচেয়ারে বসে পা দোলাচ্ছে। পায়ে রুপোর টায়রা। কানে সোনার মাকড়ি। সাদা ফ্রক গায়। পরির মতো দেখতে সুন্দর। এত বড় বাড়িটা খাঁ-খাঁ করছে। দরজা-জানলা বন্ধ। সামনে খালপাড়, ছাড়া-বাড়ির বনজঙ্গল, অর্জুন গাছের বন, তারপর ঘোষেদের পাড়া, তারপর আদিগন্ত মাঠ।

ঠা-ঠা রোদ্দুরে তার বোধহয় আসাই উচিত হয়নি। তার চেয়ে ছাড়া-বাড়িতে ঘুরে বেড়ালে গাছতলায় দুটো-একটা পাকা আম পাওয়া যেত। কিন্তু ছোটদাদু দরখাস্ত লিখে দিয়ে গেছেন। ওটা দিয়ে আসার কথা ছিল পেনাকাকার। কাকা গেছে বারদির হাটে। সকাল-সকাল রওনা হয়ে গেছে। যাবার আগে বলে গেছে, "তারিণীকাকাকে দরখাস্তটা দিয়ে আসবি।" সে সকালে ঝিনুকের সঙ্গে জলে সাঁতার কেটেছিল, ঝিনুক গাছে চড়তে জানে না, সাঁতার কাটতে জানে না। কোথায় যুদ্ধ চলছে বলেই ন'কাকা ঝিনুকদের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। ঝিনুক সাঁতার জানে না শুনে বদন অবাক হয়ে গিয়েছিল। গাছে উঠতে জানে না ঝিনুক এটাও তার কাছে ভাল লাগেনি। ঝিনুককে সাঁতার শেখাতে গিয়ে বেলা হয়ে গিয়েছিল। বৈশাখ মাস, পুকুরের কোথাও কোমর-জলের বেশি ছিল না। ঝিনুকের পেটের নীচে দু'হাত বিছিয়ে বদন দাঁড়িয়ে থাকে। ঝিনুক দু'হাত, দু'পা নাড়ে। এই করে ঝিনুক একটু-আধটু সাঁতার শিখে ফেলেছে। বর্ষা এলে খাল বিল পুকুর ভেসে যাবে। তখন যতদূর চোখ যায় শুধু জল, কথা আছে বদন তখন ঝিনুকের সঙ্গে সাঁতার কেটে নদী পার হয়ে যাবে।

দরখাস্তটা দিয়ে আসতে হবে বদনের মনেই ছিল না। দুপুরে খেয়ে

নিজের ঘরে বসেই দেখল বইয়ের নীচে চাপা দেওয়া আছে দরখাস্তটা। সে ইস্ বলে জিভে কামড় দিয়েছিল। পেনাকাকা এসে দেখলেই বলবে, "তোর কিচ্ছু হবে না বদন। নিজের ভালটাও বুঝিস না! বাবা আসুক বলছি।" বেশি রেগে গেলে কান মলে দেবে। বলবে, "শয়তান, বাঁদর। কেবল সারাদিন জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো। ঝিনুককে নিয়ে কোথায় যাস!"

ঝিনুককে নিয়ে সে যায় আমগাছতলায়, পাকা আম খুঁজে বেড়ায়।

সে গাছে চড়ে বেড়ায়। ঠিক হনুমানের মতো গাছের ডালে ঝুলে থাকতে পারে। ঝিনুকের যেমন রঙের বাক্স আছে, ঝিনুক যেমন ছবি এঁকে ট্যারা বানিয়ে দেয় তাকে, আর কত গল্প শহরের, হাওড়ার পুলের গল্পটা যখন বলে তখন সে মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ট্রামগাড়ির কথা বললে, সে ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায়। সে কিছুই দ্যাখেনি। রেলগাড়িও না। বাস ট্রাম মোটরগাড়ি সে দ্যাখেনি। তাদের বাড়ি থেকে নরসিন্দি স্টেশন দশ ক্রোশ, বারদির স্টিমারঘাট চার ক্রোশ। ঝিনুক স্টিমারে চড়ে দেশের বাড়িতে এসেছে। ইলিশমাছের ঝোল-ভাত খেয়েছে স্টিমারের ডেকে বসে। যতদূর চোখ যায় নদী আর তার কালো জল, বড় ঢেউয়ের মাথায় পাখি এসে উড়ে বসে।

এত সব তাজ্জব খবর ঝিনুক তাকে দিলে সে কেমন মনমরা হয়ে যায়। গাছে চড়ে সে দেখায় তার কসরত। জলে নেমে ডুবে-সাঁতার দিয়ে সে দেখায় তার কসরত। সে পুকুরের জলে ডুব দিয়ে ভেসে ওঠে, হাতে কই মাছ। ছুঁড়ে দিয়ে বলবে, "ধর।" মেনা মাছ ছুঁড়ে দেবে। ঝিনুক কই মাছ ধরতে হয় কী করে জানে না। জল থেকে উঠে এসে কই মাছের মাথার দিকটায় হাত দিয়ে ধরতে হয় শিখিয়ে দেয় বদন। কিংবা টোপ ফেলে বড় শোল মাছ, একবার বিশাল একটা বোয়াল মাছও তুলে চিৎকার করেছিল, "ঝিনুক শিগ্গির আয়।" আর ঝিনুক তখন আরও আশ্চর্য হয়ে যায় বদনদা কী করে বিশাল মাছটাকে খালের জল থেকে তুলে এনেছে।

ঝিনুক শহরের গল্প বলে ট্যারা বানিয়ে দেয়, সে মাছ ধরে, সাঁতার কেটে, গাছে চড়ে ঝিনুককে ট্যারা বানিয়ে দেয়। সেই ঝিনুকই একদিন সাঁঝবেলায় বলেছিল, "বদনদা, বাড়ি চলো। মা বকবে। জানো বদনদা, সরকার বাড়ির অর্জুনগাছটা ভাল না। রাত-বিরেতে যেও না। তাড়াতাড়ি চল।"

"কেন ওখানে কী আছে?"

"ওখানে কে বসে থাকে রাতে। ছোটদাদু বলেছে, একা একা পোড়ো-বাড়িতে যাবে না।"

তাদের পুকুর পাড় ধরে গেলে দত্তদের আমবাগান, মজা পুকুর, বেতের জঙ্গল, তারপর পোড়োবাড়ি পার হয়ে সেই অর্জুন গাছ। গাছটা পার হয়ে গেলে দু'পাশে লটকন গাছের বন। এবং তার ভিতর দিয়ে হেঁটে গেলে তারিণী-ডাক্তারের বাড়ি। তার টিনের ঘরে ডিসপেনসারি। এমন নির্জন দুপুরে তার আসা উচিত হয়নি, বদন টের পেতেই ফিরে যাবে ভাবল। সেই সাদা ফ্রক-পরা মেয়েটা কে জানে না! কে জানে যিনি অর্জুন গাছের নীচে থাকেন তিনিই ঝিনুকের মত সেজেগুজে বসে আছেন কি না।

হাতে তার একটা লম্বা দরখাস্ত। এতবড় বাড়িতে আর কেউ নেই। বাড়িটার চারপাশে সব বিশাল রসুন গোটার গাছ। ঝুমঝুম শব্দ হচ্ছে কোথাও। সে লাফিয়ে পালাবে ভাবল। আর তখনই মেয়েটা বলল, "তুমি বদনদা না! ঝিনুকের দাদা হও! কী এনেছ?"

বদন যে কী করে! সামনের সবুজ মাঠ পার হয়ে পোস্টাফিস। লাল রঙের টিনের চাল। দরজা-জানালা তারও বন্ধ। কেবল কাক ডাকছে। দূরে ঘুঘু পাখির ডাক! কেমন নিঝুম হয়ে আছে সবকিছু! সে ভয়ে ভয়ে বলল, "তুমি কে?"

"আমি লিচু!"

"লিচু এখানে বসে কী করছ?"

"আম পড়ার শব্দ শুনছি।"

তা এখন আমের সময়। আম পড়তেই পারে। টুপটাপ হওয়ায় আম পড়লে ঠা-ঠা রোদ্দুরে গাছতলায় বসে থাকার কথা।

"তারিণীদাদা কোথায়?"

"বাবা ঘুমোচ্ছে?

"সাদা রঙের ঘোড়া?"

"আস্তাবলে ঘাস খাচ্ছে।"

এই বলে যেই না লিচু লাফ দিয়ে বারান্দা থেকে নেমে এল বদন চোঁ-দৌড়। এত সুন্দর যখন, পরি ছাড়া কেউ হতে পারে না। শুধু সে তার পাখা দুটো দ্যাখেনি। পরিদের গল্প সে খুব বিশ্বাস করে। পরিদের বাবা-মা'রা রাতে নেমে আসে পৃথিবীতে। যখন সবাই ঘুমিয়ে থাকে, তখন তাদের দেখা যায়। ছোট শিশুদের আদর করতে ভালবাসে।

ঝিনুকই পরির গল্প বলেছে, ছোটদাদু বলেছেন, "পরিরা ক্ষতি করে না ঠিক, তবে যাকে ভাল লাগে তাকে তাদের দেশে নিয়ে চলে যায়।" সে তো ক্লাস সেভেনে ভর্তি হয়েছে। এইটে ভর্তি হতে পারল না। এত ছোট বয়সে এইটে ভর্তি করতে রাজি না। তা পরিদের দেশটা কীরকম জানা নেই—যতই ভাল হোক, তার বাড়িঘরের মতো না। তার বাবা-মা-ভাই-বোনের মতো এত আদরের কে থাকতে পারে। তার গোপাট, তার নদী, মাঠ, বন এবং বাঁশবাগানের ভিতর ঢুকে গেলে সে যে বদন, সে যে ঠাকুর-বাড়ির সেজোঠাকুরের ছেলে এই খবর আর কারা রাখতে পারে!

সে দৌড়ে এসে দেখল, নিরঞ্জনকাকা বঁড়শি ঠিক করছে। বর্ষা এলেই মেঘনা নদীতে ঢাইন শিকারে যাবে। আষাঢ় শ্রাবণে অমাবস্যা পূর্ণিমার জো-এ ঢাইন মাছ নদীর অতলে বাঁকে-বাঁকে সাঁতার কাটে। এক মনি, দু'মনি বঁড়শিতে গেঁথে গেলে সে নাকি উচাটন শুরু হয়ে যায় নদীতে। মাছ যায়, সুতো টেনে মাছ যত দূরে যায়, তা দশ-বিশ ক্রোশ দূরে নিয়ে গিয়ে অজানা চড়ায় তুলে দেয়। সেই দুঃসাহসিক অভিযানে তাকে এবার নিয়ে যাবে নিরঞ্জনকাকা। সে এসে কী বলবে বুঝতে পারছে না। লিচু কারও নাম হয়! সে তো মাস-দুই হল এখানে এসেছে। তারিণী ডাক্তারের ঘোড়া দেখতে সে গেছে। কিন্তু বাড়িতে লিচু বলে তার বয়সী মেয়ে সে কখনও দ্যাখেনি। এতটুকুন মেয়ে একা-একা ডিসপেনসারির বারান্দায় বসে পা দোলাতে পারে! দরজা-জানালাই বা বন্ধ কেন। কোঠা-বাড়ি গাঁয়ে আর কারও নেই। দরজা-জানালা বন্ধ করে দিলে ঘর অন্ধকার, দিনের বেলায় কী এমন রহস্য থাকে যে, ঘর অন্ধকার করে বসে থাকতে হয়! আর বাইরে একটা ছোট্ট ফুলপরি মেয়ে ভরদুপুরে এমন কী রহস্যে ডুবে যায় যে, বাড়ির মানুষ খবর রাখে না!

বদনের কাছে এ ভারী তাজ্জব ব্যাপার!

ঝিনুক বারান্দায় বসে তখন তার ছোট বোন মন্দার সঙ্গে বাঘবন্দী খেলছে। বদনও পাশে উবু হয়ে বসে গেল। আর বড় বড় শ্বাস ফেলছে। কিছু যে একটা হয়েছে, ঝিনুক মুখ দেখেই টের পায়। দাদাটার জন্য ঝিনুকের একটা কষ্ট তৈরি হয়ে গেছে কখন! বাবা-মা ছাড়া মানুষ বাঁচে! ঝিনুক চাল দিয়ে বদনদাকে বলল, "কোথায় গেছিলে।"

সে কী করে বলবে, গিয়েছিল দরখাস্ত দিতে। গিয়ে দ্যাখে কেউ নেই। কত মানুষজন সরকারবাড়িতে, কেউ নেই। এমনকী আস্তাবলের কদম

শেখও না। শুধু ভরদুপুরে পরির মতো একটা মেয়ে একা ডিসপেনসারির বারান্দায় বসে আছে ; চোখ নীল। চুল নীল। সাদা ফ্রক গায়ে। পায়ে কারুকাজকরা জুতো পর্যন্ত দেখেছে। বাড়িতে কে কবে জুতো পরে থাকে।

বদন ফিসফিস করে বলল, "তারিণীদার বড়িতে না, কী সুন্দর বুঝলি, এ কী রে, কেউ নেই! পরির মতো মেয়েটা ডিসপেনসারি-বাড়িতে বসে আছে একা। সব দরজা-জানালা বন্ধ। ও গেল না বুঝলি। অর্জুন গাছের নীচে ঠিক কেউ আছে। ওই বসে আছে।"

"কে বসে আছে? কী বলছ!"

"কী জানি। বাড়িটা কেমন ভুতুড়ে দেখাচ্ছিল। গাছের ছায়াগুলি হেঁটে বেড়াচ্ছে জানিস। মনে হল পরি।"

ঝিনুক চাল দিতে দিতেই বলল, "পরি না মাথা। কথা বলল না!"

"বলল। লিচু নাম বলল। আমাকে না গিলে ফেলবে মনে হচ্ছিল। আমাকে ধরতে আসছিল। ছুটে পালিয়ে এসেছি।"

ঝিনুক সহসা বদনকে ঠেলা দিয়ে বলল, "তুমি না বদনদা, ইস, তোমাকে নিয়ে পারা যাবে না। তুমি একটা হাঁদা। লিচু এয়েছে। কবে এল। শহরে স্কুল ছুটি হয়ে গেছে তবে। এই চলো।"

"না। তুই যা!"

"চলোই না।"

"না।"

ঝিনুক মন্দাকে নিয়ে যাচ্ছিল, নিরঞ্জনকাকার চোখে পড়ে গেল। রোদে বের হওয়া, হ্যাঁ দাঁড়াও, ডাকছি। নিরঞ্জনকাকা সুতোয় মোম মাথা বন্ধ রেখে ডাকল, "এই কোথায় যাচ্ছিস। হ্যাঁ, ডাকব বউদিকে।"

ঝিনুক নিরঞ্জনকাকাকে ভয় পায় না। তবে মাকে বললে কী হবে জানে না। সেই ভয়। ঝিনুকের মা ঘরে ঘুমোচ্ছে। নিরঞ্জনকাকা বাড়ির চাষ-আবাদ দ্যাখে। পেনাকাকা গার্জিয়ান। পেনাকাকা গেছে হাটে। কাকা যখন বাড়ি নেই তখন যেতেই পারে ঝিনুক। ঝিনুক পাশে দাঁড়িয়ে গেল। বলল, "লিচু এয়েছে! লিচুর কাছে যাচ্ছি, বলবে না কিন্তু! বদনটা না হাঁদা। বলে ভুত।" বলেই হাহা করে হাসতে থাকল ঝিনুক।

বদন বিপাকে পড়ে গেল। ঝিনুকের সঙ্গে ভরদুপুরে বাগানে, জলে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবার আলাদা এক মজা আছে। সেও লাফ দিয়ে নেমে

গেল। উঠোনে, ঝিনুকের পেছনে ছুটল। কিন্তু বাড়িটাতে গিয়ে তারা অবাক, কেউ নেই। ডিসপেনসারি বাড়িটা আলাদা। মাঠ পার হয়ে। সকাল বেলায় রুগির ভিড় থাকে। তবে কেউই থাকবে না কী করে হয়। পেছনে তাকিয়ে ঝিনুক দেখল, বদনদাও এসে গেছে। সে, মন্দা, বদনদা তিনজন, ততটা গা ছমছম করছে না। ডিসপেনসারি-বাড়ি পার হয়ে গেল তারা। মাঠ পার হয়ে গেল তারা। ডান দিকে চন্দনগোটার জঙ্গল ঘেঁষে পাঁচিল, বড় পুকুর। ঘাটলার কিনারে কাঞ্চনফুলের গাছ গাছের ছায়ায় সে বসে। বুকটা বদনের ছ্যাঁত করে উঠল। দিনদুপুরে কেউ নেই। একা। বদন বলল, "ওই দ্যাখ।"

ঝিনুক দৌড়ে গিয়ে পেছন থেকে লিচুর চোখ চেপে ধরল।

"কে, কে?"

ঝিনুক বদনকে ইশারায় কথা বলতে বারণ করেছে। বদনের আর ভয় নেই। লিচু তবে সত্যি ছোট্ট একটা মেয়ে।

ঝিনুক চোখ ছেড়ে দিয়ে বলল, "আমার দাদা না তোকে দেখে ভয় পেয়েছে। তুই নাকি আস্ত ভূত।"

লিচু ফ্রক টেনে বসল। বদন খেপে গেছে ঝিনুকের উপর। এটা তুই ঠিক করলি। আমি ভয় পাওয়ার ছেলে। ইস, লিচু কী না ভাবল। ভূতে ভাবায় লিচু প্রসন্ন না। কেমন চোখ ট্যারা করে বলল, "বদনদা, তুমি সাঁতার জানো?"

"হ্যাঁ।"

বদন যে কোনও অংশে কম নয়, তারা শহরের মেয়ে, সেখানে কারেন্টে পাখা ঘোরে, বিজলী বাতি জ্বলে, সেখানে বাস-ট্রাম যায়, কিন্তু সেও সাঁতার জানে, গাছে চড়তে পারে, সে ঘুড়ি বানাতে পারে। দশ ক্রোশ পথ হেঁটে সে ছোটকাকুর সঙ্গে এসেছে—সে ছবি আঁকতে জানে, তবে তার মতো জলে-জঙ্গলে কেউ হেঁটে গেলে যে দুরন্ত ছবি হয়ে যেতে পারে, কে বিশ্বাস করবে। তার ইচ্ছে হল, এখনই জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কেটে দেখিয়ে দেয়, সে শুধু সাঁতারই জানে না, জলে ডুব দিয়ে পুকুরের তলা থেকে মাটিও তুলে আনতে পারে। জলের নীচে শ্যাওলার মধ্যে সে মাছ হয়ে যেতে পারে। ঝিনুকের দিকে তাকিয়ে লিচু বলল, "দিদিমা মারবে। জলে আমার আংটিটা পড়ে গেছে জানিস।" তারপর বদনের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসল। "আমি ভূত। দ্যাখো তুমি কী।"

বদন বলল, "কোথায় পড়েছে ?"

"ওই যে দেখছ। কাঞ্চনফুল পাড়তে গিয়ে আংটিটা জলে পড়ে গেল।"

বদন মুহূর্তের মধ্যে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে জলে ডুবে গেল। দু'হাতে কাদা-মাটি ছুঁড়ে দিচ্ছে। বেশ গভীর কালো জল। সে ডুব দিচ্ছে, আর ভেসে উঠছে। পাড়ে মন্দা, ঝিনুক আর লিচু দাঁড়িয়ে। বদনের চোখ লাল হয়ে গেছে। কী ঠাণ্ডা জল, সে সাঁতার কেটে এখানে-সেখানে ভেসে যাচ্ছে। লিচু কোনও নির্দিষ্ট জায়গা দেখাচ্ছে না। একবার বলছে, এখানে। একবার বলছে, ওখানে। সারা পুকুর ঘুরিয়ে মারছে।

এত খুঁজেও বদন আংটি পেল না।

লিচু ঝিনুকের কানে কানে বলল, "তোর দাদাটা সত্যি হাঁদা। কাঞ্চন-ফুল পাড়তে গেলে আংটি জলে পড়বে কেন! ঝিনুক নিজে তার বদনদাকে হাঁদা বলতে পারে, তাই বলে লিচু বলবে। সে বলল, তোর সঙ্গে আড়ি। বদনদাকে হাঁদা বললি কেন। না পেলে কী করবে!"

লিচু বলল, তোর দাদার সঙ্গে মজা করলাম। আমাকে দেখে পালাল কেন ? আমি বাঘ না, ভাল্লুক। আমি কেমন ভূত বুঝুক।"

বদনের মনে হল, শহরের মেয়েরা ভারী ফাজিল হয়। মিছে কথা বলায় বদন রাগ করল ঠিক, কিন্তু সে যে কত ভাল সাঁতার জানে, লিচু মজা না করলে দেখাবার সুযোগ পেত না। ঝিনুক মুখ গোমড়া করে ফেলল। তার বদনদাকে নিয়ে মশকরা। তোর আংটি হারিয়েছে। মিছে কথা বলে আমার সরল সহজ দাদাটাকে জলে নামিয়ে ছাড়লি। যদি কিছু হয়। ঠাণ্ডা লেগে জ্বর-জাড়ি হয়। কে দেখবে।

কিন্তু বদন ভারী হৃষ্টচিত্তে বলল, "পুকুর পার হয়ে যেতে পারি জানো। দেখবে ?"

ঝিনুক বিরক্ত। সে বলল, "না, দেখিয়ে আর কাজ নেই। তুমি আর লিচুর সঙ্গে কথা বলবে না। কথা বললে আমার মরা মুখ দেখবে।".

বদন পড়েছে ফ্যাসাদে। "তা মজা করেছে বলে তুই এত রেগে গেলি ঝিনুক। এমন পরির মতো মেয়ে, খারাপ হবে কেন ?"

হঠাৎ কী মনে হল লিচুর কে জানে। সে পাঁচিল টপকে ভিতরে চলে গেল।

ঝিনুক বলল, "চলো বদনদা।"

কিন্তু বদনের যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। এত বড় বিশাল বাড়ি, ওদের

কোথায় কাঠগোলা আছে কোন শহরে, কাঁচা পয়সা, আর সাদা রঙের ঘোড়া, নীল রঙের ডাকবাক্স, সব মিলে কেমন এক রূপকথার মেয়ে মনে হয় লিচুকে।

"দাঁড়িয়ে থাকলে কেন, যাবে না ?" বলে হাত টেনে জোর করে নিয়ে যেতে চাইল বদনকে।

বদন পাঁচিলের দিকে তাকিয়ে আছে। যেন লিচু তাদের দেখে চলে যেতে পারে না। সে এক্ষুনি ফিরে আসবে। এলও ঠিক। হাতে লাল-টুকটুকে দুটো আম। সে আম দুটো বদনকে দিয়ে বলল, "খাবে।"

ঝিনুক রাগে গরগর করছে। গোরু মেরে জুতো দান। আম দুটো পেয়ে বদনদা কী খুশি। ঝিনুক ভাবল এ কেমন ছেলে রে। মান-অপমান বোধ নেই। সঙ্গে সঙ্গে খেতে শুরু করেছে। হ্যাংলা স্বভাবের।

ঝিনুক আর তার রাগ সামলাতে পারল না। বদনদার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হাত থেকে কেড়ে নিতে গেলে বদন কিছুতেই দিতে চাইল না। আঁচড়ে-খামচে বদনদাকে ক্ষত-বিক্ষত করে আম দুটো কেড়ে জলে ফেলে দিয়ে এক দৌড়। বদন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে। কী করবে এ-মুহূর্তে বুঝতে পারছে না। সারা শরীর জ্বলছে।

লিচু বলল, "আবার আসবে বদনদা। মিষ্টি আম দেব।" বদন মাথা নিচু করে বলল, "আচ্ছা।" তারপর ভারী বিমর্ষ হয়ে গেল। ঝিনুক তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করল কেন বুঝতে পারছে না।

বাড়ি ফিরে দেখল ঝিনুক ঘরে শুয়ে আছে। বদন তার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। কাকা এসে যদি শোনে দুপুরের রোদ্দুরে টো-টো করে ঘুরে বেড়িয়েছে, তবে রক্ষে থাকবে না। আর তখনই কে যেন পা টিপে-টিপে তার ঘরে ঢুকে গেল। ঝিনুক! কাছে এসে বলল, "দেখি হাত। দেখি।" বলে জামা তুলে যেখানে নখের দাগ ফুটে উঠেছে, সেখানে মলম মাখিয়ে দিল। কিছু বলল না।

তারপর ঝিনুক বিকেলবেলায় ঘর থেকে দুটো পাকা আম নিয়ে এল গোপনে। বদনদা গাছ থেকে আম পেড়ে দেয়। ঝুড়ি ভর্তি আম ঘরে। মা আমসত্ত্ব দেয়। ভাল আম বিকেলবেলা তাদের কেটে দেয়। বদনদাকে দেয় টক আম। বদনদা কী খুশি ওই টক আম যখন খায়। বদনদাকে নিয়ে গেল গোয়ালঘরের পেছনটাতে। বলল, "হাত পাতো।" বদন হাত পাতলে ঝিনুক বলল, "তাতাতাড়ি খাও। কেউ দেখে ফেলবে।"

বদন আম দুটো নিয়ে গন্ধ শুঁকল। মাথার উপর গাব গাছের ঘন

ছায়া। ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাসে বদনের মেজাজ প্রসন্ন। আম ছুলতে গিয়ে কত কথা বলছে আহ্লাদে। ছুলছে আর ঝিনুকের দিকে তাকাচ্ছে। ছুলছে আর বলছে, "ঝিনুক খাবি, ছাড়া-বাড়ির বড় সিঁদুরে গাছটায় এই এত্ত বড় একটা আম। মগডালে ঝুলছে। বুঝলি, ঢিল মারলাম, পড়ল না। মাতির মা চেল্লাচ্ছে, কে রে আমার বাগানে। আমি ঠিক যাব। গাছটায় বেশি আম হয় না জানিস। একটা দুটো হয়। সানু একবার পেয়েছিল। কী মিষ্টি, কী মিষ্টি। খেলে মনে থাকবে। যে খায় সে তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায়।"

বদন আম ছুলে গপ করে খেল। তারপরই বলল, "এই তুই খা এক কামড়।"

ঝিনুক শহরের মেয়ে। এঁটো খায় না, খেতে নেই। কিন্তু বদনদা এমন সরল নিষ্পাপ মুখে আধখাওয়া আমটা বাড়িয়ে দিয়েছে যে, সে না করতে পারল না। সেও খেল।

সুতরাং ঝিনুক খায়, বদন খায়। এক আশ্চর্য সরোবরে ভেসে বেড়াবার আমোঘ ইচ্ছেটা কাজ করে—বদন সেই মনোহর আম খেতে খেতে বলছে, কী মিষ্টি রে। ঝিনুকের চোখ ছলছল করে উঠেছে। বদনদা তার এমনই। বদনদাকে দিয়ে মা অসাধ্য কাজ করায়। গাছে তুলে দিয়ে বলে, "ডাল কেটে দে" গোরু মাঠে হারিয়ে গেলে বলে, "খুঁজে আন।" অম্লান বদনে ছুটে-ছুটে বদনদা কাজ করে দেয়। বাড়ির সবাইকে খুশি রাখার জন্য বদনদা ছুটে-ছুটে কাজ করে। লিচুর চুলের কাঁটা হারিয়েছে। বদনদা নিয়ে এল পা কেটে। খোঁড়াতে-খোঁড়াতে। চুলের কাঁটায় পদ্ম ফোটা। মিনা-করা সোনার কাঁটা হারিয়ে লিচু এসেছিল চুপিচুপি, "আমার সত্যি হারিয়েছে। মিছে বলছি না। চল খুঁজবি!" কোথায় কী খুঁজেছে, কে জানে।

কোথায় হারাল রাজকন্যার চুলের কাঁটা।

কে যেন বলল, "চন্দনের বনে।"

বদনদা ঢুকে গেল গভীর জঙ্গলে, সেখানে সরকারবাড়ির আবর্জনা যত পড়ে থাকে। বড়-বড় গোসাপ থাকে জঙ্গলে। বদনদার ভ্রূক্ষেপ নেই। কাচে পা কেটে গেল। রক্তপাত। খোঁড়াতে-খোঁড়াতে বলছে, "পেয়েছি, এই নে।" সেই বদনদা যখন যাবে ঠিক করেছে, না গিয়ে ছাড়বে না। রোজই সকালে উঠে এক কথা, "যাবি ঝিনুক?"

ঝিনুকের এক কথা, "এত উঁচুতে উঠতে পারবে না।"

"কি উঠতে পারবে না। চল দেখবি।" লিচুও বলেছিল সে অত উঁচুতে উঠতে পারবে না।

আর বিকেলে ফাঁক বুঝে সে একাই চলে গেল গাছটার কাছে। ঝিনুক দেখল বদনদা বাড়ি নেই। তবে কাছারিবাড়ি গেছে বাতাবি লেবু পেটাতে। সেখানেও নেই। তবে সেই গাছটার নীচে। রোজ একটা আম মগডালে ঝোলে। রোজ পাখপাখালিরা খেয়ে যায়। হয়তো-বা বাদুড়ে। গাছের অত উঁচুতে কেউ উঠতে পারে না। রোজ একটা আমই পাকে, একটার বেশি না। মানুষের ভাগ্যে জোটে না। কাঠবিড়ালির ভাগ্যেও না। লিচুর লোভ আছে, ঝিনুকেরও তিরতির করে লোভ বাড়তে থাকল। অমৃতফল, খেলেই তারা আর ছোট থাকবে না, বড় হয়ে যাবে। ওরা দূর থেকে দেখল, সত্যি নীল আকাশের নীচে গাছের শেষ মগডালে আগুন হয়ে জ্বলছে যেন আমটা। বিকেলের রোদে চোখে ধাঁধাঁ লেগে যাবার মতো—এই আছে, এই নেই। বাতাসে দুলছে ডালপালা, এই আছে এই নেই। বদনদা গাছের গুঁড়ি বেয়ে উঠছে, সেও এই আছে এই নেই। লিচু বলছে, "ইস, কী মজা, বদনদা, তুমি পারো না কোনও কাজ হতেই পারে না।"

ঝিনুক কেন যে বলল, "আমটা আমি নেব।"

লিচু বলল, "আমি।"

কিন্তু বদন কিছুটা উঠে আর পারছে না। এখনও শেষ মগডাল হাতের কাছে আসছে না। আরও পাতলা ডাল বেয়ে সে প্রায় পাখির মতো উড়ে যেতে চাইল। নীচ থেকে লিচু তাতাচ্ছে, "অরে-একটু হাত বাড়াও, আর-একটু, ওই তো, আর....আর....আর।"

বদন খপ করে দু'হাতে ধরতে গিয়ে পড়ে গেল নীচে। প্রচণ্ড লেগেছে। একটা ডালের বাড়ি খেয়ে পড়েছে নীচে। তবু বদন কোনও রকমে বসার চেষ্টা করল। সে নিশ্বাস নিতে পারছে না। মুখ কুঁচকে গেছে, উঠে দাঁড়াতে পারছে না। মুখের কষে রক্ত। সে তবু আমটা ওদের দিয়ে বলছে, "ধর।"

ঝিনুক হাঁটু মুড়ে বসে পড়েছে। ধরে আছে। বলছে, "লেগেছে?"

"না" বলে সে উঠতে গিয়ে পারল না।

ঝিনুক চিৎকার করে উঠল, "বলছ যে লাগেনি তবে উঠতে পারছ না কেন। কী হল "অ বদনদা, উঠতে পারছ না কেন।"

বদনের মুখ কষ্টে নীল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কষ্ট কী, সে জানে না। জানলেও স্বীকার করবে না। কষ্টের কথা স্বীকার করতে তার লজ্জা করে। সে হাসছে, "তুই কাঁদছিস কেন ঝিনুক? কত উঁচু, কত উঁচু রে।" তারপর কেমন নিস্তেজ হয়ে আসছে গলা।

ক'দিন পর জানালায় লিচু দাঁড়িয়ে হাত-পায়ে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা, বদন বিছানায়। রোজ লিচু তাকে দেখতে আসে। আজ কথা বলতে পারছে বদন।

ঝিনুক শিয়রে। বাবা, মা, ছোটদাদু সবাই খবর পেয়ে চলে এসেছে। ঝিনুককে একফাঁকে কাছে ডেকে বদন বলল, "আমটা খেয়েছিস?"
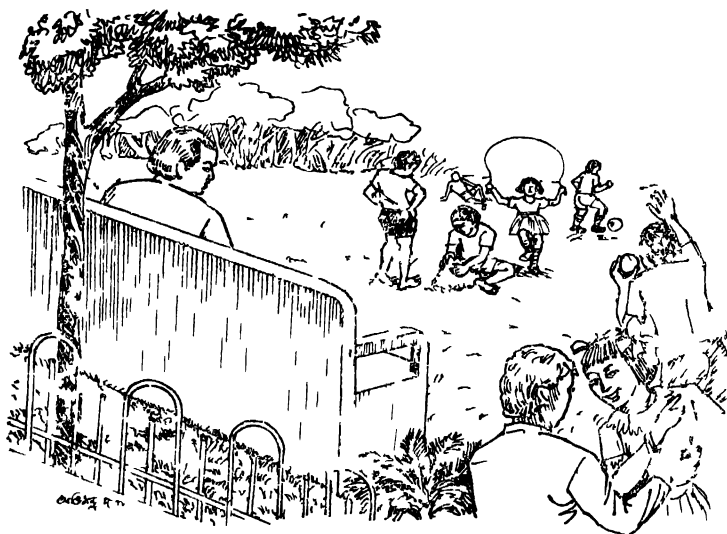
ঝিনুক কেন লিচুও খায়নি। আমটা সেই জঙ্গলের মধ্যেই কোথায় পড়েছিল, কারণ লোকজন ছুটে আসছে গাঁয়ের, গাছ থেকে বদন পড়ে গেছে, তখন মাথায় কারও কিছু ছিল না। এ-ক'দিন বদনদাকে নিয়ে যমে-মানুষে লড়ালড়ি গেছে।

ঝিনুকের কেন কান্না এসে গেল জানে না। আমটা না খেলে বদনদা কত কষ্ট পাবে সে জানে। লিচু জানালায়। ঝিনুক কান্না চেপে বলল, "খেয়েছি। কী ভাল না খেতে। কী বলব বদনদা, দারুণ। কী রে লিচু, চুপ করে থাকলি কেন। দারুণ না খেতে?"

লিচু কিছু না বলে, দৌড়ে পালিয়ে গেল।

বদনদার মুখে আশ্চর্য এক প্রসন্ন সুখ ছড়িয়ে পড়ল মুহূর্তে।

বুদ্ধির পরিচয়

অতীন ঠাকুর

মেদিনীপুর জেলার চকভুঁড়িয়া গ্রামে প্রাণগোপাল নামে এক চাষী থাকত। তার দুই ছেলে। বড় ছেলে হরিগোপাল আর ছোট ছেলে ননীগোপাল। বড় ছেলেটি ভীষণ বোকা কিন্তু ছোট ছেলেটি খুব চালাক। প্রাণগোপাল গ্রামের লোকদের জমিতে ভাগে চাষ করে, দুই ছেলেকে নিয়ে আনন্দেই দিন কাটাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন প্রাণগোপাল মারা গেলেন। মারা যাবার সময় সম্পত্তি হিসাবে রেখে গেলেন একটি গরু, একটি আম গাছ, একটি লেপ এবং তার কুঁড়ে ঘরটি। বাবার মৃত্যুর পর দুই ভাই সম্পত্তি ভাগাভাগি করে নিল। ভাগাভাগিতে ঠিক হল, বড়ভাই হরিগোপাল পাবে গরুর সামনের দিকটা, আমগাছের গোড়ার দিকটা, লেপটা শুধু দিনের বেলায় ব্যবহার করতে পারবে আর ঘরের সামনের দিকটা। ছোটভাই ননীগোপাল পাবে গরুর পিছনের দিকটা, আমগাছের মাথার দিকটা, লেপটা শুধুমাত্র রাত্রে ব্যবহার করতে পারবে এবং ঘরের ভিতর দিকটা।

ছোট ভাই গুরুকে দুধ দোওয়ানোর সময় বড ভাই গুরুকে খড-খৈল খাওয়ায়। আমের সময় ছোট ভাই আম গাছে উঠে আম পাড়ে আর বড় ভাই গাছের গোড়ায় মাটি, জল, সার দিয়ে গাছকে যত্ন করে। বড় ভাই শীতকালে দিনের বেলায় লেপটাকে রোদে শোকাতে দিয়ে গরম করে ভাঁজ করে রাখে, ছোট ভাই রাত্রিবেলায় সেই লেপটা নিয়ে আরামে ঘুমায়। বড়ভাই শীতে কষ্ট পায়। শীত-বর্ষায় ছোট ভাই ঘরের ভিতর আরামে থাকে আর বড ভাই বাইরের অংশে বর্ষায় ভিজে শীতে কাবু হয়ে নিদারুণ কষ্ট পায়। এইভাবে কিছুদিন চলার পর হরিগোপাল অনাহারে, কষ্টে, ঝড় জলে ভিজে, শীতে কাবু হয়ে দুঃখে দিশেহারা হয়ে পড়ল। সেই গ্রামে একটি নদী ছিল। নদীর ধারে একটি গাছের তলায় বসে সে তার অদৃষ্টের কথা ভাবছে আর নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করছে। অনেক ভেবে সে নদীতে ডুবে আত্মহত্যার কথা চিন্তা করল। এমন সময়—এক

নাপিত গাছটির তলা দিয়ে যাচ্ছিল। হরিগোপালকে ঐরকম ম্রিয়মান অবস্থায় দেখে সে হরিগোপালের কাছে তার দুঃখের কথা জানতে চাইল। সব কথা শুনে নাপিত বলল—"এক কাজ কর, ছোট ভাই যখন দুধ দোওয়াবে, তুমি তখন একটা লাঠি নিয়ে গরুর মুখে জোরে জোরে মারতে থাকবে, তারপর ভাই যখন রাত্রে লেপ নিয়ে আরাম করে শোবে তুমি দিনের বেলায় লেপটাকে জলে ভিজিয়ে রাখবে। আবার ভাই যখন ঘরের ভিতর আরাম করে ঘুমোবে তুমি বাইরে থেকে কাঁসর ঘণ্টা জোরে জোরে বাজাবে। আবার ভাই যখন আম পাড়ার জন্য আম গাছে উঠবে, তুমি একটা কুড়ুল দিয়ে আমগাছের গোড়ায় কোপাতে থাকবে। তাহলেই দেখবে সমস্যা মিটে গেছে। তোমার আর দুঃখ থাকবে না।" এই বলে নাপিত তার নিজের কাজে চলে গেল। একদিন দুপুরে হরিগোপাল নাপিতের দেওয়া পরামর্শ অনুযায়ী লেপটাকে জলে ভিজিয়ে রাখলো। রাত্রে ননীগোপাল যখন শুতে যাবে তখন লেপখানা ভিজা দেখে সে তো খুব রেগে গেল এবং বলে বসল—"কে আমার লেপ এমন করে ভিজালো—?" হরিগোপাল বলল—"আমিই ভিজিয়ে দিয়েছি, তার কারণ দিনের বেলায় লেপখানা আমার, আমি তখন যা খুশি তাই করতে পারি, তোর তো শুধু রাত্রি বেলার জন্য।" সেদিন ননীগোপাল শীতে সারা রাত কষ্ট পেল, পরদিন সকালে ননীগোপাল দুধ দুইতে গেল। যখন প্রায় এক বালতির মত দুধ দোওয়ানো হয়েছে তখন হরিগোপাল নাপিতের কথামত গরুর মুখে লাঠি দিয়ে সজোরে মারতে লাগল। আকস্মিক আঘাতে গরু ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে পিছনের দুপায়ে ছাট্ মারতে লাগলো, এতে হলো কি পেছনের পায়ের কাছে বসে থাকা ননীগোপালকে ক্রমাগত লাথি মারতে লাগল। ননী উল্টে গিয়ে পড়ল দুধের বালতিতে। দুধ পড়ে নষ্ট হলো। ননীরও বেজায় লেগেছে, যন্ত্রণায় রাগে দুঃখে সে দাদার দিকে তেড়ে এল, তখন হরিগোপাল হাসি মুখে বলল, "আহা করিস কি? আমার ভাগে তো গরুর সামনের দিকটা। সুতরাং আমি সামনের দিকটায় যা ইচ্ছা করতে পারি, তুইও পিছনের দিকটা যা ইচ্ছা কর। তা এতে রাগ করবার কি আছে?" ননী সব বুঝে চুপ করে গেল। সারা রাত্রি ঘুম নেই তার, দুপুরে একটু গড়িয়ে নেওয়ার জন্য শুয়েছে। ঘুমটা সবে এসেছে এমন সময় বিকট কাঁসর ঘণ্টার শব্দে তার ঘুমের দফা-রফা হয়ে গেল। তীরের বেগে দরজা খুলে বাইরে দেখে দাদার কান্ড এটা। তার পর সেই যথারীতি একই উত্তর।

বিকালের দিকে ননী আমগাছে উঠলো আম পাড়বে বলে, বেশ কিছুটা আম পেড়েছে, এমন সময় গাছের উপর থেকে অনুভব করল গাছটি দুলছে, নিচে তাকিয়ে দেখে দাদা একটা কুড়ল নিয়ে গাছের গোড়া কাটছে। সর্বনাশ আমিতো পড়ে মরব। সেই মুহূর্তে ননীর কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেল

দাদার ঐরকম আচরণ করার কারণ। শেষে বাঁচার তাগিদে গাছের উপর থেকে বলতে লাগলো, "আচ্ছা বাবা, আচ্ছা, আমি তোকে আয়ের অর্দ্ধেক দেব, আমি যে সুবিধা ভোগ করছি তা তুইও পাবি : গরুর দুধ, আম, লেপ সবই অর্দ্ধেক দেব, ঘরেও থাকতে পারবি। এখন গাছ কাটা বন্ধ কর।" হরিগোপাল খুশি হয়ে গাছ কাটা থামিয়ে মনে মনে নাপিতের বুদ্ধির প্রশংসা করতে লাগলো। ননী গাছ থেকে আমগুলো পেড়ে নিয়ে এসে তার অর্দ্ধেক দাদাকে দিল এবং হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে ঘরে তুলল। এর পর থেকে দুই ভাইয়ের মধ্যে আর কোন বিভেদ রইল না। তারা চাষাবাদ করত আর সমান ভাবে সমঅধিকারে দিন কাটাতো, এইভাবে সুখে তাদের দিন কাটতে লাগলো।

চকদীঘির বাবুরা

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

সেকালে চকদীঘির বাবুদের রমরমা ছিল খুব। সে আমলও আর নেই। সে বাবুরাও নেই। যেমন সেই গঙ্গা আছে, যমুনা আছে, নর্মদা সিন্ধু আছে অথচ আগের সেই মানুষ নেই। সেই দিল্লী আছে, আগ্রা আছে, লালকেল্লা তাজমহল আছে, কিন্তু সেই বাদশা নেই। তেমনি চকদীঘিও আছে। চকদীঘির শূন্য প্রাসাদও আছে। অথচ খেয়ালি বাবুরা নেই।

খেয়ালিবাবু? হ্যাঁ, চকদীঘির বাবুরা ছিলেন সত্যিই খেয়ালিবাবু। দারুণ মেজাজী লোক সব। ডাকসাইটে জমিদার। দরজায় হাতি বাঁধা থাকত। সুবিশাল প্রাসাদে বাবুরা থাকতেন। তখন এদেশে ব্রিটিশের রাজত্ব। বাবুদেরও পালাবদল হত, কেননা এক পুরুষের বাবু তো নয়। তা সেই বাবুদের কেউ ছিলেন ধর্মভীরু। কেউ ছিলেন অত্যাচারী। কেউ অতিশয় রাগী। কেউ বা খাম-খেয়ালি। তাঁদের সুনাম দুর্নাম সবই ছিল

কিন্তু এদেশে মানুষের অবদানের কথা মানুষ ভুলে যায়। কিন্তু তাদের অন্যায়ের কথা অত্যাচারের কথা সযত্নে মনে রাখে মানুষ। তাই এইসব কাহিনী লোকমুখে গল্পকথায় ঘোরে ফেরে।

আর সত্যিকথা বলতে কি বাবুদের কীর্তিকলাপ যদি ভালোয় মন্দয় মিলিয়ে না হোত তাহলে তো গল্পেরই জন্ম হোত না। কেননা বাবুরা ঐ সব খেয়ালিপনা করে গেছেন বলেই না এই গল্প আজ লিখতে বসেছি। এতে আর কিছু হোক না হোক সেকালের সুখী ভোগী ধনী ও বিলাসী মানুষের মন-মর্জি সম্বন্ধে একটা ধারণা তো হবে।

বাবুদের রাজপ্রাসাদ আজও দেখার মত। পুকুর, বাগান, হাতিশালা—কি না ছিল বাবুদের? ঝি-চাকর, লেঠেল-দারোয়ান, পাইক-বরকন্দাজ কি না ছিল? আর বাবুদেব দেমাকও ছিল তেমনি। ভিনদেশী কোন পথচারী পথ চলছে হঠাৎ বাবুর নজরে পড়ে গেল। বাবু ডাকলেন—এই কে আছিস?

অমনি ইয়া তাগড়া চেহারা নিয়ে বাবুর লোকজন ছুটে এল—আদেশ করুন বাবু।

—ধরে নিয়ে আয় লোকটাকে।

বাবুর লোক তো, যা তা লোক নয়। ডাকাতের মত চেহারা এক একজনের। ছুটে গিয়ে ধরে নিয়ে এল লোকটাকে।

দোতলার বারান্দা থেকে বাবু হুকুম দিলেন—জিজ্ঞেস কর কোথায় বাড়ি ওর।

লোকটি ভয়ে ভয়ে বলল— আজ্ঞে পলাসন।

—কোন জেলা?

—বর্ধমান।

—এখন কোথায় যাবি?

—বিদ্যেবতীপুর।

—হুঁ। তা অমন বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে যাচ্ছিস কেন?

লোকটি আমতা আমতা করে বলল—কি করে যাব তাহলে?

বাবুর লোকেরা বলল—কি করে যাবি? এই প্রাসাদ যেখান থেকে নজরে পড়বে সেখান থেকেই মাথা হেঁট করে যাবি। আর এই ফটকের সামনে এসে বাবুদের উদ্দেশ্যে পেন্নাম করবি। তারপর যাবি। মনে থাকবে?

ভিনদেশী লোকটি তখন পালাতে পারলে বাঁচে। 'এবার থেকে তাই করব মশাইরা' বলে কোনরকমে পালিয়ে বাঁচল।

আর একবার এক নতুন জামাই এসেছে শ্বশুরবাড়ি। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এখানকার বাবুদের মেজাজের কথা বলে দিতে ভুলে গেছে জামাইকে। জামাই বাবাজী কলকাতা শহরের ছেলে। উল্টিয়ে চুল আঁচড়ে দিব্যি শিস দিতে দিতে চকদীঘির আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর যায় কোথা। বাবুর নজরে পড়ে গেল—এই! কে ও? ধরে নিয়ে আয় ব্যাটাকে।

বাবুর লোকেদের তো ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে। কাজেই মারতে মারতে নিয়ে এলো তারা।

ওপর থেকে হুকুম এলো—ওকে বারণ করে দে আর কখনও যেন উল্টিয়ে চুল আঁচড়ে এ গ্রামে না ঢোকে। ব্যাটা আবার শিস টানছে। দে ব্যাটার চুলগুলো কেটে দে।

জামাইবাবাজী তো কান্নাকাটি শুরু করে দিল—দেখুন আমি নতুন লোক। না জেনে অন্যায় করে ফেলেছি। আমাকে এবারের মতন ছেড়ে দিন। আর কখন শিস দেওয়া তো দূরের কথা এই গ্রামেও আমি আসব না। দয়া করে আমার চুল কাটবেন না। তাহলে নতুন জামাই আমি, শ্বশুরবাড়িতে মুখ দেখাতে পারব না।

কিন্তু তা বললে কি হয়? যে সে বাবু নয়, এ হল চকদীঘির বাবু। জামাইবাবাজীর অবস্থা দেখে বাবুমশাই হেসে বললেন—তা এত করে বলছ যখন তখন তোমার কথাও থাক আমার কথাও থাক। ওরে এক কাজ কর, সব চুল না কেটে বরং মাথার অর্ধেক কামিয়ে ঘোল ঢেলে ছেড়ে দে।

আদেশ সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপালিত হল। অর্ধেক মাথা কামিয়ে ঘোল ঢেলে ছেড়ে দেওয়া হল জামাই বাবাজীকে। জামাইবাবু আর শ্বশুরবাড়িতে নয়, লজ্জা ঢাকতে কোন রকমে মাঠে মাঠে পালিয়ে একেবারে কলকাতায়।

তা সেবার কলকাতা থেকে এক নামকরা-যাত্রার দল যাচ্ছিল এই পথ দিয়ে। দু-তিনটি গরুর গাড়ি বোঝাই করে যাত্রার দল যাচ্ছিল।

দোতলার বারান্দায় বসে যাত্রা দলের সেই গরুর গাড়ি দেখতে পেলেন বাবুমশাই। সঙ্গে সঙ্গে হুকুম—এই দেখ তো কারা যায়? ধরে নিয়ে

আয় এখানে।

বাবুর লোকজন হৈ হৈ করে ছুটল। পুরো দলটাকেই ধরে আনল তারা।

বাবু বললেন—এ পথ দিয়ে কোথায় যাচ্ছ তোমরা ?

অধিকারীমশাই হাত জোড় করে বললেন—আজ্ঞে বাবু, এই হরিদাস-পুরে যাচ্ছিলাম আমরা, গাওনা গাইতে।

—গাওনা কবে আছে ?

—আজই রাত্রে।

—কি করে গাইবে ? আজ তো আমার এখানে পালা তোমাদের।

—সে কি ! না না, তা হয় না বাবু। সেখানকার মানুষজন সব আশা করে বসে আছে। আমাদের এখানে আটকে থাকলে চলে ? তবে আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি ওখানকার পালা শেষ করে আপনার এখানে গান করে যাব। আমাদের যেতে দিন।

বাবু হুকুম দিলেন—এই ! লোকটাকে একটু উচিৎ শিক্ষা দিয়ে দে তো। ওকে জানিয়ে দে ও কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে।

সঙ্গে সঙ্গে বাবুর লোকেরা হাতের মাশল ফুলিয়ে এগিয়ে এল।

অধিকারীমশাই গতিক সুবিধের নয় বুঝে বললেন—থাক বাবা থাক। ওসবের দবকার নেই। ওসব আমি পছন্দ করি না। আপনি বাঁচলে বাপের নাম। আজ আমরা সাবারাত ধরে এইখানেই যাত্রা গান করব।

—হ্যাঁ। এবার পথে এস বাছাধন। এ গ্রামে একবার যখন ঢুকে পড়েছ তখন আমি না ছাড়লে তোমাদের বেরোবার পথ আর নেই।

অধিকারীমশাই 'হুঁ হেঁ' করতে করতে চকদীঘির অতিথিশালায় দলবল সমেত গুছিয়ে বসলেন। মনে মনে বললেন, কপালের ফের আর কাকে বলে।

এদিকে হঠাৎ উৎসবের শুরুতে সারা চকদীঘিতে তো আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। সাজ সাজ রব পড়ে গেল চারিদিকে। দূর দূর গ্রাম থেকেও খবর পেয়ে লোক আসতে লাগল যাত্রা শুনতে।

সেকালের গ্রামে ঘরের প্রথা অনুযায়ী রাত দশটার পর যাত্রা আরম্ভ হ'ল। হ্যাজাকের আলোর নিচে যাত্রার আসরে আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে বাবুমশাই এসে বসলেন। মেয়েরা চিকের আড়াল থেকে যাত্রা শুনতে লাগল।

আরম্ভ হল যাত্রা। এই মরশুমের নতুন পৌরাণিক পালা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ।

বেশ কিছুক্ষণ হবার পর যাত্রা যখন দারুণ জমে উঠেছে তেমন সময় বাবু হঠাৎ রেগে ধমক দিলেন—বন্ধ কর। বন্ধ কর এই যাত্রা।

নট নটীরা থেমে গেল।

দর্শকরাও চুপ। কি থেকে কি হয়ে গেল কে জানে!

অধিকারীমশাই দু হাত কচলাতে কচলাতে ছুটে এলেন—আজ্ঞে বাবুমশাই? আপনার আদেশেই তো সবকিছু হচ্ছিল। তবে হঠাৎ যাত্রা বন্ধ হবে কেন?

বাবুমশাই দ্রৌপদীর দিকে আঙুল তুলে বললেন—ওটা কে?

—কেন দ্রৌপদী।

তখনকার দিনে যাত্রা দলে ছেলেরা মেয়ে সাজত।

—দ্রৌপদী? ওকে আজ ভরসন্ধেবেলা আমি পুকুরপাড়ে বসে লুকিয়ে বিড়ি খেতে দেখেছি। আমার চোখে চোখ পড়তেই বিড়ি ফেলে দিয়ে মাথা হেঁট করে পালাল বলে কিছু বলিনি তখন ওকে।

—তা আজ্ঞে, আপনি বলেন তো এখন এসে আপনার পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নেবে ও।

—তাতে লাভ কি? যাকে আমি নিজের চোখে বিড়ি টানতে দেখেছি সে এখন দ্রৌপদী সেজে আসর মাতাবে এ হতে পারে না। হয় লোকটাকে বসিয়ে দিয়ে অন্য কাউকে দ্রৌপদী সাজাও। নয়ত এ পালা বন্ধ করে অন্য পালা কর।

—তা কি করে হয় বাবু। ওকে বসিয়ে দিলে অন্য কেউ তো ওর পার্ট করতে পারবে না। তাছাড়া আমাদের দলে ওই একটি লোকই মেয়ে সাজে। আর অন্য পালার কথা বলছেন? সে পালা জুড়তে গেলেও তো রাত কাবার হয়ে যাবে। কেননা এইসব সাজ পোশাক বদলাতে সময় নেবে অনেক। এটা হল পৌরাণিক। সেটা ঐতিহাসিক।

—হোক না রাত কাবার। আজ না হয় কাল হবে। ক্ষতি কি? তবু এ পালা চলবে না।

সে রাতে আর যাত্রা হল না।

অধিকারী তো রেগে-মেগে সকলের সামনেই দ্রৌপদীর গালে ঠাস ঠাস করে চড়াতে লাগলেন—বিড়ি খাবার আর জায়গা পাসনি হতচ্ছাড়া? দিলি

তো সব পণ্ড করে ? বাবুর পায়ে ধরে ক্ষমা চা শিগগির।

দ্রৌপদী বেচারি আর কি করে ? কোন রকমে বাবুর পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে গ্রীনরুমে গিয়ে পালিয়ে বাঁচল।

পরদিন আবার ওই রাত করেই যাত্রার আসর বসল। আবার সেই আলো ঝলমলে আসরে লোকের ভিড়। কনসার্টের বাজনা। যথাসময়ে যাত্রাও আরম্ভ হল। আজকের পালা ঐতিহাসিক। নবাব সিরাজদ্দৌলা। আজও যাত্রা যখন দারুণ জমে উঠেছে তেমন সময় গণ্ডগোল।

রাজপোশাক পরিহিত সিরাজদ্দৌলা আসরে এসে যেই না বলেছে, আমি সুবে বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলা—।

অমনি লাফিয়ে উঠলেন বাবুমশাই—জুতো মার ব্যাটাকে, জুতো মার। থাম বলছি।

সিরাজদ্দৌলার বুক ঢিপ ঢিপ করে উঠল—কেন বাবুমশাই। আমি তো লুকিয়ে বিড়িটিড়ি খাইনি।

-তোর বিড়ি খাওয়ার নিকুচি করছে। আমি নিজে এখানে বসে থাকতে তুই কি নবাব হবি রে ? সুবে বাংলার নবাব যদি কেউ হয় তো সে আমি। আমার চেয়ে বড় এ তল্লাটে আর কেউ আছে ?

অধিকারীমশাই ছুটে এসে বললেন—ওর কথায় কিছু মনে করবেন না বাবুমশাই। ও তো নিজের কথা বলছে না। যাত্রার মুখস্ত বুলি আওড়াচ্ছে। না হলে ও হচ্ছে গিয়ে আপনার দাসানুদাস।

—সেই জন্যই তো বলছি। ওকে সাবধান করে দাও। বারবার ও যেন আমার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে নবাব বলে জাহির না করে। জুতোর তলার লোক জুতোর তলায় থাকুক। ঐ কথাটা বাদ দিয়ে অন্য কথা বলুক ও।

অধিকারী হাত জোড় করে বললেন—তা বললে যাত্রা জমবে কেন বাবু ? সব গোলমাল হয়ে যাবে। আমি বই এনে দেখাচ্ছি আপনাকে বইতে যা লেখা আছে তাই বলছে ও।

—নিয়ে এসো বই। আমি দেখব।

অধিকারী তখন যাত্রার বই এনে দেখালেন বাবুমশাইকে। বাবুমশাই সব দেখে শুনে বললেন—ঠিক আছে। তবে আমার সামনে দাঁড়িয়ে একজন যাত্রাওলা বারবার নিজেকে বাংলার নবাব বলে জাহির করে আমার প্রজাদের মন জয় করবে এ হবে না। ওকে দেখাতে হবে ও যা সেজেছে

তা ও নয়।

—কি দেখাবে বলুন ?

—ও যতবার আসরে আসবে ততবার আসর থেকে যাবার সময় আমার পায়ে হাত দিয়ে পেন্নাম করে যাবে।

—এ আর এমন কি কথা। যা আজ্ঞা হয় তাই করবে ও।

তারপর থেকে প্রতিটি দৃশ্যেই আসর থেকে বিদায় নেবার সময় সিরাজ এসে বাবু মশায়ের পায়ে হাত দিয়ে পেন্নাম করে যেতে লাগল। এইভাবে সারা রাত ধরে যাত্রা গান গাওয়ার পর সকালবেলায় ছাড়া পেলেন অধিকারী মশাই।

তবে হ্যাঁ, চকদীঘির বাবুমশাই জুলুম করে যাত্রার দলকে দুরাত আটকে রাখলেও যাবার সময় কিন্তু অধিকারীমশাই-এর হাতে পাওনার অতিরিক্ত টাকা তো দিয়েইছিলেন উপরন্তু সকলকে খাইয়েও ছিলেন দমভোর।

আমায় সবাই চেনে

উজ্জ্বল কুমার

সন্ধ্যের সময় বাড়িতে আর বসে থাকতে ভালো লাগছিল না ছোটো-মামার। বিল্টুও তার পরীক্ষা-পত্তরের পাঠ চুকিয়ে ফেলেছে গত সপ্তাহেই। তাই ছোটোমামা বিল্টুকে গিয়ে বলল, "কিরে বিল্টু, চুপচাপ বসে কি ভাবছিস, তার থেকে বরং একটু রাস্তায় ঘুরে আসি, চল্।"

বিল্টুর আবার সন্ধ্যের পর রাস্তায় বেরোনো বারণ। তাই ছোটো-মামাকে বলল, "তুমি যদি মা'র থেকে পারমিশন্ লেটারটা যোগাড় করতে পার, তবে আমি তোমার সঙ্গে বেরোতে পারি।"
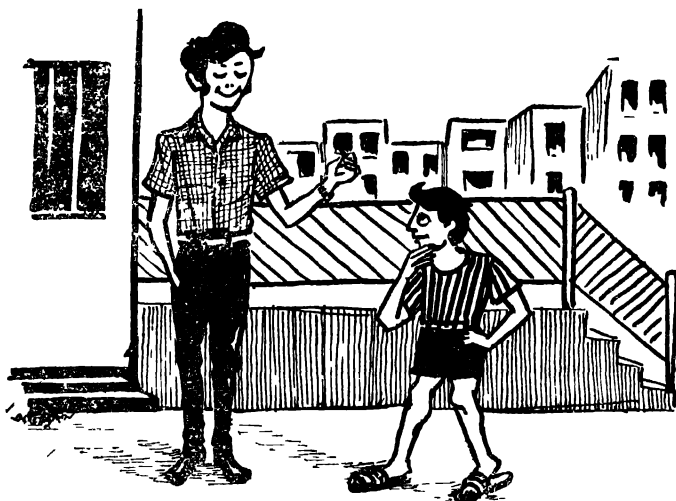
ছোটোমামা তাড়াতাড়ি বিল্টুর মা'র থেকে বিল্টুর বেরানোর পারমিশন্ যোগাড় করে ফেলল, তারপর দুজনে জামা-প্যাণ্ট পরে বাইরে বেরিয়ে পড়ল।

বাইরে বের হয়ে ছোটোমামা, বিল্টু পাশাপাশি হাঁটছে। ছোটোমামা বিল্টুকে বলল, "আমাকে নিয়ে তো শহর দেখাতে বেরিয়েছিস, দেখিস আমি যেন হারিয়ে না যাই, হারিয়ে গেলে তোদের আবার টি. ভি. স্টেশনে

খবর দিতে হবে, 'ছোটোমামা উধাও, কেউ খোঁজ পেলে, লালবাজার মিশিং স্কোয়ারে ছোটোমামাকে জমা দিন', আবার তখন টি'ভির দর্শকরা টিভিতে আমার ফটো দেখে বলবে, 'এ ব্যাটা নিশ্চয় হিরো হবার জন্য, বাড়ীতে না জানিয়ে বম্বে পালিয়ে গেছে,' আবার অনেকে বলবে, 'কি চেহারার ছিরি ! এর সাথে বম্বের শ্রীদেবীর বাড়ীর চাকরাণী-ও হিরোইন হতে চাইবে না।'

লোকে তখন চারিদিকে সমালোচনা করতে থাকবে, আর তখন দেখবি, আমি হয়তো কোনো ডাস্টবিনের স্তূপে চাপা পড়ে সমাধিস্থ হয়ে যাব, নয়ত-বা আমাকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে চোর-ছ্যাঁচোর ভেবে কোনো থানার 'লকাপে' পুরে দেবে, তার কারণ আজকাল আসল চোর-ডাকাত খুব কম-ই ধরা পড়ে।"

বিল্টু একবার ছোটোমামার দিকে গম্ভীর মুখে তাকিয়ে বলল, "জান ছোটোমামা, তুমি যদি একবার হারিয়ে যাও না, তাহলে তুমি শুধু একবার আমার নামটা যেকোনো লোককে বলবে, ব্যাস দেখবে তোমাকে একেবারে সোজা বাড়ীতে পেঁীছে দিয়ে যাবে। আমি বুক ঠুকে বলতে পারি যে, এ এলাকার লোকজন আমায় সবাই চেনে, আমিও তাদের এক একজনকে দাদা, মামা, কাকা, পিসেমশাই ডাকি। তারা সবাই বিল্টু অন্তপ্রাণ, আমার বিপদে-আপদে সবাই একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার উপর।"

ছোটোমামা প্রশংসার দৃষ্টিতে বিল্টুর দিকে তাকিয়ে বলল, "চারিদিকে তোর যখন এত শুভাকাঙ্ক্ষী ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাহলে ত আমার কোনো চিন্তাই নেই, দুচোখ যেদিকে যায়, সেদিকে গেলেই হয়। রাস্তা হারিয়ে ফেললেই বলব, বিল্টু মস্তানের বাড়ী যাব ব্যাস—একেবারে সোজা পেঁীছে যাব। সত্যি বিল্টু তোর এলেম আছে বটে।"

এতক্ষণ বিল্টু বরফের মতো জমে গিয়েছিল, এখন ছোটোমামার প্রশংসা পেয়ে ধীরে ধীরে গলতে শুরু করেছে, ছোটোমামার এরকম উষ্ণ প্রশংসায় বরফ থেকে জল, আর সেই জল বাষ্প হয়ে উঠতে শুরু করেছে, সেই বাষ্প-শক্তি বিল্টুর মধ্যে এক নতুন শক্তি সৃষ্টি করল, সেই শক্তিতে বিল্টু গদগদ হয়ে বলল, "তা যা বলেছো মামা। আরে এ এলাকার থানার বড়োবাবু পর্যন্ত আমাকে চেনেন।"

ছোটোমামা ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তা তোর সঙ্গে থানার বড়োবাবুর এতো আলাপ হলো কি করে ? তুই কি আজকাল থানার 'লক-আপে' মাঝেমধ্যে দিন-টিন কাটাচ্ছিস নাকি ?"

ছোটোমামার ঠাট্টায় বিল্টুর কানদুটো লাল হয়ে উঠল, তাও বিল্টু চুপচাপ মুখ বুজে সহ্য করে রইল। আর মনে মনে বলল, 'ঠিক আছে একমাঘে কারুর শীত যায় না, সময় একবার আসুক তখন বুঝিয়ে দেব, বিল্টুর পরিচিতির জগতটা কতো বড়ো, বয়স কম হলেও সে অবজ্ঞার পাত্র নয়।'

বিল্টু তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা পাল্টে বলল, "ছোটোমামা তার থেকে বরং কোনো চায়ের দোকানে বসে একটু চা খাওয়া যাক্।"

—নারে বিল্টু, এখন আর চা খাব না। বাড়ি থেকে আসার সময় খেয়ে এসেছি।

ছোটোমামা থাকেন দিল্লীতে, ঔষধের ব্যবসা করেন, সব সময় ভীষণ ব্যস্ত, এই কলকাতায় প্রায় সাত আট বছর পর দিদির কাছে এসেছে। এই সাত-আট বছরের মধ্যে কলকাতার আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে। বাসিন্দা অনেক বেড়ে গেছে, গাড়ী-ঘোড়া অনেক হয়ে গেছে যে, তার ভার আর কলকাতা সহ্য করতে পারছে না, তাই মহানগরী কলকাতা আজ পাতালে প্রবেশ করতে চায়। তাই সৃষ্টি হয়েছে পাতাল রেল, আর চারি-দিকে খোঁড়াখুঁড়ি, মাটি কেটে কেটে রাস্তার ধারে ধারে ছোটোছোটো পাহাড় তৈরী হয়েছে। বাস-টাম নানাদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। চেনা কলকাতা আজ তাই ছোটোমামার কাছে অচেনা কলকাতায় পরিণত হয়েছে।

বিল্টু আর ছোটোমামা দুজনেই হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে চলছিল, যেন কোনো তাড়া-ই নেই। রাস্তার দুধারে সারি সারি দোকান, চারিদিকে আলোয় ঝল্‌মল্ করছে, বাস-ট্রাম নানারকম হর্ণ বাজাতে বাজাতে চলেছে, আর তার সাথে চলছে এক জনসমুদ্র, মহানগরী কলকাতা জমজমাট।

রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে ছোটোমামা এক মাঝবয়সী ভদ্রলোককে দেখে, বিল্টুকে জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁরে, উনি কে রে ? আমার খুব চেনাচেনা লাগছে।"

বিল্টু বলল, "আরে ওর নাম ?" বলেই আমতা আমতা করতে লাগল, আর তার সাথে মাথা চুলকোতে লাগল।

বিল্টুর এই অবস্থা দেখে, ছোটোমামা একটু মুচকি হেসে ফেলল। তারপর বলল, "ওর নাম সুখময় সেনগুপ্ত।"

তখন বিল্টু বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছো, এইবার মনে পড়েছে, তা

তুমি কি করে চিনলে ওনাকে ?"

ছোটোমামা তখন ব্যাঙ্গের সুরে বলল, "ভাগ্নে, একটু আধটু সবাইকে চিনতে হয়। আচ্ছা বিল্টু উনি যেন কিসে কাজ করেন ? তুই-তো এই এলাকার সবাইকে চিনিস, জানিস।"

ছোটমামার এই প্রশ্নে, বিল্টুর সারা মুখে অবাক ও বিস্ময়ের ভাব জেগে উঠল।

বিল্টু একটু ভেবে নিল যে, ভদ্রলোকের সাথে ছোটোমামার কোথায় পরিচয় হতে পারে, তারপর বিল্টু ভাবল, নিশ্চয় উনি রেলে কাজ করেন, তার কারণ, ছোটোমামা যখন দিল্লী থেকে কলকাতায় আসে তখন বোধহয় ওনার সাথে পরিচয় হয়েছে। চেহারাতে কিরকম টি. টি. ভাব আছে। এই চিন্তা করতে করতে বিল্টু বিজ্ঞের মতো উত্তর দিল, "আরে উনি তো রেলে কাজ করেন।"

এই উত্তর শুনে ছোটোমামা তারিফের সুরে বলল, "ঠিক বলেছিস বিল্টু—কলকাতায় আসবার সময় উনি-ই-তো আমাদের কামরার টি. টি. ছিলেন, খুব মিশুকে লোক।"

বিল্টুর আন্দাজে বলাটা ঠিক মিলে গেছে শুনে খুব আত্মগরিমায় ডগমগ হয়ে বলল, "জানো এ এলাকার কে কি করে সব আমার নখদর্পণে। আর সুখমবাবুর সাথে আমার খুব আলাপ, আমাকে উনি ছেলর মতো ভালবাসেন। তুমি যদি আমার নাম একবার ওনাকে বলতে তাহলে দেখতে তোমায় উনি আরো কত খাতির করতেন। এই যে মা গতবার তোমার ওখানে গেল, আমি-ই-তো ওনার ওখান থেকে টিকিট জোগাড় করে এনে দিলাম।"

এসব কথাগুলো বলেই বিল্টু বলল, "দেখলেতো ছোটোমামা আমার কথা ঠিক হল কিনা। প্রথমে নামটা বলতে না পারায় তুমিতো ভাবলে আমি বোধহয় কাউকেই চিনি না। আসলে কি জান, এত লোকের সাথে পরিচয় হয়ে গেছে না যে আজকাল আর কারোর নাম মনে রাখা সম্ভব হচ্ছে না।"

ততক্ষণে সুখময় সেনগুপ্ত ছোটোমামা আর বিল্টুর সামনে এসে পড়েছেন। সুখময়বাবু ছোটোমামাকে দেখে বললেন, "কি কেমন আছেন ?"

—এই কোনোরকম চলে যাচ্ছে।

—তা কলকাতা ঘুরে দেখতে বেরিয়েছেন বুঝি ?

—এই একে নিয়ে একটু বেড়াতে বেরিয়েছি, সন্ধ্যা হবার পর বাড়িতে

থাকতে আর ভালো লাগে না, তার কারণ আপনাদের কলকাতার মশারা জোর করে ঠেলে বাইরে বের করে দেয়।

—আরে দু-চারদিন থাকুন, আপনার রক্তের নতুন স্বাদ পুরানো হয়ে যাক, তারপর দেখবেন ওরা আর আপনাকে জ্বালাতন করবে না। তা এক-দিন আসুন, আমার বাড়িতে—

তারপর বিল্টুর দিকে তাকিয়ে, সুখময়বাবু ছোটোমামাকে বললেন, "এ্যাই ছেলেটি কে ?"

—এই ছেলেটি-ই তো আমার ভাগ্নে বিল্টু।

সুখময় একটুকরো কাগজ বের করে ওনার ঠিকানাটা লিখে দিয়ে ছোটোমামাকে বললেন, "এই ছেলেটিকে নিয়ে একদিন সন্ধ্যের সময় আসবেন, বেশ জমিয়ে আড্ডা মারা যাবে।"

ছোটোমামা হঠাৎ সুখময়বাবুকে প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা সুখময়বাবু এই আমার ভাগ্নে বিল্টুকে চেনেন নাকি ?"

সুখময়বাবু অবাক হয়ে গিয়ে বললেন, "না তো।"

ছোটোমামা তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা পাল্টে বলল, "আচ্ছা ঠিক আছে, কাল সন্ধ্যার সময় আপনার বাড়ী যাব। আপনি থাকবেন কিন্তু।"

সুখময়বাবু ছোটমামাকে নমস্কার জানিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা দিলেন।

সুখময়বাবু চলে যাবার পর ছোটমামা বিল্টুর দিকে তাকালো। বিল্টুর মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে গেছে। এতক্ষণের আত্মগরিমা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে অনু-পরমাণু তে পরিণত হয়েছে।

ছোটোমামা বিল্টুকে বলল, "কিরে বিল্টু তুই না বলছিলি, সুখময়বাবু তোকে চেনেন ?"

বিল্টু তাড়াতাড়ি নিজের দোষ ঢাকবার জন্য বলল, "আরে ওনার সাথে কবে পরিচয় হয়েছিল, উনি কি অতো মনে রাখতে পারেন। এই দেখো না তোমার সাথে কালকে আলাপ হয়েছে তো আর একবছর পর দেখলে, দেখবে হয়তো তোমাকে আর চিনতে পারছেন না।" এইসব কথাগুলো বলে বিল্টু ছোটোমামাকে বেঝানোর চেষ্টা করছিল।

বিল্টুর কথায় ছোটোমামা পরিবেশ ভুলে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "বলিস কিরে বিল্টু ?"

বিল্টু-ও চিৎকার করে বলে—"আলবাৎ, আজকে যার সাথে পরিচয়

হয়েছে, দশবছর পরেও কি তার মনে থাকে ?"

তারপর ছোটোমামা, বিল্টু দুজনেই চুপচাপ হয়ে গিয়ে হাঁটতে শুরু করে, তারপর রাস্তার ডানধারে একটা রেস্টুরেন্ট দেখে বিল্টুকে জিজ্ঞাসা করে, "রেস্টুরেন্টটা সুরেনবাবুর না ?"

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তা তুমি কি করে চিনলে ওনাকে ?

—আরে সেবার যে তোদের বাড়ীতে এসেছিলাম না, তখন আমি আর জামাইবাবু সন্ধ্যেব সময় প্রায়ই আড্ডা মারতাম, আর সেই সোর্সে-ই একটু আধটু খাতির জমে উঠেছিল।

—চল না তাহলে, একটু ঘুরে আসি, আর তাছাড়া সুরেনবাবু আর বেঁচে নেই। এখন ওনার ছেলে সুজয়-ই রেস্টুরেন্ট চালায়, আমার সাথে সুজয়ের খুব আলাপ। চল না তোমার সাথে একটু আলাপ করিয়ে দিই।

—যদি আবার তোকে না চিনতে পারে ?

—কি যে বলনা ছোটোমামা, আমার সাথে কতদিনের আলাপ বাবা নিজেই-তো স্বীকার করেন, বাবাকে যত না চেনে, তার থেকে আমায় অনেকে বেশী চেনে। বাবাকে তো অনেক জায়গায়, বিল্টুর বাবা বলে পরিচয় দিতে হয়।

একথাগুলো বলতে বলতে বিল্টুর দুচোখে হাসির ঝিলিক খেলে যায়। বিল্টু মনে মনে ভাবল, এইবার ছোটোমামার সম্মান হানিকর কথার উপযুক্ত জবাব দেওয়ার সময় এসেছে।

বিল্টু ছোটোমামাকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই সোজা রেস্টুরেন্টে গিয়ে উঠল। ছোটো মামা-ও পিছনে পিছনে দিয়ে দাঁড়াল। সাজানো গোছানো বিরাট রেস্টুরেন্ট, এ অঞ্চলে এরকম রেস্টুরেন্ট খুব কমই আছে।

বিল্টু ছোটোমামার দিকে আঙুল তুলে সুরেনবাবুর ছেলে সুজয়কে বলল, "সুজয়দা ইনি আমার ছোটোমামা, দিল্লী থেকে এসেছেন।

ছোটোমামা তাড়াতাড়ি হাত থেকে সিগারেট ফেলে দিয়ে বললো, "নমস্কার।"

সুজয় ছোটোমামার আপাদমস্তকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে বিল্টুর দিকে তাকালো।

এই অবস্থা দেখে বিল্টু যেন একটু ভেঙে পড়ল, আবার মনে মনে

ভাবল, এবারও বুঝি ছোটোমামার কাছে ঝুলে গেল। তাই তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয় সুজয়কে বলল, "ইনি আমার ছোটোমামা, দিল্লীতে ওষুধের ব্যবসা করেন।"

অমনি ছোটোমামা একঝলক হাসি নিয়ে সুজয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "আজ থেকে প্রায় সাত-আট বছর আগে তোমার বাবার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তোমার বাবা আমাকে খুব ভালবাসতেন। বিল্টুর মুখে শুনলাম তোমার বাবা আজ আর নেই। শুনে খুব খারাপ লাগল"

একথা শুনে সুজয় তো একেবারে অবাক। সুজয় তাড়াতাড়ি বলল, "আচ্ছা মশাই দাঁড়ান দাঁড়ান, ব্যাপারটা আমাকে একটু বুঝতে দিন। কার বাবা মারা যাবার কথা বললেন?"

ছোটোমামা উত্তর দিল, "কেন আপনার বাবা?'

—কে বলল?

—কেন, আমার এই ভাগ্নে বিল্টু।

—"ও"। এই কথা বলেই সুজয় "বাবা" বলে ডাক দিল, অমনি বাবা এসে হাজির।

সুরেনবাবু আসতেই ছোটোমামাকে দেখে চিনতে পারলেন। ছোটো-মামার সঙ্গে সুরেনবাবুর কথাবার্তার পর ছোটোমামা বললেন, "আসি তবে।"

সুরেনবাবু বললেন, "হ্যাঁ, কিছুতো খেলেন না।"

—আজ থাক্। কাল পরশু আসব।

—সঙ্গে কে?

"ইয়ে এ আমার ভাগ্নে।" বলেই ছোটোমামা 'নমস্কার' জানিয়ে, বিল্টুকে নিয়ে রাস্তায় নামলেন। বিল্টুর শরীর কেমন করতে থাকল, চোখ, মুখ লাল, চোখ দুটো ফেটে জল বেরোতে খালি বাকী।

"কিরে শরীর খারাপ" ছোটোমামা জিজ্ঞাসা করল। বিল্টুর মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছিল না, শুধু মাথা নাড়ল। "চল, নিধি ডাক্তারের কাছে, ভদ্র-লোক আমার পরিচিত।"

—ডাক্তারও তোমার চেনা?

"হ্যাঁ, তোকেও নিশ্চয় চেনেন? কি বলিস?" ছোটমামা মুচকি হাসলেন।

বিল্টুর বুকে যে বিরাট পাথরটা এতক্ষণ অশ্রুর বন্যাকে ধরে রেখেছিল, ছোটমামার একটা ছোট্ট কথায় বরং বলা যায় টোকায়, তা গড়িয়ে পড়ল।

বেড়ে-ওঠা

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

লাখ টাকা পুরস্কার না থাকলেও এটা লটারিই। ফার্স্ট, সেকেণ্ড, থার্ড প্রাইজ আছে। আছে কয়েকটা সান্ত্বনা-পুরস্কারও। ভিখু জানত না, সেকেণ্ড প্রাইজটা ওর নামে উঠেছে।

দিল্লির সেন্ট্রাল বোর্ডের পরীক্ষা পাশ করে ভিখু কলকাতার একটা কলেজে ভর্তি হয়েছে। ক্লাস ইলেভেন, টুয়েলভটা স্কুলেই পড়তে পারত। পড়েনি বলা ভুল, আসলে পড়তে পারেনি। পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেলেও কলকাতার স্কুলগুলোতে জায়গা হয় নি। তারা নিজেদের ছাত্র নিতে ব্যস্ত, তা ওরা যত নম্বরই পাক। ভিখু অবশ্য এতে মুষড়ে পড়েনি। মনও খারাপ করেনি। কোনও কিছুতেই ওর মন খারাপ হয় না। নাম-করা কলেজে যে জায়গা হল না, তার জন্যও সে কষ্ট পায়নি। অহেতুক মন খারাপ করে জীবনটা কষ্টকর করে তোলার কোনও মানে হয় না। এই বয়সেই সে এটা বুঝতে পেরেছে।

ভিখুদের ক্লাসে মেয়েরাও পড়ে। সুমিতা নামের যে মেয়েটি লেবুতলা থেকে আসে, সে-ই ওকে লটারির টিকিটটা কেটে দিয়েছিল। টিকিটের দাম পঁচিশ পয়সা। এই পয়সাও ভিখুকে দিতে হয়নি। কী একটা ক্লাব ? বোধহয় নবারুণ সঙ্ঘ। ওই ক্লাবের বাড়ি তৈরির জন্য লটারি করে টাকা তোলা হচ্ছে। তারই একটা টিকিট সুমিতা ভিখুকে দিয়েছিল। ক্লাবের চেহারা ভিখু কখনও চোখে দ্যাখেনি। তার সদস্যদের একজনকেও সে চেনে না। সে শুধু জানে, ক্লাবটা সুমিতার পাড়ার। সুমিতা কিছু টিকিট বিক্রি করে দিচ্ছে। বিক্রি করছে, কিন্তু ওর কাছে দাম নেয়নি।

লটারি বা ভাগ্য-পরীক্ষায় ভিখুর বিশ্বাস নেই। নিছক ভদ্রতাবশতই টিকিটটা সে নিজের পকেটে রেখে দিয়েছিল। কোনও কিছুই সে ফেলে দেয় না। টুকরো কাগজ থেকে শুরু করে পুরনো পত্র-পত্রিকা সবই সে সমান যত্নে রেখে দেয়। লটারির হলুদ রঙের ছোট্ট টিকিটটাও রেখে দিয়েছিল। সেই টিকিটেই উঠেছে সেকেণ্ড প্রাইজ। ভিখু জানত না।

কবে লটারির খেলা, প্রাইজ উঠল কি উঠল না, এসব বিষয়ে সত্যিই ওর কোনও আগ্রহ নেই।

গ্রীষ্মের ছুটিতে কলেজ বন্ধ। গ্রীষ্ম ততটা দীর্ঘ নয়, যতটা দীর্ঘ এই ছুটি। এরই মধ্যে হঠাৎ সুমিতার চিঠি। সে লিখেছে :

ভিখু,

তোকে যে টিকিটটা দিয়েছিলাম তার নম্বর ১১০৫। আমার খাতায় নম্বরটা লেখা আছে। তুই সেকেণ্ড প্রাইজ পেয়েছিস। সাইকেল। ফার্স্ট প্রাইজ টেলিভিশন, সেকেণ্ড প্রাইজ সাইকেল আর থার্ড প্রাইজ তিন ব্যাণ্ডের রেডিও। ভেবে দেখলাম প্রাইজ হিসেবে সাইকেলটাই সেরা। তোর তো এদিক সেদিক বেরিয়ে পড়ার নেশা আছে। সাইকেলটা কাজে লাগতে পারে। কিন্তু কথাটা হল, টিকিটটা তুই রেখেছিস তো? যদি হাতের কাছে না পাস, তা হলেও বইপত্রের আলমারী, ড্রয়ার ইত্যাদি খুঁজে দেখিস। বইগুলোও উলটে-পালটে দেখে নিস। যদি কোথাও থাকে। আর যদি রেখে থাকিস, তা হলে তো কথাই নেই। চটপট এসে সাইকেলটা নিয়ে যাস।

চিঠিটা পাওয়ার পরই বাড়ির সবাই বলতে লাগল, "ভিখুর ভাগ্য খুব ভাল। না হলে এভাবে কেউ চিঠি দিয়ে প্রইজের কথা জানায়? ওকে বড় লটারির টিকিট কেটে দাও।" ভিখু কিন্তু নির্বিকার। ওদের বাড়িতে আছে দু'দুটো টেলিভিশন। প্রথমে ছিল সাদা-কালো টিভি। রঙিন টিভির চল হওয়ার পর বাবা সাদা-কালো টিভিটাকে বিশ্রাম দিলেন। কিনে আনলেন রঙিন টিভি। সাদা-কালো টিভিটাকে অবশ্য বিদায় দিলেন না। সেটাও থাকল। ছোট বড় মাঝারি রেডি-ও আছে কয়েকটা। হালকা সুন্দর একটা সাইকেলও আছে ভিখুর। ওর পীড়াপীড়িতে বাবা ওকে কিনে দিয়েছিলেন। মা আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন, "কলকাতার রাস্তায় সাইকেল চালানো ঠিক নয়। কখন কী ঘটে যায়। নিজে সতর্ক থাকলে হবে না, অন্যরা যে বেপরোয়া!" বাবা তবু ভিখুকে বিমুখ করেননি। ভিখুর যত বন্ধুত্ব বাবার সঙ্গে। এখন আরও একটা সাইকেল ও পেতে যাচ্ছে। এরপর সবাই কেন বলবে না, ভিখুর ভাগ্য ভাল।

বাবা অফিস থেকে ফেরার পথে ট্যাক্সিতে করে সাইকেলটা নিয়ে এলেন। হলুদ রঙের সাইকেল। যাকে বলে লেমন ইয়োলো, ঠিক সেই রং। আগের

সাইকেলটার মতই হালকা, সুন্দর, হালফ্যাশনের একটা সাইকেল।

প্রথম যখন বাবা সাইকেল কিনে দেন, তখন সাইকেলটাকে একেবারেই কাছছাড়া করত না ভিখু। দরকার না থাকলেও দিনের বেশিরভাগ সময় সাইকেলে করে ঘুরত। ভিখুদের বাড়ির কাছেই ডাকঘর। খাম-পোষ্টকার্ড কিনতে কিম্বা লেটারবক্সে চিঠি ফেলতে পায়ে হেঁটে যাওয়া যায়। যেতে-আসতে সময় আর কতক্ষণ লাগে। বড়জোর মিনিট ছয়েক। সাইকেলে তো আরো কম সময় লাগার কথা। তবু ভিখু তখন সাইকেলেই যেত। বন্ধুর বাড়ি, মায়ের ফাই-ফরমাশ, পাঁউরুটি, গ্যাসের দোকান—সব কাজেই সে সাইকেল ছাড়া এক পাও নড়ত না। এই এতদিন যে ওর সাইকেল ছিল না, সেটা যেন ভাবাই যায় না। সারাদিনে কতবার যে সাইকেলটার চাকা থেকে শুরু করে, সিট, হ্যাণ্ডেল, এমনকী ঘণ্টিটাকেও মোছামুছি করত, তার লেখাজোখা নেই। রাত্রে খাওয়ার পরে সবাই যখন ঘুমোতে যায়, তখনও ওর এই সাইকেল পরিচর্যার পালা শেষ হত না।

আস্তে-আস্তে মমতা কমে যায়। হয়তো এটাই নিয়ম। সাইকেলের প্রতি ভিখুর যত্নআত্তিও এভাবে কমে গেল একদিন। নতুন-কেনা বইয়ের মলাট শেলফ-এর কোণে পড়ে থাকতে থাকতে যেমন ধুলো মেখে নেয় সারা গায়ে, সাইকেলটার অবস্থাও হল তাই। বাড়িতে কাজ করে সিদান। বয়স ভিখুরই মতো। ওই সিদানই মাঝেমধ্যে সাইকেলটাকে পরিস্কার করে। আগে সাইকেলটা কাউকে ছুঁতে পর্যন্ত দিত না ভিখু। এখন সিদান ওই সাইকেলে চেপেই বাজারে যায়। দুপুরে যখন বাড়ির আর কোনও কাজ থাকে না, তখন সে ওই সাইকেলটা নিয়েই উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে বেরোয়। ভিখু আর কিছু বলে না।

এরই মধ্যে এল নতুন সাইকেল। ভিখু যতটা খুশি হল, তার চেয়েও বেশি হল বন্ধুরা। তারা হইহই করে উঠল। বয়স হলে মানুষ একটু বেশি দুশ্চিন্তা করে। মা-বাবারও ঠিক তাই। তাঁরা ভাবলেন, নতুন সাইকেল পেয়ে ভিখুর উৎসাহ-উদ্দীপনা হয়তো আবার বেড়ে যাবে। সাইকেল নিয়ে যতক্ষণ না সে বাড়ি ফিরত, ততক্ষণ তাঁদের চিন্তা কমত না। সেই চিন্তাটা আবার নতুন করে তাঁদের মনে উঁকিঝুঁকি মারতে থাকল। কিন্তু অবাক করল ভিখু। নতুন সাইকেলের প্রতি ওর যতটা অসক্তি জন্মাবে ভাবা গিয়েছিল, তার ছিটেফোঁটাও দেখা গেল না। ভিখুদের বাড়িতে গ্যারেজ আছে, গাড়ি নেই। সাইকেল দুটো গ্যারেজেই

থেকে গেল। এমনকী, সিদানও আজকাল দুপুরের রোদে সাইকেল নিয়ে ঘুরতে বেরোয় না। বাবা মাঝেমধ্যেই একটা কথা বলতেন। কলকাতা শহরটা না মানুষের পায়ের চাপে একদিন বসে যায়। পা রাখারই জায়গা নেই, তার ওপর সাইকেল! ভিখুই ছিল এ-ধরনের কথার লক্ষ্য। এখন আর বাবা পর্যন্ত এ-ধরনের কথা বলেন না।

আসলে ভিখুর যখন যা মাথায় ঢোকে! এই যেমন, এখন ওর মাথায় ঢুকছে বাগান। ভিখুর বাবা নতুন বাড়ি করেছেন। খোলামেলা বাড়ি। এই কিছুদিন আগেও ওরা ভাড়া বাড়িতে থাকত। ওই বাড়ির বারান্দায়, ছাতে টবে অনেক গাছ লাগিয়েছিল ভিখু। ওদের ফ্ল্যাট ছিল নীচের তলায়। একেবারে পাঁচতলার ছাতে বালতি বালতি জল নিয়ে গিয়ে টবের গাছগুলোয় জল দিত ভিখু। ওই বাড়িটার পিছন দিকে অল্প কিছুটা জমি পড়ে ছিল। সেখানে ছিল একটা নলকূপ। পাশের বাড়ির পাঁচিলের ধারেই ছিল ডালিমগাছ। ডালিমের টুকটুকে লাল ফুল ঝরে পড়ত নলকূপের ওপর। ছোট বড় কিছু ডালিমও ধরত। সে ডালিম ভিখু কখনও কাউকে খেতে দ্যাখেনি। কিন্তু ওই গাছটার দিকে তাকিয়ে জানলার ধারে বসে থাকতে থাকতে ভিখুর হঠাৎ একদিন বাগান করার ইচ্ছা হয়েছিল। লাগিয়েও ছিল কিছু গাছ। তবে ফুলগাছ নয়। কী করে যেন পেঁপেগাছের চারা, কুমড়োর বীজ সে যোগাড় করে এনেছিল। পেঁপেগাছের পেঁপে বিশেষ বড় হয়নি। বড় হওয়ার আগেই নষ্ট হয়ে যেত। কুমড়োও ধরেছিল। তবে সেও বেশ ছোট। ওই ছোট পেঁপে ও কুমড়োই মাকে পেড়ে এনে দিয়েছিল ভিখু। বলেছিল, "তরকারি করো। আজ আর বাবাকে বাজারে যেতে হবে না।" তখন সে আরও ছোট্ট। বোঝার বয়স হয়নি যে, এতটুকু পেঁপে বা কুমড়ো কোনও কাজে লাগে না। মা তবু রান্না করে দিয়েছিলেন। সেদ্ধ হওয়ার সময়ই কচি পেঁপে গলে কাদা হয়ে গিয়েছিল। বাজার থেকে বাবার কিনে-আনা পেঁপের ফালি ঝোলের বাটিতে পেয়েও ভিখু কিছু বুঝতে পারেনি।

সেই ভিখু এবার ওদের নিজেদের বাড়িতে বাগান করার আনন্দে মেতে উঠেছে। বাড়ির বড়-বড় ঘর দেখে ভিখু ভাবে, বাবার মনটাও নিশ্চয় বড়। না হলে ঘুপচি একটা বাড়ি না করে এত সুন্দর-সুন্দর ঘর তিনি তৈরি করবেন কেন? আবার এও ভাবে যে, বাগানটা আরও একটু বড় হলে ভাল হত। তবে এই ভাবনাটাকে বেশি প্রশ্রয় দেয়নি

সে। যা পায় তাই নিয়েই সে খুশি থাকতে জানে। আর এটাও ঠিক ভিখু আগের চেয়ে বড় হয়েছে। আগে ভাবত, বাবাকে যাতে বাজারে গিয়ে কষ্ট করতে না হয় তার জন্য সে অল্প একটু জায়গা পেলেও তরি-তরকারি লাগিয়ে দেবে। এ-ধরনের চিন্তার জন্য ওকে অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না। সে ঘুম থেকে ওঠার অনেক আগেই বাবা বাজারে চলে যান। বর্ষার দিন ভোরবেলা আকাশ মেঘলা থাক, কিংবা বৃষ্টি পড়ুক বাবা তবু বাজারে যাবেনই। কি গ্রীষ্ম, কি শীত তাঁর এই রুটিনের কোনও নড়চড় হয় না। বাজার থেকে ফিরে চা খেতে খেতে বাবা সকালের খবরের কাগজটায় একটু চোখ বুলিয়ে নেন। সকালে তাঁর বসার সময় বলতে এইটুকুই! তারপরই স্নানের পালা। স্নান সেরে প্যান্ট-শার্ট পরে এসেই খাবার টেবিলে তিনি বসে পড়েন। বাবা বাজার থেকে ফেরার আগেই মায়ের ভাত-রান্না হয়ে যায়। উনি ফিরলে মাছের ঝোলটুকু শুধু রেঁধে দেন। ইলিশ বা গুরজালি মাছ হলে সরষে। বৈচিত্র্য বলতে এটাই। এর বেশি কিছু নয়। এই রকমই চলছে। ভিখু ভাবত, বাবাকে যদি সকালে এরকম ছুটো-ছুটি করতে না হয়, তা হলে তিনি হাতে অনেকটা সময় পাবেন। বাজারে যেতে যে বাবার ভালো লাগে, বেছে বেছে মাছ বা তরি-তরকারি কিনে তিনি যে খুশি হন, এটাই সে বুঝতে পারেনি।

সেই ভিখু আর নেই। বাড়ির পাঁচিলের ধারে সারি বেঁধে লাগাল দেবদারু। ফুলের গাছ মুসাণ্ডা। তার তিনটে রং—লাল, সাদা ও গোলাপি। গোলাপিটাই ওর পছন্দ। লাগাল আরও কত ফুলের গাছ। ফুরুশ, রঙ্গন, টগর। গেটের ধারে পনসেটিয়া। শীতের সময় তার পাতা লাল হয়ে যায়। বছরের বাদবাকি সময় তার পাতা থাকে আর পাঁচটা গাছের মতো সবুজ। কে যেন বলেছিল, মাত্র কয়েকটা দিন লাল রঙের পাতা দেখার জন্য সারাটা বছর সাদামাটা একটা গাছ পোষার কোনও মানে হয় না। ভিখু কথাটাকে আমল দেয়নি। বছরে কয়েকটা দিনও যদি তার কাছ থেকে কিছুটা মাধুর্য আদায় করে নেওয়া যায়, তাই বা কম কী! এভাবেই গড়ে উঠেছে ওর বাগান। ঘাসের বীজ বুনে কিছুটা লনও করেছে। ওর এই বাগানের গাছপালা এমন কিছু নতুন নয়। তবু ওর ভাল লাগে। ছুটি পেলে তো কথাই নেই, কলেজে যাওয়ার আগে কিংবা কলেজ থেকে ফিরে কিছুটা সময় ভিখু ওর এই বন্ধুদের কাছে কাটিয়ে দেয়। নতুন বাগান। এখনও পরিপূর্ণতা পায়নি। তবু আনন্দটা তো কম নয়।

দেবদারুগুলো যখন সে কিনে আনে, তখন নার্সারির লোকটি বলেছিল, এগুলো হল উইপিং দেবদারু। গাছগুলো বড় হলে হাওয়ায় হাওয়ায় ওদের পাতায় শব্দ হবে। তাই ওই নাম—উইপিং দেবদারু। উইপিং

কথাটা ভাল লাগেনি ভিখুর। কান্না ভাল নয়। যে কেউ কাঁদুক, আমরা তার কান্না মুছিয়ে দিতে চাই। উইপিং-এর বদলে অন্য কিছু বলা যেত না। কল্পনার এত ঘাটতি থাকবে কেন? মনে পড়ল, বছর-কয়েক আগে বাবা, মা, দাদার সঙ্গে ভিখু মুসৌরি বেড়াতে গিয়েছিল। হোটেলের শহর মুসৌরি। হোটেল ছাড়া যেন আর বিশেষ কিছু নেই। ওই মুসৌরিতেই পাহাড়ি রাস্তা ধরে একটা হোটেলের হোর্ডিং ওর চোখে পড়েছিল। হুইস্পারিং উইনডো। শিবালিক পাহাড়ের ফাঁক-ফোকর দিয়ে বয়ে-যাওয়া হাওয়া যেন বন্দী জানলার কানে-কানে কথা বলে। ভারী সুন্দর নাম। উইপিং দেবদারু কিন্তু মোটেই সেরকম নাম নয়। আর একটু কবিত্ব থাকলে দোষ কী! ভিখুর ঘরের জানালা দিয়ে দেবদারুগুলো দেখতে-দেখতে ওর এই কথাই মনে হয়।

ভিখুরা যে পাড়ায় বাড়ি করেছে সেই পাড়াটাও নতুন। কলকাতা বলে মনেই হয় না। প্রচুর গাছগাছালি। সবসময় সবুজের ছায়া ওদের ঘিরে রাখে। কলকাতায় থেকেও মনে হয় মফস্বলের সবুজ কোনও গ্রামে আছি। কলকাতার সব সুবিধেই এখানে আছে। যা নেই তা হল, ভিড়, ধোঁয়া, ধুলো আর হই-হট্টগোল।

ভিখুদের দক্ষিণমুখী বাড়িটা বড় রাস্তা থেকে একটু ভেতরে। বড় রাস্তার মতো না হলেও বেশ চওড়া একটা রাস্তাই এঁকেবেঁকে এসে ভিখুদের বাড়ির গা ঘেঁষে শেষ হয়েছে। রাস্তার মোড়ে পাঁচতলা একটা ফ্ল্যাট-বাড়ি। আরও কয়েকটা বাড়ি উঠেছে। ভিখুদের বাড়ির ঠিক উলটো দিকের জমিটায় এখনও বাড়ি ওঠেনি। মাঝখানে চওড়া রাস্তা। তারপরেই ওই জমিটা। কার জমি জানা যায় না, তবে জমিটা ফাঁকা নেই। জঙ্গলে ভরে গেছে। শিবরাত্রির সময় ওখানেই ফোটে ঘেঁটুফুল। ঈষৎ তপ্ত বাতাসে মৃদু গন্ধ ভেসে আসে। আবার বর্ষায় সময় সাদা সাদা, পুরনো দিনের গ্রামোফোনের চোঙার মতো ধুতরো ফুলও ফোটে। এমন অনেক গাছ যার নাম ভিখু জানে না। ওদের যখন বাড়ি তৈরি হচ্ছিল, তখন রাজমিস্ত্রিরা ওই জঙ্গলে ঢুকে কাঁকরোল পেড়ে আনত। থোক-বাঁধা কাঁকরোল। ওদের চোখ আছে বলতে হবে। না হলে কী করে টের পেল! জমিটার পূর্ব ও দক্ষিণ দিক ঘেঁষে বাণেশ্বর ভট্টাচার্যের বিশাল বাগান-ওলাবাড়ি। তিনি এই অঞ্চলের একেবারে আদি বাসিন্দা। তখন এই সব জায়গায় দিনদুপুরে শেয়াল দেখা যেত। দেখা যেত বলা হয়তো ঠিক হবে না। তারা নির্বিবাদে ঘুরে বেড়াত।

শেয়াল অবশ্য এখনও দেখা যায়। অন্যরা শুধু রাতের প্রহরে শেয়ালের ডাক শুনতে পায়। কিন্তু ভিখুর চোখে ওরা নিয়মিত ধরা পড়ে। গ্রাম-গঞ্জেও নাকি আজকাল শেয়াল চোখে পড়ে না। অথচ ভিখু এই কলকাতা শহরে থেকেও শেয়াল দেখতে পাচ্ছে। যত বাড়ি উঠছে, শেয়ালরা তত গা-ঢাকা দিচ্ছে। কিন্তু ভিখুদের বাড়ির সামনের জঙ্গল যত সংক্ষিপ্তই হোক, শেয়ালরা সেটাকেই নিরাপদ আশ্রয় বলে গ্রহণ করেছে। এখানে আসার পর ভিখুর সঙ্গে ওদের এতবার দেখা হয়েছে যে, ভিখু বুঝতে পেরেছে মাত্র একটি শেয়াল-পরিবারই ওখানে থাকে। একটি ছোট বাচ্চা নিয়ে মা ও বাবা-শেয়াল কখন খাবারের খোঁজে বাইরে বেরোবে তাও ভিখু জেনে ফেলেছে। কখন ওরা দল বেঁধে বেরোয়, কখন একা-একা তাও সে জানে। বাবা, মা ও দাদাকে ডেকে এনে কয়েকবার শেয়াল দেখিয়েছে ভিখু। রাত্রে খাবার পর বারান্দায় গিয়ে বসে থাকে। পাঁচতলা বাড়ির সামনে ফ্লাডলাইটটা জ্বললে শেয়ালদের দেখা যাবে না, তা সে জেনে ফেলেছে। ওই বাড়ির লোকেরা মাঝেমধ্যে বাতিটা জ্বালায় না। হয়তো ভুলে যায়। ভিখু জানে, আজ ওদের দেখা পাবেই।

তাকে ওরা নিরাশ করে না।

ওই জঙ্গলে একটা বেজিও থাকে। তাকে অবশ্য অন্যরা দেখেছে। এক ঝোপ থেকে আর এক ঝোপে মুখ নিচু করে সে ঘুরে বেড়ায়। সকাল, দুপুর, বিকেল—ওকে যখনই দেখা যাক, ওর আচার-আচারণের কোনও তারতম্য চোখে পড়ে না। কিন্তু একমাত্র ভিখুই ওকে একবার ভয় পেয়ে দৌড়ে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে যেতে দেখেছিল। ভয়-পাওয়া মানুষের মতোই তখন ওর আচার-আচরণ। দৌড়চ্ছে, আর মাঝেমধ্যেই পিছন ফিরে তাকাচ্ছে। হয়তো কোনও মানুষই ওকে তাড়া করেছিল। নতুন সব বাড়ির আনাচে-কানাচে পড়ে-থাকা ইটের টুকরো ছুঁড়ে মেরেছিল। কিন্তু মানুষের পাড়ার মধ্যে থেকেও শেয়ালদের কখনও এরকম ভয় পেতে দ্যাখেনি ভিখু।

মা বলেন, "সত্যিই তোর ভাগ্যটা ভাল ভিখু। না হলে অন্যেরা কেন শেয়ালের দেখা পায় না? তুই যে খুব ভাল। তাই ওরা তোকে দেখা দেয়। দেখিস, তুই একদিন খুব বড় হবি।"

"শেয়ালের সঙ্গে আমার বড় হওয়ার কি সম্পর্ক মা? এটা তোমাদের সংস্কার। কুসংস্কার বা সুসংস্কার কোনওটাই ভাল নয়।"

এটা এক রবিবারের বিকেলের কথা। কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছিল। সেদিনই শুধু বৃষ্টি হয়নি। তা হলেও আকাশটা ছিল মেঘলা। এই পাড়ায় জল জমে না, রাস্তাঘাটেও কাদা হয় না। বর্ষায় গাছপালার রং আরও সবুজ হয়ে উঠেছে। বাণেশ্বর ভট্টাচার্যের বাগানের নারকোল, জামরুল, পেয়ারা ও জামিরগাছগুলোর দিকে থেকে আর চোখ ফেরানো যায় না। একটা কলকেগাছও বর্ষার দাক্ষিণ্যে রাতারাতি স্বাস্থ্যময় হয়ে উঠেছে। ভিখুদের বাড়ির সামনের জঙ্গলটায় লতাপাতা, ঝোপঝাড় সব মিলেমিশে একাকার। টিভিতে তখন একটা, রবিবারের দুপুরের সিনেমাটা শেষ হয়ে আসছিল। দোতলার বারান্দা থেকে ভিখু দেখল, বাণেশ্বরবাবুর বাগানে তিনটে শেয়াল নিশ্চিন্তে শুয়ে-বসে আছে। বারান্দা থেকে বাগানের পিছনের অংশটা দেখা যায়। বাগানের সামনের দিকটায় বাণেশ্বর-বাবুর বাড়ি। ভিখু আরও দেখল, তিনটে শেয়ালের মধ্যে যেটা বড়, সেটা সজাগ দৃষ্টি রেখেছে বাণেশ্বরবাবুর বাড়ির দিকে। বেড়া টপকে বাগানের পিছন দিকে গিয়ে কেউ অতর্কিতে ওদের ওপর হামলা করতে পারবে না। কেউ এলে সামনের দিক দিয়েই আসবে। শেয়ালটা হুঁশিয়ার হয়ে তাই

সামনের দিকটাই পাহারা দিচ্ছে। ভিখু টিভির ঘর থেকে চুপিচুপি বাবা, মা ও দাদাকে বারান্দায় ডেকে নিয়ে গেল। বাবা ও মা দেখলেন, এই নিশ্চিন্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে ওদের সুন্দর মানিয়েছে। কলকাতা। এখানে আর কলকাতা নেই। ভিখুর দাদাও এটা মানল। ভিখুর সব কাজেই ওর সমর্থন। দাদা এসব দেখে মজা পায়। হাহা করে হাসে। ওর হাসিটা বেশ প্রাণখোলা। ভিখু জানে, দাদাই ওর একমাত্র বন্ধু। দাদা ওর মনে সেই নিশ্চিন্ততার আশ্বাস বরাবরের জন্য দিয়ে রেখেছে।

টিভির ঘরে ফিরে এসে মা কথাটা বাবাকে বললেন, "দেখো ও একদিন খুব বড় হবে। ওর কী মমতা। আর আশ্চর্য সুন্দর দেখার চোখ।" বাবা তখন মিটমিট করে হাসছেন।

"দেখার চোখ তো সামুরও কম নয়।"

সামু হল ভিখুর দাদা।

"সেই দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে কী ঘটেছিল মনে আছে? ওরা তখন খুব ছোট, সামুর বয়স আট, আর ভিখুর সাড়ে ছয়। দার্জিলিঙে গিয়ে সে কী ফ্যাসাদ। কার্সিয়াং থেকে সেই যে শুরু হল বৃষ্টি তার আর থামার লক্ষণ নেই। দার্জিলিঙে মিনিবাস থেকে নেমে গেস্ট হাউসে পৌঁছতে-পৌঁছতেই আমরা সবাই ভিজে একেবারে কাদা হয়ে গেছিলাম। আর কী ঠান্ডা! বৃষ্টি দু'দিন ধরে চলল। এই থামে তো, আবার পুরোদমে শুরু হয়ে যায়। যে সাতদিন ছিলাম, পুরো রোদ উঠতে দেখিনি। আশা করিনি, কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পাব। কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রথম দেখেছিল ভিখু আর সামু। সকালবেলা ঘুম ভাঙলেও আমি লেপ-মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলাম। চায়ের খোঁজে তুমি কেয়ারটেকারকে খবর দিতে গেলে। ভিখু আর সামু কিন্তু অনেক আগেই ঘুম থেকে উঠে বাইরে বেরিয়েছিল। বৃষ্টি তখন ধরেছে। মেঘও ততটা ছিল না। গেস্টহাউসের বাইরে একটা করবীগাছের কাছে দাঁড়িয়ে ওর দুই ভাই কী করছিল, ওরাই জানে। হঠাৎ দৌড়ে এসে আমাকে ডেকে বলল, 'এক্ষুনি চলো। কাঞ্চন-জঙ্ঘা দেখলাম।' আমি বললাম, 'তোরা মেঘ দেখে কাঞ্চনজঙ্ঘা বলে ভুল করছিস।' ভিক্ষু আর সামু দু'জনেই তখন বলল, 'না, ভুল হয়নি। আমরা বইয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার ছবি দেখেছি। তুমি দেখবে চলো।' বিছানা ছেড়ে উঠে না গেলে সত্যিই সেদিন ভুল করতাম। দেখলাম কাঞ্চনজঙ্ঘার গায়ে কিছু মেঘ লেগে থাকলেও স্পষ্ট শরীর নিয়ে সে চোখের সামনে

দাঁড়িয়ে আছে। তোমার মতো আমিও সেদিন বলেছিলাম, 'তোদের কপাল ভাল। এই বৃষ্টি-বাদলে কাঞ্চনজঙ্ঘা তোদের দেখা দিল।' তারপর তুমিও গিয়ে দেখলে। কাঞ্চনজঙ্ঘা তার কিছু পরেই মেঘের আড়ালে হারিয়ে গেল। যে সাতদিন ছিলাম আর কাঞ্চনজঙ্ঘার দেখা পাইনি।"

বাবা এমনভাবে কথাগুলো বলছিলেন যেন দার্জিলিঙের সেই গেস্ট-হাউসে গিয়ে উঠেছেন। নিজের ছেলেমেয়েদের নিয়ে মা-বাবার কিছু-কিছু অন্ধ আবেগ থেকেই যায় কিন্তু ভিখু আর সামু এমন দুটি ছেলে যে, ওদের ভাল না বেসে পারা যাবে না। এই বয়সেই বাইরের পৃথিবীর কত খোঁজখবর রাখে ওরা। কুড়ি বছরেরও বেশি দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউনের পলসমুর কারাগারে বন্দী হয়ে আছেন নেলসন ম্যান্ডেলা। কারাগারে বন্দী থাকতে-থাকতেই তাঁর বয়স সত্তর হয়ে গেল। জীবনের আর বাকি থাকল কী। কালো মানুষদের তিনি দিতে চেয়েছিলেন মুক্ত আলো-হাওয়ার অধিকার। তাঁর জন্মদিনে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে মাইক টাইসন দিয়েছেন তাঁর বিশ্বজয়ী দস্তানাজোড়া। সেই দস্তানায় চ্যাম্পিয়ান বক্সার তাঁর নাম সই করে দিয়েছেন। চলচ্চিত্র পরিচালক বার্নার্ডো বার্তোল্লুচি দিয়েছেন তাঁর অস্কার পুরস্কার। হাজার-হাজার মানুষ টি-শার্টে তাঁদের বুকের মাঝখানে এঁকে দিয়েছেন প্রিয় ম্যান্ডেলার মুখ। পুলিশ এসে সেইসব টি-শার্ট তাদের গা থেকে খুলে নিয়ে গেছে। ছোট-ছোট ছেলেরাও ম্যান্ডেলার মুক্তির জন্য রাস্তায় রাস্তায় নেমে পড়েছে। ভিখু ও সামু এ সব খবরই রাখে। ওরা খোঁজ রাখে কোথায় কী ঘটছে। বাবা এজন্য দেশ-বিদেশের অনেক পত্র-পত্রিকা ওদের কিনে দেন। কিনে দেন বই। ক্রিকেটার রিচার্ডস, গ্রিনিজ ও মার্শালের আত্মজীবনী থেকে শুরু করে বিজ্ঞাপন-পত্রিকা ওমনি। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক। বাইরের পৃথিবীর যে-ক'টা জানালা পারা যায় ওদের জন্য খুলে রাখতে চান বাবা।

চোখ-কান যে ওরা কতটা খুলে রাখে তার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। কখন কেমন করে ফুল ফোটে তা কি কেউ কখনও দেখেছে? দেখলেও ক'জন দেখেছে? গাছে কুঁড়ি ধরল, সেই কুঁড়ি একটু-একটু করে বড় হল, তারপর একদিন সকালে কিংবা সন্ধ্যায় দেখা গেল ফুল ফুটেছে। এটুকু তো সবার জানা। সবাই কখনও-না-কখনও এটুকু তো দেখেছেই। কিন্তু ফুল ফোটার চূড়ান্ত মুহূর্তের সাক্ষী কে হতে পারে? সেই মন, সেই সময় ক'জনের আছে! ভিখু কিন্তু ফুল ফুটতে দেখেছে। দাদাকে এনে

দেখিয়েছে।

ওদের বাড়ির জমিটা বেশ কয়েক বছর আগেই কেনা ছিল। সেই জমিও ঝোপঝাড়ে ভরে গিয়েছিল। ঝোপঝাড় পরিষ্কার করেই বাড়িটা তৈরি হয়। বাড়িটা তৈরি হয়ে যাওয়ার পর বর্ষায় একদিন দেখা গেল বারান্দায় ওঠার সিঁড়ির ঠিক পাশেই দুটো ভুঁইচাপাগাছ মুখ তুলেছে। গাছ দুটো আর কেটে ফেলা হলো না। বর্ষায় আর পাঁচটা গাছের সঙ্গে বেড়ে উঠতে থাকল। সেই ভুঁইচাঁপাতেই এল কুঁড়ি। লম্বা, মোটা একটা ডাঁটায় ছোট মোচার মতো কুঁড়ি। সেই কুঁড়ি আস্তে আস্তে বড় হল। তারপর একদিন এসে পড়ল ফুলগুলোর পাপড়ি মেলে দেওয়ার দিন। রোজ সকাল-সন্ধ্যে সিঁড়িতে বসে-বসে ভিখু ওদের এই সুন্দর হয়ে ওঠার মুহূর্তগুলোর ওপর খুঁটিয়ে নজর রাখছিল। মা এসে বকাঝকা করেছেন। "লেখাপড়া নেই? উচ্চ মাধ্যমিকের পড়া সারা বছর ধরেই পড়তে হয়। এত বড় সিলেবাস যে কূল পাওয়া যায় না। বসে-বসে ফুল ফোটা দেখলেই চলবে?" ভিখুকে কিন্তু ওর জায়গা থেকে একচুলও নাড়ানো যায়নি। বাবা পর্যন্ত রাগারাগি করেছেন। "এ কী পাগলামি! লোকে শুনলে বলবে কী! চাঁদ কিংবা ফুল নিয়ে এরকম পাগলামি করলে তো লোকেরা আজকাল হাসে। ক্লাসের পড়ায় ফাঁকি দিয়ে এসব করা চলবে না।" ভিখু শুনলে তো! ওর তো আসল পড়া এখন শুরু হয়ে গেছে। ওর শিক্ষক এখন ওই ভুঁইচাপাগাছ দুটো।

ভিখু গিয়ে ওর দাদাকে বলল, "চল, ফুল ফোটার সময় হয়ে গেছে।"

ওরা দু'ভাই সিঁড়িতে গিয়ে বসল। সেদিন একটু আগে বৃষ্টি হয়েছিল।

"কী করে বুঝলি, এখনই ফুলগুলো ফুটবে?" সামু প্রশ্ন করল।

"সব ফুল একসঙ্গে ফোটে না। আমি গুণে দেখেছি দুটো গাছে আজ পাঁচটা ফুল ফুটবে। যে-কোনও মুহূর্তে ফুটে উঠবে। বসে থাক, দেখতে পাবি।"

"তুই বুঝলি কী করে ফুলগুলো আর একটু পরেই ফুটে যাবে? কী করে বুঝলি সেটাই জানতে চাইছি।"

"ওই দ্যাখ, অন্য কুঁড়িগুলো এখনও ফেঁপে ওঠেনি। পাপড়ি মেলে দেওয়ার জন্য ভেতর থেকে তাগিদ আসে। নিজেদের মেলে ধরবার আগে পাপড়িগুলো আস্তে-আস্তে ফুলে-ফেঁপে ওঠে। দ্যাখ, আলপিনের চেয়েও

পাতলা পরাগ-কেশর কেমন বেরিয়ে পড়েছে। আর দেরি নেই।"

এমন সময় হাওয়া উঠল। রাস্তার পাশের নিমগাছের পাতা ঝাঁকানো কয়েক ফোঁটা জল এসে পড়ল ভুঁইচাপার কুঁড়িতে। ভেতরের তাগিদ, আর বাইরের আহ্বান। ফুল ফুটতে কি আর দেরি হয়। পাপড়িগুলো যেন বকের মতো সাদা ডানা মেলেছে। এখনই উড়ে যাবে। ওদের মধ্যে শান্ত, কিন্তু খুব জোরালো একটা গতি অনুভব করল ভিখু। নতুন পৃথিবীর আলো-হাওয়া ওদের সবাইকে ডাকছে।

এখানে সবই নতুন। বাড়িঘর রাস্তাঘাট। এমনকী মানুষগুলোও নতুন, আগে ওরা কে কোথায় ছিল বোঝার উপায় নেই। এখানকার খোলা আলো-হাওয়া ও গাছগাছালি দেখে জায়গাটাকে সবাই ভালবেসে ফেলল। বাড়ি করল! ভিখুর বাবাও ওদের একজন। কাছাকাছি একটা জায়গায় ভাড়া-বাড়িতে থাকতে-থাকতে তিনিও জায়গাটাকে ভালবেসে ফেলেন। তবে তাঁকে এখানকার লোক তেমন চেনে না। চেনে সামু ও ভিখুকে। এই নতুন পাড়ায় ওদের বাড়িতে যারা প্রথম আসে, তারা যদি বাড়িটা চিনতে না পারে, তখন পাড়ার লোকেরাই বলে দেয়, "ওই বাড়িটা। সমু ও ভিখুদের বাড়ি।" বিশেষ করে ভিখুকে ওরা সবাই চেনে। সামু এতদিন হোস্টেলে থেকে পড়ত। তা ছাড়া সে তেমন মিশুকে নয়। তাই ওর সঙ্গে এখানকার কারও তেমন আলাপ-পরিচয় জমে ওঠেনি। তবে ওর প্রতিও পাড়ার লোকদের স্নেহ-ভালবাসা কম নেই।

কিন্তু ভিখুর এমন স্বভাব যে, খুব সহজেই ওর সঙ্গে সবার আলাপ-পরিচয় হয়ে যায়, পড়ার সবচেয়ে রাশভারী লোকটি থেকে রিকশাওলা—কার সঙ্গে ওর আলাপ নেই।

একদিন দুপুরবেলা কলেজের ছুটি হয়ে গিয়েছিল। ভিখু বাসে চেপে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে এসে গাছতলায় চুপচাপ বসেছিল। তখন জানুয়ারী মাস। ভিক্টোরিয়ায় যাওয়ার কথা সে বাড়ির কাউকে বলেনি। বলার দরকারও হয়নি। ঘটনাটা জানা গেল আরও পরে। শেষ বর্ষায় সেই যেদিন একটা চিঠি এল ভিখুর নামে। খামের ডাকটিকিট আর প্রেরকের নাম দেখে বোঝা গেল, চিঠিটা এসেছে আমেরিকা থেকে। ভিখুর পিসিমা ও পিসেমশাই থাকেন আমেরিকায়। হাতের লেখা দেখে বোঝা গেল, চিঠিটা তাঁরা লেখেননি। তা হলে কে চিঠি লিখবে ভিখুকে, সুদূর আমেরিকা

থেকে।

সামু সেদিন বাড়িতে ছিল। খামটা সেই-ই খুলল। ইলেকট্রনিক টাইপ-রাইটারে টাইপ করা দু'পাতার চিঠি। তারিখ ৪ঠা জুলাই। বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়ঃ

প্রিয় ভিখু,

তুমি আমাকে মনে রেখেছ কি না জানি না। কলকাতায় মিউজিয়ামের বাইরে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল গত জানুয়ারি মাসে। তোমার সঙ্গে কথা হয়েছিল। প্রায়ই তোমার কথা আমার মনে পড়েছে। তোমাকে আমি কথা দিয়েছিলাম চিঠি লিখব। সেই প্রতিশ্রুতি আমি ভুলিনি। তুমি যদি এই চিঠির উত্তর দাও, তা হলে কথা দিচ্ছি এরপর খুব তাড়াতাড়ি তোমাকে চিঠি দেব। আমি যে এতদিন তোমাকে চিঠি লিখতে পারিনি, তার কারণ ভারত থেকে ফিরেই আমি চোখ নিয়ে বেশ ঝামেলায় পড়েছিলাম। ওখান থেকে ফিরে আসার কয়েকদিন পরেই আমার চোখের একটা রেটিনা ডিটাচ্ড হয়ে গিয়েছিল। একটা সময় মনে হয়েছিল, আমি আর দেখতে পাব না। কিন্তু অস্ত্রোপচারের পর চোখটা এখন অনেক ভাল হয়ে উঠেছে। দু-তিন মাসেব মধ্যেই মনে হয় সব ঠিক হয়ে যাবে। আমাকে কয়েকদিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। তারপরেও কয়েক সপ্তাহ বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে থাকলাম। তখনও ভাল দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্মের মাঝখানেই এই দুর্ঘটনা ঘটল। অনেক কাজ জমে উঠেছিল। সেগুলো সারতে-সারতেই অনেক সময় লেগে গেল। অনেক চিঠিপত্রেরও উত্তর দিতে হল।

তোমাকে এই চিঠি লেখার সময় বুঝতে পারছি না, কী কী বিষয় তোমার জানতে ইচ্ছে করছে। আমি অ্যালাবামা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব সোশ্যাল ওয়ার্ক-এ ডক্টরাল প্রোগ্রামের আমি চেয়ারম্যান। গবেষণার কর্মসূচী আমি পরিচালনা করি। ছাত্র ভর্তি, তাদের আর্থিক সাহায্য ইত্যাদি বিষয় আমিই দেখাশোনা করি। যে ফ্যাকাল্টিতে এই ছাত্রদের পড়ানো হয়, আমি তার সঙ্গে যুক্ত। যেসব ছাত্র পিএইচ. ডি-র জন্য গবেষণা করছে তাদের পরিচালন-সংস্থার আমি চেয়ারম্যান।

অ্যালাবামায় এটাই আমার শেষ বছর। ১৯৮৯-এর মে মাসে আমি অবসর নেওয়ার কথা ভাবছি। লেখালিখি ও অধ্যাপনার কাজ হয়তো ছেড়ে দেব না। তবে বিশেষ-বিশেষ গবেষণা কর্মসূচী থাকলে আমি অল্প সময়ের জন্য অন্য কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ছাত্রদের দায়িত্ব নেব। ঠিক এই মুহূর্তে হংকং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমার কাছে আমন্ত্রণ এসেছে। এক বছর সেখানে পড়ানোর জন্য তাঁরা আমাকে এই আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তবে যাব কি না এখনই ঠিক বলতে পারছি না।

আমি কয়েকটা বই লিখেছি, কিছুদিন আগে আর-একটা বইয়ের কাজও শেষ করলাম। বেশ কয়েক মাস আগেই বইটার কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু চোখের জন্য দেরি হয়ে গেল। এই সপ্তাহেই আমি আর একটা বইয়ের কাজ শুরু করছি।

আজ আমেরিকায় ছুটির দিন। ইংল্যাণ্ডের কাছ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরের দিনটি আজ উদযাপিত হচ্ছে। ভারতের মত আমরাও একসময় উপনিবেশ ছিলাম। হাতের জমে-ওঠা কাজ সেরে ফেলার জন্য আজ আমি দিনটাকে কাজে লাগাচ্ছি। তবে এই দিনটিতে লোকেরা পিকনিক করতে যায় কোনও নদী বা হ্রদের ধারে, পার্কে। রাত্রে হরেকরকম আতশবাজি পোড়ায় অনেকেই। এক-একটা পরিবারও আতসবাজি পুড়িয়ে এই দিনটি উদযাপন করে। গতকাল মাঝরাতে পড়শিরা পটকার আওয়াজে আমাকে ঘুমোতে দেয়নি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্বের একটি রাজ্য অ্যালাবামা, এ হল মেক্সিকো উপসাগরের কূলে। এই রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে আছে সুন্দর-সুন্দর সব সৈকত। আর আছে ঢেউ-খেলানো পাহাড়। অ্যাপলাচিন পর্বতমালার পাদদেশ। বছরের অধিকাংশ সময়ই এখানকার আবহাওয়া আর্দ্র ও স্নিগ্ধ। তবে গ্রীষ্মের সময় খুব গরম পড়ে, আর্দ্রতাও খুব বেড়ে যায়। আমি যেখানে আছি তার জনসংখ্যা লাখখানেক। যে-বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি পড়াই তার ছাত্র সংখ্যা ১৮ হাজার। এটা আমার ভাল লাগে। ভাল লাগে এখানকার আবহাওয়াও। আমার জীবনের অধিকাংশ সময়ই আমি

পড়িয়েছি মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে একটা ক্যাম্পাসে ৬০ হাজার ছাত্র থাকত। আর ওখানের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৩০ লাখ। মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয় হল মিনিয়াপোলিশ-এ। এটা কানাডা থেকে মাত্র প্রায় ২০০ মাইল দূরে। আমেরিকার শীতলতম শহর এটাই। জানুয়ারী মাসে তাপমাত্রা প্রায় শূন্য ডিগ্রি ফারেনহাইটের ৩২ ডিগ্রি নীচে নেমে যায়। তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ, আবহাওয়া ও বাসযোগ্যতার চূড়ান্ত এক বিন্দু থেকে আর এক চূড়ান্ত বিন্দুতে আমি চলাফেরা করেছি।

আমার দুই মেয়ে। নিউ জার্সি'র রাটজার্স বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন দর্শনশাস্ত্রে পি. এইচ. ডি. করছে। অন্যজন কানাডার এক বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেয়ারি সায়েন্স এ ডিগ্রি ক্লাসে পড়ছে। আমার দুই নাতনি ও এক নাতি আছে। তারা সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। একজন পড়ছে ম্যাসাচুসেট্স-এর বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে। অন্য দু'জন পড়েছে কানাডার ওয়াটার্লু বিশ্ববিদ্যালয়ে।

প্রথম চিঠিতে হয়তো অনেক কথাই লিখে ফেললাম। আমেরিকা সম্বন্ধে এমন কিছু কি আছে, যা তুমি জানতে চাও? ভারতের কী কী কথা তুমি আমাকে জানাবে? তোমাকে জানাই আন্তরিক স্নেহ-সম্ভাষণ।

ইতি—
বিউলা কম্পটন

চিঠিটা পড়ে সবাই অবাক। ঠাকুমা'র বয়সী এক ভদ্রমহিলা টুকরো একটা কাগজে ভিখুর ঠিকানা লিখে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই টুকরো কাগজ তিনি হারিয়ে ফেলেননি, এমনকী, যত্ন করে চিঠিও দিয়েছিলেন। বাড়ির সবাই ভিখুকে নিয়ে পড়ল। কী কথা হয়েছিল, কী বলেছিলেন ভদ্রমহিলা, কী করে আলাপ হল—এইসব প্রশ্ন। ভিখু লাজুকভাবে হাসল। কী উত্তর সে দেবে এইসব প্রশ্নের?

মা আবার অনেকদিন পর কথাটি বললেন, "তোকে যে দ্যাখে, সে-ই স্নেহ করে। এটা তোর গুণ। দেখবি একদিন তুই খুব বড় হবি। ভাল করে পড়। কে জানে, তোর কপাল হয়তো এখন থেকেই খুলে গেল। ভাল করে পড়লে বিদেশের নামী-দামী বিশ্ববিদ্যালয়ে তোর নিশ্চয় জায়গা হবে। আরও বড় হবি। কী সুন্দর চিঠি লিখেছেন ভদ্রমহিলা—

আই অ্যাম চেয়ার অব দা ডক্টরাল প্রোগ্রাম...."

ভিখু কিছু বলল না। ওর ঘরে ফিরে গিয়ে জানালার ধারে দাঁড়াল। দেবদারু গাছের পাতাগুলো হাওয়ায় নড়ছে। আজ প্রথম শরতের মতো রোদ উঠেছে। গাছের পাতাগুলো চকচক করছে। কোথাও কোনও মলিনতা নেই। ভিখু এবার ওর দেবদারু গাছগুলোকে মনে মনে বলল, "তোমাদের ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। তোমাদের মধ্যে যেমন বড় হয়ে উঠছি, সেইভাবেই বড় হয়ে উঠতে চাই। এই আলো, এই হাওয়া, এই সবুজ গাছের ছায়া ছেড়ে আমি কোথাও যেতে চাই না। তোমাদের শিকড় দিয়ে আমাকে ধরে রাখো।"

বাসে উঠলেই অচেনা

শেখর বসু

মিনিবাসে ওঠার মুখে নন্দনকে একটু ঠেলে সরিয়ে দিলেন ওর মা। আচমকা কনুইয়ের ধাক্কা খাওয়ার জন্যে নন্দন সামান্য চটে গিয়েছিল, কিন্তু এখন মা'র ওপর রাগ দেখাবার কোনও উপায় নেই। বাসে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গেই মা একেবারে অচেনা মানুষ হয়ে যান। সত্যি এর কোনও মানে হয়!

কিন্তু মানে হোক আর নাই হোক, নন্দনকে এটা মেনে নিতে হয়। কদিন তর্কাতর্কি করেছে, কাজ হয় নি। কদিন রাগারাগি করেছে, কাজ হয়নি। বেচারা তাই এখন মনের কষ্ট মনেই চেপে রাখে।

মা বসেছেন ওদিকের সিটে, নন্দন এদিকে। মা'র পাশে বসার জায়গা আছে, কিন্তু নন্দনের ওখানে বসার হুকুম নেই। বসতে হবে অন্য কোথাও। অন্য কোথাও বসলেই শুধু হবে না, বাসের মধ্যে মা'র সঙ্গে একটা কথাও বলা চলবে না। অচেনা ছেলের মতো থাকতে হবে। তবে বাস থেকে নামার সময় খেয়াল করে নেমে আসতে হবে মা'র পেছন-পেছন।

মা সেদিন মাসিমণিকে বলেছিলেন, "আজকাল বাসের কনডাকটাররা যা পাজি হয়েছে না! নন্দনকে নিয়ে বাসে উঠলেই ওরা টিকিটের জন্যে জ্বালিয়ে মারে। ওইটুকু ছেলে, ওর আবার টিকিট কী? কিন্তু যুক্তির ধার ধারে ওরা! বাধ্য হয়ে তাই এখন একটু বুদ্ধি খাটাচ্ছি।"

বুদ্ধিটা কী জানতে চেয়েছিলেন মাসিমণি।

মা তখন খেলা জিতে যাওয়ার মতো চোখমুখ করে বলেছিলেন, "নন্দনকে বলে রেখেছি, বাসে উঠে তুই আমার সঙ্গে একটাও কথা বলবি না, পাশেও বসবি না। কনডাকটার টিকিট চাইলে একটা টিকিট কাটি। ওরা ভাবে আমি একা। ব্যস।"

মা'র কথা শুনে মাসিমণির সে কী হাসি! হাসতে হাসতে চোখে জল এসে গিয়েছিল। আরপর কোনও মতে চোখের জল মুছে নিয়ে বলেছিলেন, "এ মা, তুই বাসে টিকিট ফাঁকি দিস!"

তাই শুনে চটে গিয়ে মা বলেছিলেন, "কক্ষনো না। অন্যায়কে প্রশ্রয় দেব না বলেই তো এরকম করি। নন্দন একটু বড় হোক না, দেখবি ডেকে-ডেকে টিকিট দিয়ে আসব।"

উত্তর শুনে মাসিমণি আর-এক দফা হেসেছিলেন, তারপর নন্দনের থুতনি নেড়ে দিয়ে বলেছিলেন, "ছি-ছি, তুমি এখনও বাসে টিকিট কাটার মতোও বড় হওনি! রনি কিন্তু জেন্টলম্যান হয়ে গেছে, লেডিজ সিটে জায়গা থাকলেও বসে না।"

রনি নন্দনের চাইতে মাত্র পাঁচ মাসের বড়, অথচ ও কত বড় হয়ে গেছে এর মধ্যেই। মাসিমণির কথা শুনে চোখে জল এসে গিয়েছিল নন্দনের।

সেই মাসিমণির বাড়িতেই আজ ভাইফোঁটার নেমন্তন্ন ছিল। ওকে ফোঁটা দিয়েছে মুন্নি, আর মা'রা ফোঁটা দিয়েছেন দুই মামাকে। মামারা চলে গেছেন টালিগঞ্জে। এখন ওরা ফিরছে ওদের কলেজ স্ট্রিটের বাড়িতে।

কিন্তু বাসটা ছাড়বে কখন?

নন্দন জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কনডাকটর গল্প করছে একজনের সঙ্গে। ওই লোকটিই বোধহয় ড্রাইভার। তার মানে বাস ছাড়তে দেরি আছে এখনও। মিনিবাসের ভেতর দিকে একবার চোখ ঘুরিয়েই কারণটা ধরতে পারল নন্দন। সামান্য কয়েকজন বসে আছে, যাত্রী আরও না বাড়লে বাস ছাড়বে না কিছুতেই।

থেমে-থাকা বাসে এইভাবে চুপচাপ বসে থাকতে একটুও ভাল লাগে না নন্দনের। কিন্তু কী-ই বা আর করার আছে? মা'র সঙ্গে তো গল্পও করা যাবে না এখন! মা ওদিকের সিটে একেবারে অচেনা মানুষের মতো বসে আছেন। পাশে প্লাস্টিকের নীল ব্যাগ। ব্যাগের ওপরদিকে একটা শাড়ি আর মিষ্টির প্যাকেট। শাড়িটা মা'কে দিয়েছেন বড়মামা। মিষ্টি দিয়েছেন মাসিমণি। মিষ্টির প্যাকেটের নীচেই হলুদ প্যাকেটে ওর টি-শার্ট। শার্টটা দিয়েছে মুন্নি। আহ্, কী সুন্দর দেখতে! শার্টের কথা মনে পড়তেই নন্দন ওর বুকপকেটটা একটুখানি ফাঁক করল। পকেটের মধ্যে দুটি ঝকঝকে দশ টাকার নোট। নোটদুটো বার করে ওর দেখার ইচ্ছে হচ্ছিল খুব। কিন্তু মা'র ভয়ে বার করার সাহস পেল না। অবশ্য বার করলেরও মা এখন কিছুই বলতে পারবে না। বাসের মধ্যে তো কথা বলা বারণ। তবে ঠিক ভরসা পেল না নন্দন।

ভাইফোঁটায় নন্দনেরই লাভ হয়েছে সব চাইতে বেশী। দুটো দশ

টাকার নোট, একটা টি-শার্ট আর দুটো ক্যাডেবেরি চকোলেট। চটোলেট দুটো মা'র হাতব্যাগে। হাতব্যাগে না থেকে যদি ওর পকেটে থাকত, এক্ষুনি ও খেয়ে ফেলত। হাতে চকোলেট থাকলে চুপচাপ বাসে বসে থাকাটা একটুও কষ্টের নয়।

মিনিবাসে এর মধ্যে আরো অনেকে উঠে পড়েছে। এইমাত্র ওর পাশে বসল ঠিক ছোটকাকুর মতো দেখতে একজন। বসেই একটু দূরের কনডাকটরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কী দাদা, কখন ছাড়বেন বাস ?"

কনডাকটর মুখ ঘুরিয়ে "ছাড়ছি" বলে আবার আগের মতোই গল্পে জমে গেল।

ছোটকাকুর মতো দেখতে মানুষটার স্বভাবও বোধহয় ছোটকাকুর মতো, কথা না বলে থাকতে পারে না। নন্দনকে বললেন, "পরশুর খেলাটা এখনও চোখে ভাসছে, খেলা দেখেছ তুমি ?"

কে না দেখছে খেলা ! নন্দন তো আবার ক্রিকেটের দারুণ ভক্ত। ও লম্বা করে একপাশে মাথা কাত করে জবাব দিল, "অনেক দিন পরে আজাহার কিন্তু দারুণ খেলেছে।"

"আচ্ছা, আমাদের রান অ্যাভারেজ কত হল এখন ?"

"ফাইভ পয়েন্ট থ্রি ওয়ান।"

ব্যস, অচেনা এই কাকুর সঙ্গে ক্রিকেটের গল্পে জমে গেল নন্দন। ওর মা মাঝেমধ্যে অবাক হয়ে তাকাচ্ছিলেন এদিকে।

বাসে আরও কয়েকজন লোক উঠে পড়েছে, টিকিট কাটতে শুরু করে দিয়েছে কনডাকটর ; কিন্তু ড্রাইভারের সিট এখনও ফাঁকা। টিকিট কাটা শেষ হলে বোধহয় বাস ছাড়বে।

কনডাকটর মা'দের দিকের টিকিট কাটা শেষ করে এপাশে আসতেই নতুন কাকু নন্দনকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কোথায় যাবে ?"

"কলেজ স্ট্রিট।"

উত্তর শুনেই নতুন কাকু কনডাকটরের দিকে টাকা বাড়িয়ে বললেন, "একটা হেদো আর একটা কলেজ স্ট্রিট।"

নন্দন চোরা-চোখে দেখল মা এদিকে তাকিয়ে আছেন অবাক হয়ে।

একটা টিকিট নন্দনের হাতে দিয়ে নতুনকাকু বললেন, "আমাদের ব্যাটিং-লাইন এখন কিন্তু দুর্দান্ত। সিধু পর্যন্ত আসার পর থেকে দারুণ লিখছে।"

নন্দন হাতের টিকিটটা নাড়াচাড়া করতে করতে মিনমিন করে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি আমার টিকিট কাটলেন?"

"হ্যাঁ," বলেই নতুন কাকু প্রশ্ন তুললেন, "আচ্ছা, ওয়ান-ডে ইন্টারন্যাশনালে এই বোধহয় আমাদের প্রথম চারটে হাফ-সেঞ্চুরি?"

"হ্যাঁ।"

কনডাকটর টিকিট কাটতে কাটতে বাসের পেছনের দিকে চলে গেছে। এখন ওর জায়গায় একজন হকার। প্লাস্টিকের প্যাকেটভর্তি বাদামভাজা ঠিক তাসের মতো হাতে সাজিয়ে হকার চেঁচাতে লাগল, "সল্টেড বাদাম—এ-এ-এ সল্টিস্। সল্টেড বাদাম—এ-এ-এ সল্টিস্।"

নন্দন হঠাৎ পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে বলল, "আমাকে দুটো দিন তো।"

মা'র দিকে না তাকিয়েও নন্দন পরিষ্কার বুঝতে পারছিল মা ওর দিকে কটমট করে চেয়ে আছেন। তবে যতই রাগুন না কেন, বকাবকি করতে পারবেন না। মা তো এখন অচেনা। একটা লাগসই উত্তরও নন্দন সাজিয়ে রাখল মনে-মনে। এই নিয়ে ধমকালেই বলবে, "তুমিই তো বলেছ, কারও কাছ থেকে কিছু নিলে কিছু দিতেও হয়। ভদ্রলোক আমার টিকিট কেটেছেন, আমি তাই ওঁকে বাদাম খাইয়েছি।"

ভদ্রলোক কিন্তু বাদাম নিতে চাইলেন না। বললেন, "এইমাত্র নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরছি, এখন আবার বাদাম খাব কী করে?"

কিন্তু নাছোড় নন্দনের হাত থেকে রেহাই পাওয়া শক্ত। উনি তখন হাসতে হাসতে বললেন, "ঠিক আছে, একটা প্যাকেট খোলো, আমি তোমার থেকে দু-একটা নেব।"

আরও কিছু লোকজন ওঠার পরে মিনিবাস ছাড়ল। বাসের ইঞ্জিন থেকে শব্দ উঠছিল বিকট। ওই শব্দ ছাপিয়ে গল্প করতে গেলে রীতিমত চেঁচাতে হয়। নন্দনদের গল্প তাই থেমে এসেছিল প্রায়।

দু-তিনটে স্টপ যেতে না যেতেই বাসের সব সিট ভর্তি হয়ে গেল। এদিক-সেদিক কিছু-কিছু যাত্রী দাঁড়িয়ে আছে। মা'কে আড়াল করে একটা লোক দাঁড়িয়ে ছিল বলে নন্দন বেশ তারিয়ে-তারিয়ে সল্টেড বাদাম খাচ্ছিল। চোখাচোখি হওয়ার কোনও ভয় নেই। বাদাম খেতে-খেতে নন্দন ভাবছিল, একটা কথা না বলে শুধু চোখ দিয়ে একজন আর-একজনকে কী করে এত ধমকায়!

রাস্তায় লোকজন বিশেষ ছিল না, মিনিবাস ছুটে চলেছে শাঁ-শাঁ করে। লোকজন উঠছে, নামছে। জানলা দিয়ে হালকা শীতের বাতাস আসছে মাঝেমধ্যে। সল্টেড বাদামের প্যাকেটটা খালি হয়ে এসেছে প্রায়, এমন সময় নন্দন চমকে উঠে দেখল—।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না ও, কিন্তু ঘটনাটা সত্যি। মা'র সামনে দাঁড়ানো আধময়লা পাজামা-পরা লোকটা প্লাস্টিকের নীল ব্যাগ থেকে মা'র শাড়িটা বার করে নিচ্ছে আস্তে-আস্তে। নন্দন বুঝে উঠতে পারল না ওর কী করা উচিত এই মুহূর্তে, কিন্তু লোকটা ব্যাগ থেকে শাড়িটা বার করে নিতেই ও "চোর, চোর" বলে চেঁচিয়ে উঠল।

কে চোর, কোথায় চোর—আর পাঁচজন এ-সব বোঝার আগেই সত্যিকারের চোর শাড়িটা ফেলে দিয়ে ঠেলেঠুলে গেটের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর মিনিবাস থেকে লাফিয়ে পড়ল রাস্তায়।

চোর পালালে শুধু বুদ্ধিই বাড়ে না, চোরকে মারার শখও বেড়ে যায় অনেকের। অনেকেই হায়-হায় করে উঠে বলল "ইশ্! হাতের কাছে পেয়েও চোরটাকে পেটানো গেল না!" একজন নন্দনকে বলল, "খোকা, না চেঁচিয়ে আমাদের কাউকে দেখিয়ে দিতে যদি!"

নন্দনের কৃতিত্বে সবচাইতে খুশি বোধহয় ওর নতুন কাকু। ভদ্রলোক নীচ থেকে শাড়িটা তুলে নন্দনের মা'র দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন,

"এই ছেলেটার জন্যেই কিন্তু আপনার শাড়িটা বেঁচে গেল। নিন, একে এবার মিষ্টি খাইয়ে দিন।"

নীল প্লাস্টিকের ব্যাগে রাখা মিষ্টির প্যাকেটটা দেখেই বোধহয় ভদ্রলোক নন্দনকে মিষ্টি খাওয়ানোর প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কথাটা শুনে আরও কয়েকজন হইহই করে উঠলেন একসঙ্গেঃ হ্যাঁ দিদি, ওর জন্যেই আপনার নতুন শাড়িটা বেঁচে গেছে, মিষ্টি খাওয়ান ওকে।

মা'র হতভম্ব মুখের দিকে তাকিয়ে খুব মজা পাচ্ছিল নন্দন। চোরটোরে মা'র খুব ভয়। সেই চোর এই মাত্র চোখের সামনে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেছে। তবে ভাগ্য ভাল, শাড়িটা নিতে পারেনি।

কয়েকজন আবার আগের ওই কথাটাই বলল, "কই দিদি, মিষ্টি খাওয়ান ওকে।"

মা'র দিকে তাকিয়ে নন্দনের এবার ভীষণ হাসি পেয়ে গেল। কিন্তু কিছুতেই হাসলে চলবে না। হাসলেই ফাঁস হয়ে যেতে পারে, মা'র সঙ্গে ওর কী সম্পর্ক! অন্যদিকে তাকিয়ে প্রাণপণে হাসি চাপার চেষ্টা করে যেতে লাগল নন্দন।

পাশের নতুন কাকুটি এবার মুচকি হেসে নন্দনের মা'কে বললেন, "ঠিক আছে, আপনার হয়ে আমিই ওকে একটা প্রাইজ দিয়ে দিচ্ছি।" এই না বলে উনি পকেটে হাত ঢোকাতেই মা হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, "না, আপনি ওকে কিছু দেবেন না, আমি দিচ্ছি।"

মা হাতব্যাগ খুলে চকোলেট দুটো এগিয়ে দিলেন নন্দনের দিকে। তাই দেখে হাততালি দিয়ে বলে উঠল একজন, "বাহ্! এ তো দারুণ প্রাইজ। নিয়ে নাও খোকা।"

নন্দন অচেনা ছেলের মতো মা'র হাত থেকে চকোলেট দুটো নিয়েই মুখ ফেরাল অন্যদিকে।

উত্তেজনার মধ্যে থাকলে বোধহয় সময় কেটে যায় তাড়াতাড়ি। নন্দন হঠাৎ বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখল কলেজ স্ট্রিট এসে গেছে। মা উঠে দাঁড়িয়েছেন।

মা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নন্দনও উঠে পড়েছিল। মিনিবাসে লোকজন কমে গেছে বেশ, দু-একজন মোটে দাঁড়িয়ে আছে। নন্দন হঠাৎ পাশের কাকুর হাতে একটা চকোলেট ধরিয়ে দিয়ে ছুট লাগাল। কাকু "এ কী, এ কী" করে উঠলেন, কিন্তু আর কিছু বলার আগেই বাস থেকে নেমে

পড়েছিল নন্দনরা। ওরা নামাব প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাস ছেড়ে দিল আবার।

অন্যান্য দিন বাস থেকে নামাব পরে অচেনা মা আগের মতোই চেনা হয়ে যান। কিন্তু আজ তা হল না। ঠিক অচেনা মানুষেব মতোই মা হনহন করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন বাড়ির দিকে। পেছন পেছন নন্দন। বাড়ি ফিরেও মা ওর সঙ্গে কোনও কথা বলেন নি।

কিন্তু পরদিন নন্দন অনেকের কাছ থেকেই জেনে গেল, মা, ওর ওপর বেজায় খুশি। সকলের কাছেই ওর বুদ্ধি আর সাহসের খুব তারিফ করেছেন। তার পরদিন ওব স্কুলের জামা-প্যাণ্ট কিনে দেওয়ার জন্য মা ওকে নিয়ে একটা স্পেশাল বাসে উঠলেন।

আগের অভ্যেসমতো নন্দন বাসে উঠেই অন্য সিটে বসতে যাচ্ছিল, কিন্তু মা ওকে ধরে নিজের পাশে বসালেন। তারপর কনডাকটরের দিকে একটা পাঁচ টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে বললেন, "দুটো এসপ্লানেড।"

একটার বদলে মা'কে দুটো টিকিট কাটতে দেখে নন্দন খুব খুশি। তার মানে মা'র হিসেবেও ও এখন বড।

মা ওর দিকে তাকিয়ে নেই, কিন্তু মা'র মুখে ছোট্ট একটা হাসি দেখতে পাচ্ছিল নন্দন। হাসলে মা'কে ভীষণ ভাল লাগে। মা'র দিকে আর-একটুখানি সরে এসে নন্দন বলল, "মা, সল্টেড বাদাম খাবে, সেদিন কিনেছিলাম।"

মা'কে কিছু খেতে দিলে মা সব সময় বলে থাকে, "পরে।" কিন্তু আজ নন্দনকে অবাক করে দিয়ে বললেন, "ঠিক আছে, দে, একটুখানি।"

প্লাস্টিকের প্যাকেট ছিঁড়ে মা'র হাতে কয়েকটা বাদাম দিল নন্দন। মা এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে টুক করে দু-তিনটে দানা ফেলে দিলেন মুখে। স্পেশাল বাস বেশ জোরে ছুটে চলেছিল, চারদিকে কত রকমের আওয়াজ ; কিন্তু মা'র তৃপ্তি করে বাদাম খাওয়ার শব্দ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিল নন্দন।

খিদে

গৌতম চক্রবর্ত্তী

...ঘুম ভাঙতেই আমি অনুভব করলাম আমার সারা শরীরে ভীষণ ব্যাথা। মনে পড়ল গতকাল ঐ জলার দিকটায় একটা কিম্ভুতাকার শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা হয়েছিল। ওর আত্মরক্ষার অস্ত্র কাঁটা-ই আমাকে ঘায়েল করেছে। আসলে দোষটা আমারই। খিদের জ্বালায় আমি ওকেই আক্রমণ করে বসি। এখন তার ফল ভোগ করছি। তিন-তিনটে দিন পেটে কিছুই পড়েনি। রাবণের চিতার মত দাউ দাউ করে পেটের ভিতরটা জ্বলছে। না! এবার উঠে গিয়ে একটু খাবারের সন্ধান করতে হয়। উঠতেই মাথাটা ঘুরে গেল। একে তিনদিনের অনাহার তার মধ্যে শত্রুর আক্রমণে শরীর ক্ষত-বিক্ষত, তাই প্রচণ্ড দুর্বল লাগছিল। তবুও এই পেটের তাগিদে আস্তে আস্তে নিজেকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চললাম। ছাতিম গাছটির তলায় দুটি হৃষ্ট-পুষ্ট বন মোরগ। লাফ দিয়ে ধরলেই হয়। কিন্তু সেই সামর্থ এখন আর আমার নেই। হয়ত হারিয়েছি। আমার এই করুণ অবস্থার কথা হয়ত আগে থেকেই জানা ছিল বন মোরগ দুটির। তাই নির্ভয়ে গাছটির তলায় দাঁড়িয়ে রইল। আমি সত্যি আশ্চর্য হয়ে গেলাম, আমাকে দেখে ওদের কি একটুও ভয় করছে না? বিধাতার পরিহাস বুঝি একেই বলে।

আরও কিছুটা হাঁটলাম। পেছনে তাকিয়ে একবার দেখে নিলাম মোরগ দুটি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মনে মনে হাসলাম। সেই যে প্রবাদ বাক্যটি, মনে পড়ে গেল—হাতী যখন গর্তে পড়ে—মশা মাছিও লাথি মারে। আমার সেরকম দশাই হয়েছে। আরও কিছুটা এগিয়ে চললাম। জঙ্গল এখানে কিছুটা ফাকা হয়ে এসেছে। দূরে দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট গ্রাম। গোল পাতায় ছাওয়া ঘর। তার আগে ছোট্ট একটি নদী। বড় জোর পঞ্চাশ-ষাট ফুট চওড়া হবে। জলও খুব বেশী নয়, কিন্তু স্রোত প্রচণ্ড। নদীটা পার হলেই গ্রাম, আর সেখানে কত

খাবার ! ভাবতেই জিভে জল আসছে। পেটের খিদেটা আরেকবার চাড়া মেরে উঠল। না—আর দেরি নয়, নদী সাঁতরে গ্রামে গিয়ে উঠতে হবে। হঠাৎ ডানদিকে তাকিয়ে দেখি সেই ভয়ঙ্কর সুন্দর ফাঁদ। মনে পড়ে গেল আমার ছোট ভাই এটাকে খাবার ভেবে কামড়ে ধরতেই নিজেই হঠাৎ পড়ে গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই মরে গেল ! আমি দূরে দাঁড়িয়ে থেকে সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখেছিলাম। তাই আমরা এবং আমাদের স্ব-জাতিরা ঐ ফাঁদটাকে বরাবর এড়িয়ে চলি। খুব সাবধানে ফাঁদটাকে পাশ কাটিয়ে নদীতে নাম লাম। জল ভীষণ ঠাণ্ডা। ভাবছি উঠে আসব কিনা ! হঠাৎ খিদেটা আবার বিদ্রোহ করে উঠল। উপায় নেই, নামতেই হবে, যেতেই হবে ওপারে যেখানে গ্রাম আছে আর আছে পেট ভরা সন্দব সুন্দর খাবার। নদীতে নামতে যাব···হঠাৎ একটা কথা মনে হতে ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। ভাবতেই অবাক লাগছে। আমার ভয়ে যেখানে সবাই কাঁপে, আর এখন আমি নিজেই ভয়ে কাঁপছি। ভাবনা যা হল দিনের বেলায় গ্রামের লোকেরা যদি আমাকে দেখে ফেলে····ধরে····এবং আমার দফা রফা করে দেয়, তবে ? না—, এখন ওখানে যাবনা। দিনের আলো কমে আসুক। অন্ধকার হোক, তখন যাব। কিন্তু ততক্ষণে তো আমি উপস করে মরব। নিজেকে বোঝালাম, ভালো খাবারের জন্য একটু কষ্ট করতে হয়। ঐযে কি যেন বলে— ? হ্যাঁ—"কষ্ট করলে কেষ্ট মেলে।"

অগত্যা নদীর পারে একটা ঝোপ মত জায়গায় নিজেকে লুকিয়ে রাখলাম। যাতে আমাকে কেউ দেখে না ফেলে। শীতকালের রোদটা দারুণ লাগছে। পরিবেটাও চমৎকার। শুধু খিদেটা বড্ড জ্বলাচ্ছে। কতক্ষণ এভাবে বসে থাকা যায় ? বসে বসে ছোট বেলাকার সেই সুন্দর দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে। মা আমাদের দুই ভাইকে বাসায় রেখে গিয়ে কত খাবার নিয়ে আসত। আমরা মহা আনন্দে তা খেতাম। আর এখন ! সেই সুন্দর দিনও নেই, মাও নেই। মাকে কারা যেন গুলি করে মেরেছে। ভাইটাও ফাঁদে পড়ে মরেছে। একমাত্র আমিই বেঁচে আছি। অনাহারে এই আহত অবস্থায় আর কতক্ষণ বাঁচব আমি নিজেই জানিনা। মাঝে মাঝে ঝোপের ভিতর থেকে নদীর জলের দিকে নজর রাখছি, যদি দু-একটা মাছ পাওয়া যায়। নাঃ, সেরকম কোন আশার দৃশ্য চোখে পড়ল না। আমার কপালটা সত্যিই খারাপ।

এখন কেউ আর নদীতে জল খেতে আসে না। আসবেই বা কেন ?

জলের অজস্র জায়গাতো বনেই আছে। অতএব, আশায় বুক বেঁধে বসে থাকো কখন সন্ধ্যে হয়।

শীতকালে তাড়াতাড়ি বেলা চলে যায়। সূর্যের শেষ ছটা নদীর জলে পড়ে চিক্ মিক্ করছে। মনে হচ্ছে জলে কেউ আবির গুলে দিয়েছে। আকাশ আর জলে মনে হচ্ছে, লাল আবিরে দোল খেলার উৎসাহে মেতে উঠেছে। পাখিরা দৈনন্দিন সকাল সন্ধ্যা ডিউটি করে বাসায় ফিরছে। বকগুলোও সারাদিন ছোট মাছের পরিসংখ্যান-হিসাব শেষ করার পর ঘরে ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।....তাহলে সন্ধ্যে হয়ে আসছে। উত্তরের ডিপো থেকে হাওয়া ছেড়েছে। আর কিছুক্ষণ ব্যাস, তার পরেই কার্যসিদ্ধি। সূর্যের শেষ আভাটুকু বড় ঐ ইউক্যালিপটাস্ গাছটির মাথায় এই কিছুক্ষণ আগেও দেখা যাচ্ছিল। এখন আর দেখা যাচ্ছে না। তার মানে সত্যি সত্যি সন্ধ্যে হল। চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে। নদীর জলের একঘেয়ে ছলাৎ ছলাৎ বাজনা আর শুনতে ভালো লাগছে না। ওপারের গ্রামটির দিকে তাকিয়ে দেখি ঘরগুলি অন্ধকারে ঢেকে গেছে। দু-চারটে প্রদীপের আলো অস্পষ্ট ভাবে জ্বলছে। সব কেমন হঠাৎ চুপচাপ হয়ে গেল। নদীর জলের আওয়াজ আরও বাড়ছে। বেশ শীত শীত করছে। তাহলে এখনই উপযুক্ত সময় ওপারে যাবার। গাছি ঝোপ থেকে নিজেকে কোন রকমে বের করে নদীর পারে আসলাম। জলে নামলাম। উঃ, কি দারুণ ঠাণ্ডা জল! পা জমে যাচ্ছে। থোড়াই কেয়ার—আমাকে যেতেই হবে।

সাঁতরাচ্ছি। মাথাটা জলের উপর উঁচু করে আপ্রাণ চেষ্টায় সাঁতরাচ্ছি। মাঝে মাঝে নদীর ঢেউগুলো চোখে মুখে লাগছে। নোনা জলের স্বাদে খিদেটা আবার চাঙা হয়ে উঠলো। এরই মধ্যে বুঝতে পারলাম আমার সারা গায়ে যন্ত্রণা হাজার গুণ বেড়ে গেছে। কারণ ক্ষত স্থানে নোনা জল লাগছে। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা আর কি। তবুও আমাকে যেতে হবে। কারণ এখন ফিরে যাবার কোন উপায় বা ইচ্ছা আমার নেই। 'আরেকটু চলো'—নিজেই নিজেকে উৎসাহ দিলাম। ওপারের ঘরগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে আসছে। তার মানে বেশীদূর নয়। ঐ তো আর মাত্র দশ পনেরো ফুট দূরেই ঘরগুলি। 'চলো চলো, এসে গেছি—' নিজে নিজে বললাম।

ছোট বেলায় ভাগ্যিস নদীতে সাঁতার কাটানো মা শিখিয়েছিল। পায়ের

তলায় নরম কাদার মত ঠেকছে। হ্যাঁ পেঁীছে গেছি। এইবার আস্তে আস্তে জল থেকে উঠে গা ঝাড়া দিয়ে একটা জায়গায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিলেই হয়। হাঁপরের মত হাঁপাচ্ছি। এত পরিশ্রমে খিদেটাও শতগুণ বেড়ে গেছে। শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছি। এবার হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি খিদের জ্বালা কি? কান পেতে শোনার চেষ্টা করছি কোন আওয়াজ শোনা

যায় কিনা? না ঃ— সব নিঝ্ঝুম। এবার তাহলে ওঠা যাক্। গুটি গুটি পায়ে কিছুটা গুড়ি মেরে সামনের ঘর গুলির দিকে এগিয়ে চলেছি। বুকের ভিতরটা ভয়ে ঢিব্ ঢিব্ করতে লাগল। কোন দিন তো এমন বেখাপ্পা যায়গায় আসিনি। যদি কিছু হয়ে যায়? যদি ধরা পড়ি? নিজেকে এক ধমক লাগালাম—'এতই যদি ভয় তবে এসেছিলি কেন? ভিতু কোথাকার।—' না-আর ভয় নয়, এগিয়ে যাচ্ছি। ঘরগুলো সাত-আট হাত দূরে।

অন্ধকারে একটা ঘরের পাশে আরেকটি খোলামেলা ঘর, তাতে আলো নেই। সেখানে সাদামত কি একটা নড়ছে। ওটা কি? আরেকটু কাছে যাই। আচ্ছা···! ওটাতো গরু। ইস সেই কবে ছোট বেলায় মা একবার এনেছিল। আহ্! এখনও মনে আছে। ওটার কাছে যেতেই ছটফটানি বেড়ে গেল। শিং দিয়ে আবার গুঁতাতে আসছে! দেব নাকি এক থাপ্পর লাগিয়ে। "হাম্বা—হাম্বা—হাম্বা—।" আহঃ কি জ্বালাতন

আবার হেঁড়ে গলায় চিৎকার করে সবাইকে না জানালেই কি চলছিল না। গরুটা চিৎকার বন্ধ করেছে। কিন্তু খুঁটিতে বাঁধা অবস্থায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। আমি আরও কাছে গেলাম। ওকে আদর করে আস্তে ডাকলাম। কিন্তু গলা দিয়ে ঘর্ ঘর্ শব্দ ছাড়া কিছুই বের হলো না। শীতের ঠাণ্ডায় নদী পার হবার জন্যই হোক বা তিনদিন না খাওয়ার জন্যই হোক গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বের হলো না। কিন্তু এটা বুঝলাম এই আওয়াজেই গরুবাবাজি আরও ভয় পেয়েছে ও লাফাচ্ছে। দড়িসুদ্ধ খুঁটি ওপড়ানোর মতলবে আছে। আর মাত্র এক-দেড় হাত। আমি প্রাণপণ চেষ্টায় ওর পিঠ লক্ষ্য করে লাফ দিলাম।

....কিন্তু একি ! আমি লাফ দিয়ে কোথায় এসে পড়লাম ? একটা দোলনার মত জিনিসে পড়ে আমি দোল খাচ্ছি। ওঠার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না, হাত-পা কিসে যেন আটকে গেছে। সম্ভবত এটা মাছ ধরার জাল। সর্বনাশ, তবে কি আমি ধরা পড়েছি ? ভয়ে বুকের ভেতর-টায় কে যেন হাতুড়ি মারছে। আমি উঠতে চেষ্টা করছি কিন্তু পারছি না। কিসে যেন আটকিয়ে গেছি। গরুটা আমার অবস্থা দেখে নিশ্চয়ই আনন্দ পাচ্ছে। হঠাৎ দেখলাম পাশাপাশি ঘর গুলোর দরজা খুলে গেছে। কাদের পায়ের শব্দ পাচ্ছি। বুঝতে পারছি আমি ধরা পড়ে গেছি। আমার নিস্তার নেই। কিছুটা দূর থেকে কারা যেন আমায় দেখে গেল। তারপর সব আবার চুপ চাপ। আমি আবার চেষ্টা করলাম জাল থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে।

কিন্তু আমি পারলাম না। আমি আরও বেশী করে আটকে যাচ্ছি। এই নিদারুণ অবস্থায় ভাইয়ের কথা মনে হল। তবে কি আমারও ঐ রকম দশা হবে ? ভাবতেই গা কাঁটা দিয়ে উঠলো। এরই মধ্যে কারা যেন মশাল আর অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে হৈ চৈ করে ঢ্যারা পিটিয়ে এদিকেই এগিয়ে আসছে। বুঝলাম এ যাত্রায় আমার রক্ষা নেই। যতবার চেষ্টা করছি উঠতে ততবারই জাল সুদ্ধ আমি দুলে উঠছি, আর বেশী বেশী করে আটকে যাচ্ছি। ওদের মধ্যে থেকে একজনের কথা স্পষ্ট কানে আসলো —"বাছাধনকে সেই দুপুর থেকে ঝোপের ধারে দেখেছি। তখনি বুঝেছি নদী সাঁতরে এগাঁয়ে আসার মতলবে আছে। সেই জন্যি তো আমি জাল দিয়ে ফাঁদ পেইতে রেইখেছি। জানতুম আমার দুধের লক্ষ্মীকেই ঘায়েল করবে। এহন হতচ্ছারাটা যাবে কওনে ? দ্যাহাচ্ছি মজাটা—।"

ফাঁদ। আবার সেই ফাঁদ ? তবে আমি গেছি। হঠাৎ পেটের কাছটায় ভীষণ যন্ত্রণা করে উঠলো। —এটাতো খিদের যন্ত্রণা নয়। তাকিয়ে দেখি একজন বল্লম দিয়ে আমার পেট খোঁচাচ্ছে। তবে কি ওরা আমাকে এইভাবে মারবে ? আমি প্রাণপণে চিৎকার করে উঠলাম। লোকগুলো ভয়ে কিছুটা সরে গেল। আবার, বারবার ওরা আমাকে বল্লম, টাঙ্গী দিয়ে খোঁচাতে লাগলো। অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে। হায়রে খাবারের জন্যে যদি এমন হতো আগে জানলে আসতাম ? এর চেয়ে উপোস করে মরাও অনেক ভাল। হঠাৎ কি একটা চোখের উপর এসে পড়ল। ডান চোখটা ঠেলে বেরিয়ে এল। দর দর করে রক্ত পড়ছে। চোখে ঝাপ্‌সা দেখছি, চিৎকার করে বললাম—"তোমরা আমায় মেরোনা। আর আর এখানে আসব না। শুধু খিদের জ্বালায় আসতে বাধ্য হয়েছি।"

ডান হাতের উপর কিসের একটা কোপ এসে পড়ল। দেখলাম হাতটা অর্ধেক হয়ে ঝুলছে। বুঝলাম আমার বাঁচার আশা নেই। আমি যন্ত্রণায় চিৎকার করে মিনতি করলাম। লোকগুলো ততবেশী হৈ চৈ করে ঢ্যাডা পিটিয়ে আনন্দ করতে লাগলো। অবশিষ্ট বাঁ চোখ দিয়ে চেয়ে দেখলাম আদিম হিংস্রতায় মানুষগুলো মেতে উঠেছে। ওদের হিংস্রতা আমাদেরকেও হার মানায়। আরও অসংখ্য মানুষ ছুটে আসছে। জ্বলন্ত মশালের রক্তিম আভায় দেখতে পাচ্ছি পৈশাচিক তান্ডব ওদের চোখে মুখে জোঁকের মত লেপটে আছে। গলার কাছে দুটো তীর এসে বিদ্ধ হল। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ভীষণ পিপাসা পাচ্ছে। কে যেন একটা কাটারী ছুড়ে মারল। বাঁ পায়ে আমূল বিঁধে আছে। সবকিছু ঝাপ্‌সা দেখছি। কানের মধ্যে লক্ষ আওয়াজ বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। দেহটা নড়াতে পারছি না। যন্ত্রণায় জিভটা বেরিয়ে আসতে চাইছে। ওদের আনন্দ বেড়ে চলেছে। আরও····আরও····।

মাকে মনে পড়ছে। ভাইটাকেও মনে পড়ছে। তবে কি আমি মা আর ভাইদের দেশে যাচ্ছি ? না—না—, আমি যেতে চাইনা, আমি মরতে চাই না, আমি বাঁচতে চাই। তোমরা আমাকে বাঁচতে দাও। আমায় মেরো না। কোন আওয়াজ বের হলো না। ক্রমাগত তীর, বল্লাম, টাঙ্গী, কাটারীর আঘাতে আমার শরীরকে ক্ষত বিক্ষত করে তুলেছে। কে যেন বলে উঠলো—"ওর চামড়াটা আমিই নেব।"—কি নিষ্ঠুর এই মানুষগুলো। ওঃ জ্বলে গেল—পুড়ে গেল। কে যেন একটা

জ্বলন্ত মশাল আমার দিকে ছুঁড়ে মেরেছে।

আমি আর পারছি না। সবকিছু ঘোলাটে দেখছি। ভীষণ হাঁপাচ্ছি। চোখের সামনে সবকিছু অন্ধকার হয়ে আসছে। কয়েক হাত দূর থেকে বিকট পাশবিক চিৎকারগুলো মনে হলো অনেক দূর থেকে শুনছি। শব্দগুলো ঘুরপাক খেতে খেতে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। একটা হিমেল নিস্তব্ধতা যেন চারিদিক ঢেকে দিয়েছে। চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মা ভাইকে নিয়ে খেলা করছে। হাতছানি দিয়ে আমায় ডাকছে। আমি আসছি, মা দাঁড়াও, ভাই আমায় ফেলে যাস্ না। আমি আসছি। আমি আ···স···ছি। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে—ঘুম—ঘু···ম্ ম।'

শেয়ালপণ্ডিত ও সিংহ মহারাজ

দিলীপ ভট্টাচার্য

কোঁকর-কোঁ, কোঁকর-কোঁ মোরগ ডেকে উঠলো, 'শ্যাল্ পণ্ডিত শ্যাল্ পণ্ডিত, তুমি আব কত কাল এ ভাবে শুকিয়ে থাকবে পাঁচ টাকা মাইনে, তা কোন কালেই পাওনা। শুনেই আসছো চিরকাল তোমার মাইনে পাঁচ টাকা, তার চে আমি বলি কি তুমি না হয় রাজা মশায়ের সঙ্গে একবার দেখা করো, একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই। রাজা মশাই শুনি খুবই ভাল।'

গর্তে এলে শেয়ালী খেঁকিয়ে উঠলো, 'যাওনা. রাজার সঙ্গে দেখা করে তোমার সব কথা বল, তোমার মত একজন পণ্ডিতকে তো আর ঘাড় ধরে রাজসভা থেকে তাড়িয়ে দেবে না, বরং তুমি মাইনে পাওনা শুনে মহারাজের মনে একটু দয়াও হতে পারে।' শেয়াল আর কি করে, এই সব রাজা মহারাজার কথা শুনলেই তার বুকের ধড়ফড়ানি বেড়ে যায়। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসে। তবু অগত্যা সে বললো, 'আমি যে রাজসভায় যাব আমার তেমন পোশাক কই?' শেয়ালী বললো, 'কেন, পোশাকের আর চিন্তা কি? তোমার তো একটা ধুতি পাঞ্জাবী আছে।' এতক্ষণে শেয়ালের খেয়াল হ'ল—তাইতো, তার প্রপিতামহ, মানে ঠাকুরদার বাবা একটা ধুতি কিনেছিলেন আর ঠাকুরদা কিনেছিলেন পাঞ্জাবী। শেয়ালের বাবা তাই গর্ব করে প্রায়ই তার কাছে বলতেন, 'আমরা কি কম বড় বংশ! একেবারে খানদানী পণ্ডিত বংশ।'

সেই ধুতি পাঞ্জাবীর কথা মনেই ছিল না। থাকবেই বা কি করে? সে কোন কালে সে সব চোখে দেখেনি। শেয়াল বললো, 'ঠিক আছে খোল সিন্দুক।' গর্তের এক পাশে একটা পুরনো থস্থসে কাঠের সিন্দুক্ রাখা আছে। ওর মধ্যেই শেয়ালের যাবতীয় পৈতৃক সম্পত্তি। সেটা খুলতে যেতেই আধখানা ডালা খুলে বেরিয়ে এল। আর অমনি সিন্দুক থেকে একলক্ষ তেত্রিশ হাজার তিনশ তিনটে আরশোলা বেরিয়ে ফর্ফর্ করে সারা গর্ত ভরিয়ে তুললো। ঠাকুরদার রেখে যাওয়া জিনিস। তারপর একি! সিন্দুক ভর্তি শুধু আরশোলার নাদি। একটা ছোট পোঁটলা, তার নীচে পড়ে আছে পোকায় কাটা পাঞ্জাবী।

পাঞ্জাবীটা না ফুল হাতা না হাফ্। কিন্তু কাপড়টা পরতে গিয়েই বিপদ বাধলো। একদিক থেকে পরতে গিয়ে ফাঁত করে ছিঁড়লো। তখন শেয়ালী একগাদা বাবলা কাঁটা এনে ছেঁড়া জুড়তে বস্লো। ছেঁড়া জুড়তে জুড়তে, ছেঁড়া জুড়তে জুড়তে, আর কাপড়ই দেখা তায় না। সার সার শুধু কাঁটা। শেয়াল সেই ধুতী পাঞ্জাবী পরেই, হাতে এক মোটা লাঠি আর চোখে বিরাট চশমা এঁটে মুখ গম্ভীর করে গর্ত থেকে বের হয়ে এলো! বুক ধড়ফড়ানি তখন দারুণ বেড়ে গিয়েছে!

চলতে চলতে শেয়াল কত বন খাল বিল পার হ'য়ে গেল! বন ক্রমেই গভীর হ'চ্ছে। জন্তু জানোয়ারের সংখ্যা বাড়ছে। শেয়াল বুঝতে পারছে রাজধানীর কাছাকাছি এসে পড়েছে। এদিকে তার ধুতি পাঞ্জাবী খসে পড়তে পড়তে পরনে স্রেফ একটা নেংটিতে এসে ঠেকেছে। নেংটি পরেই শেয়াল রাজধানীতে এসে পড়লো। রাজধানীর এদিক সেদিক ঘুরতে ঘুরতে দেখল কি বিশাল বিশাল পর্বত, মাথা একেবারে আকাশে ঠেকেছে। আর কি বিশাল চেহারার জন্তু জানোয়ার। পর্বতের এক বিরাট গুহা, রাজপ্রাসাদ। চূড়ার দিকে তাকাতে গিয়ে শেয়ালের মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে উঠলো।

রাজসভায় সিংহ মহারাজ বিরাট সোনার সিংহাসন আলো করে বসে আছেন। সিংহাসনে কত হীরে জহরত মণিমুক্তা ঝলমল করছে। পাত্রমিত্র, সৈন্য সামন্তে সভা একেবারে ভরে উঠেছে। কত কালো বাঘ, কেঁদো বাঘ, ডোরা কাটা বাঘ, মোষ গণ্ডার, বাইশন একেবারে এলাহি কারবার। এসব দেখেত শেয়ালের আক্কেল গুড়ুম। সে হাড় জিরজিরে খেঁকি শেয়াল। স্রেফ একটা নেংটি পরে রাজসভায় ঢুকে পড়েছে। কিন্তু একি! রাজসভায় সবাই ঘুমোচ্ছে। কি বিচিত্র সুরে নাক ডাকা। যেন নাক ডাকার প্রতিযোগিতা হচ্ছে। কানে তালা লাগার যোগাড়। সিংহ মশাই সিংহাসনে বসে বসেই ঘুমে কাতর। তার সামনে দু-সারিতে আটটা মর্কট দাঁড়িয়ে। মহারাজ ঘুমোতে ঘুমোতে হাই তুলছেন আর তারা তাড়াং তাড়াং করে তুড়ি বাজাচ্ছে। দু'টো ময়ূর দু'পাশে দাঁড়িয়ে পুচ্ছ নাড়িয়ে মহারাজকে হাওয়া করছে। শেয়াল বুঝলো মর্কটরা তুড়িবড়দার। শেয়াল গুটি গুটি মহারাজের সামনে যেতেই মর্কটরা একসঙ্গে চোখ পাকিয়ে ঠোঁটে আঙ্গুল ঠেকাল। একটা মর্কট দাঁত খেঁকিয়ে বললো, 'দেখছো না মহারাজ ব্যস্ত, সভার কাজ চলছে।' শেয়াল ভাবলো, রাজকার্য বোধ হয় ঘুমোনা। শেয়ালও রাজকার্য করার চেষ্টা করলো, অর্থাৎ ঘুমতে চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না। পাশেই এক ইয়া

কেঁদে ফেলে। সে যদি রাজকার্যের ঝোঁকে তার পিঠে একবার হাত বুলিয়ে দেয় তাহলেই দফা রফা। শেয়াল বসে বসে ঘামছে আর ভাবছে এবার সভা থেকে চোঁচা দৌড় দেবে। এমন সময় মহারাজ পিট্ পিট্ করে তাকিয়ে সামনে শেয়ালকে দেখতে পেলেন। তার হাড় জিরজিরে চেহারা আর পরনে কৌপীন দেখে মহারাজ ভাবলেন নিশ্চয় কোন মুনি ঋষি সামনে বসে

আছেন। সিংহ মহারাজের চোখের ঘুম ছুটে গেল। তিনি জানেন মুনি ঋষিরা ফুশ মন্তরে সিংহকে নেংটি ইঁদুর করে দেয়। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে দু'হাত জোড় করে বলতে চাইলেন, 'কি চাই ঋষি বর?' কিন্তু মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল, 'কি চাই ঋষি-রাবড়ি'? শেয়াল আরো ঘাবড়ে গিয়ে বললো, 'মহারাজ আমি রাবড়ি নই। দেখুন আমি গামলায় করে আপনার সামনে আসিনি। আমি একেবারে অখাদ্য একটা পাঠশালার পণ্ডিত।'

'আপনি পণ্ডিত? ভালো কথা, আমি পণ্ডিত কত ভালবাসি। দিনরাত যত হস্তিমূর্খ গণ্ডমূর্খদের সঙ্গে আমার দিন কাটে। তা কেন আমার এই সভায় আপনি এসেছেন?'

শেয়াল মহারাজকে বললো, 'মহারাজা, আমি মাইনে পাই না।' সে প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি? 'এ্যাঁ! আপনি মাইনে পান না! কতদিন?' 'আজ্ঞে তের বছর' শেয়াল উত্তর দেয়। 'বলেন কি! আপনার বয়স কত?' সিংহ আবার জিজ্ঞাসা করে। 'আজ্ঞে, পাঁচ বছর। আমার ঠাকুর্দার আমল থেকেই মাইনে পাই না হুজুর।' সিংহ মহারাজ এবার রেগে হুংকার

ছাড়লেন, 'কোথায় খাজানচি, কোথায় কোটাল ?' আমার রাজত্বে পণ্ডিতের কেন এ হাল ?' বাঘ মন্ত্রী বললো, 'মহারাজ, বনেতো তেঁতুল গাছের অভাব নেই। আর পণ্ডিতেরা তো তেঁতুল পাতার ঝোল খায় তবে আর মাইনের দরকার কি ?' শেয়াল বললো, 'মহারাজ আমরা শুধু নুন কেনার জন্য মাইনে পাই। তাও তের বছর বাকী।'

'বোলাও খাজানচি।' মহারাজ আবার হুংকার দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট ভল্লুক চোখে এক বিরাট চশমা এঁটে এক লাফে মহারাজের সামনে এসে দাঁড়াল। জোড় হাতে সে সিংহকে বললো, 'আমিতো পণ্ডিতদের মাইনে দিই না মহারাজ ; ওটা দেয় আমার এ্যাসিস্‌টেণ্ট বেজী।'

'কোথায় বেজী ?'

'আজ্ঞে নেই।'

'গেল কোথায় ?'

'আজ্ঞে চাটনী হ'য়ে আপনার পেটে।'

'বেজীর চাটনী।'

কথাটা বলতে গিয়েই সিংহের জিব দিয়ে এক ফোঁটা লালা গড়িয়ে গেল। 'পণ্ডিতদেব হিসেবের খাতা লেখাও।' সঙ্গে সঙ্গে চারটে শুয়োর আড়াই মণি একটা খাতা এনে দড়াম করে মেঝেতে ফেললো। অমনি চারিদিক ধুলোতে ছেয়ে গেল। শুরু হ'য়ে গেল ফাঁচ ফাঁচ করে সে কি হাঁচি। 'এখুনি পণ্ডিতের সব টাকা হিসেব করে মিটিয়ে দাও'—মহারাজের কড়া আদেশ।

'এখুনি হ'বে না মহারাজ, হিসেব ঠিক করতে তের মাস সময় লাগবে।' —খাজানচি মশাই হাত জোড করে বললেন।

'বেশ, পণ্ডিত মশাই আপনি বাড়ী যান ; ঠিক তের মাস পরে আমার পিওন হনুমান সিং আপনার টাকা দিয়ে আসবে।'

শেয়াল আনন্দে একেবারে ডগমগ হ'য়ে রাজসভা থেকে বেরিয়ে আসে। ঠিক এমন সময় কোমরে এক খোঁচা, শেয়াল পাশ ফিরে দেখে অতি বড় এক মর্কট। 'কি পণ্ডিত ! তের মাস পরেই তোমার টাকা পাবে নাকি ? তের বছরেও পাবে না।'

'কেন ? রাজামশাই যে হুকুম দিলেন।' শেয়াল একটু ঘাবড়ে গিয়ে বললো।

'ও রকম হুকুম তিনি হরবকতই দিচ্ছেন, আর কালিয়া কোপ্তার তলায় সব চাপা পড়ে যাচ্ছে।'

'তবে উপায় ?' শেয়াল জিজ্ঞাসা করে।

'উপায় একটা আছে, তাতে এখুনি টাকাটা তুমি হাতে হাতে পেয়ে যাবে। তুমি গরীব পণ্ডিত, তাই তোমায় বলছি। তুমি যদি টাকার অর্ধেক আমাকে আর খাজানচিকে ছেড়ে দাও তবে এখুনি তোমাকে বাকী টাকা এনে দিচ্ছি।' মর্কট বিজ্ঞের মত হাসতে থাকে। শেয়াল আর কি করে, রাজি হ'য়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই মর্কট এক থলি টাকা এনে শেয়ালের হাতে দেয়। শেয়াল কখনো এত টাকা চোখে দেখেনি। সে থলেটা বগলদাবা করে হাঁটা দেয়। কিন্তু রাজবাড়ীর প্রথম গেটেই আবার বিপদ।

'কি পণ্ডিত কি কথা ছিল। তুমি যা পাবে তার অর্ধেক আমার। তবেইতো ভেতরে ঢুকতে দিয়েছিলাম।' দ্বারী এসে পথ আটকে দাঁড়াল। শেয়াল কি করে, দ্বারীকে আবার তার অর্ধেক টাকা দিয়ে দেয়। এই ভাবে রাজবাড়ীর সাতটা গেট পার হ'য়ে দ্বারীকে তার অর্ধেক তার অর্ধেক দিতে দিতে শেয়াল যখন বাইরে এল, তার থলিতে মাত্র এক টাকা এসে ঠেকেছে। কিন্তু এখানেও নিস্তার নেই। একটা সজারু তার বিরাট কাঁটা মেলে শেয়ালের পথ আগলে দাঁড়াল, 'কি শেয়াল আমার পাওনাটা'? শেয়াল আমতা আমতা করে বললো, 'তোমার আবার পাওনা কি ?'

'কেন, আমি যে তোমাকে রাজবাড়ী দেখিয়ে দিলাম আমার মজুরী দাও।'

শেয়াল আর কি করে রাগের চোটে থলিটা সজারুর দিকে ছুঁড়ে দিল। তারপর ক্লান্ত হয়ে শেয়াল একটা গাছতলায় এসে বসলো। অমনি গাছটা বলে উঠলো, 'কি শেয়াল আমার পাওনাটা দিয়ে যাও।'

'তোমার আবার পাওনা কিসের ?' শেয়াল খেঁকিয়ে উঠলো।

'কেন, রাজবাড়ী যাওয়ার আগে আমার ছাওয়ায় বসে বিশ্রাম করলে, আমার ছাওয়ার ভাড়া দেবে না ? তবে আমি পুলিশ ডাকি।'

পুলিশের কথায় শেয়াল একেবারে ঘাবড়ে গিয়ে বললে, 'আমার তো আর কিছু নেই ভাই আমি তোমাকে কি দেব ?'

'কেন তোমার কৌপনীটা।'

শেয়াল কৌপনীটা খুলে গাছের ডালে টাঙ্গিয়ে দিতে গিয়ে দেখলো অরো অনেক কৌপনী গাছের ডালে ঝুলছে। এবারে শেয়াল চোঁচা দৌড় লাগালো।

———